



সেবাম সাম

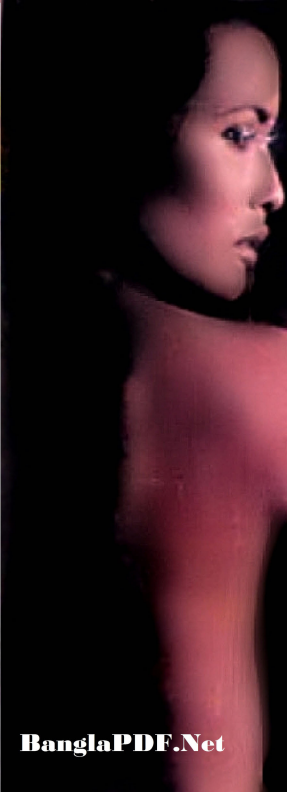
Sewam Sam

কাজী
আনোয়ার
হোসেন

**পাণ্ডার
কামরা**



BanglaPDF.Net



রাবা-৯৮

গাশের কামরা

কাঙ্গী বাবোয়ার হোসেন

এক খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপক্ৰাস

ডিউকের ছদ্মবেশে রানা যতই
মাস্তানী করুক না কেন, আসলে
এ পরিচয়ে অত্যন্ত দুর্বল ও
একা স্নেহ। এবং এই দুর্বলতার
সুযোগই নিল অপরিচিত এক
লোক। একটা টেলিফোন করে
ফাসিয়ে দিল ওকে অদ্ভুত এক
খুনের মামলায়। এইবার বুঝা
ঠেলা।



সংখ্যা ৮৫

তারিখ ১০

আবদুল হক সর্জন



প্লেট নং ১ ৩৬/১০ ডায়েরী নং ১০০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

Edited By
Sewam Sam



Edited By
Sewam. Sam

Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জামুয়ারী, ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

দূরালোপনী : ৪০৫৩৩২

জি পি ও বক্স নং ৮৫০



শো-রুম :

৩৬, বাংলাবাজার

ঢাকা।

PASHER KAMRA

By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রাণা

বাংলা দেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের

এক ছদ্মস্ত্র হুঃসাহসী স্পাই

গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।

একা ।

বিচিত্র তার জীবন । অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ।

কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।

টানে সবাইকে কিন্তু বাধনে জড়ায় না ।

কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে

রুখে দাঁড়ায় ।

পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়

আর মৃত্যুর হাতছানি ।

আশুন, এই ছর্ধর্ধ চির-নবীন যুবকটির সাথে

পরিচিত হই ।

সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে

এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের

অন্ধের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে ।

আপনি আমন্ত্রিত ।

ধন্যবাদ ।



এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বল্পসংস্করণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

এক

‘চাকরি খুঁজতাহেন ? ডিউক সাহেবের আপিসে ? হেঁ-হেঁ. হেসেই গড়িয়ে পড়ে লোকটা। ‘দেহেন, আমি তার পাশের আপিসে এক বছর ধইরা আছি...বেবাকই জানি...’

কিন্তু বেকার যুবক তবু দমে না। বলে, ‘তা একটু খোজ-খবর নিলে কতি কি...?’

‘কতি ? আছে।’ লোকটা মুখ নামিয়ে আনে। ‘ডিউক সাব কেডা, জানেন কিছ ? সে কিমুন মাস্ত, করেডা কি, কেমনে তার চলে, কই এসব কিছ জানা আছে আপনের ?’

‘কেন ? সাইনবোর্ডে তো লেখাছ আছে—কনসালট্যান্ট।’

যুবকের চোখের সামনে বড়ো আঙ্গুল নাচায় লোকটা। ‘আরে ধোন, ছালটেন-ফালটেন কিছ না। মাস্তান—শহর ঢাকার জবর-দস্ত মাস্তান। আবার জিগান, কতি কি ? আরে সাব, জান লইরা টানাটানি পইড়া যাইব...’

একটু ভাষাচ্যাকা ধেরে যায় বেকার যুবক। ‘কিন্তু এমন সাজানো গোছানো অকিস...’

‘ওগুলো অইল বাইরের শো। উপরে কিটকাট, ভিতরে...বু-
লেন না? আগে যেখানে আছিল সেখানে তারা নিয়া গোলমাল
বাধছে—তাই এখানে আইসা উঠছে। রান্না বিল্ডিং অইল সব
বিজিনেস-পাট্রির আপিস—দখতাতেন না সব টেরাবোল কোম্পানী,
সিনেমা কোম্পানী, ইনডেন কোম্পানী—মানে অইল বেবাকই
কোম্পানীর আপিস, তাই ওতবাক সাবেব একখানা সাইনবোর্ড
লটকাইয়া রাখছে—মহদো মহদো এখানে আইসা বাহেও।’

‘ডনি এখানে থাকেন?’ হঠাৎ একটু উৎসাহিত হয়ে ওঠে
বেকার যুবক। ‘তাহলে তা কাজ কাম কিছু আছেই...’

‘কুতুবা আছে। যারের লুটফরমাদেল আমদী কররা দেই—বকশিস
দেয়।’ হঠাৎ যুবকের দিকে খুঁকে পড়ে লোকটা। অনেকটা শাসা-
বার ভঙ্গিতে বলে, ‘তা মতলবটা কি? আমার এই বকশিসের চাক-
রিটা খাইবার চান নাকি? মনে রাখবেন, আমার নাম হকুম
আলি...’

হকুম আলি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠায় একটু খতমত খেয়ে
যায় যুবক, কিন্তু ক্ষুদ্র নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সে তার ছর-
বছার একটা বয়ান শুরু করে। কিন্তু এসব একেবারেই শুনতে
রাজি নয় হকুম আলি, তার উত্তেজনা আরো বাড়তেই থাকে। বলে,
‘সোজা রাস্তা মাপেন, ছরবছা সাব। এহানের সব লোক ডিউক
সাবের উপরে চেতা, ডরায় দেইখা বাইরে কিছু কর না, কিন্তু ভিতরে
ভিতরে রান্না বিল্ডিং খেইকা তারে খেদাইবার তালে আছে। খামোকা
বুট-কামেলার মইদো নিজেরে টাইনা আইনেন না—কাইটা পড়েন।’

করুণ মুখে উঠে দাঁড়াল যুবক। ‘আচ্ছা ভাই, আসি,’ বলে বর্ণ-
বীথি বাণীচিজের দরজা তেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

সামনেই সারি সারি অ্যাপার্টমেন্ট। দরজায় হরেক রকম সাইন-বোর্ড। প্রথমেই বর্ণবীণি বাণীচিত্র, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক এরা। তারপর জোহর ট্রাভেল। ছোট একটা প্যাসেঞ্জ, প্যাসেঞ্জের ওপাশেই আরেকটা সাইনবোর্ড—মিঃ ডিউক, কনসালট্যান্ট। পাশেই বেশ বড় একটা সাইনবোর্ড—জাকের আলি চৌধুরী, ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট। প্যাসেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিড়িয়ে তাকাল বেকার যুগটি, দেখল, বর্ণবীণি বাণীচিত্রের দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুকুম আলি। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে প্যাসেঞ্জ ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করল সে। যুগটি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল হুকুম আলি। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে থামল ডিউকের অফিসের সামনে। টোকা দিল দরজায়।

‘কাম ইন,’ কবাট খোলার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রানা। ‘কি ব্যাপার, হুকুম আলি?’

‘ভিড়, স্যার। কুট-ঝামেলা। চাকরির জন্যে বহুত মানুষ লাইন দিচ্ছে। তাই এই কি...’

‘দরজায় একটা নো ভ্যাকেলি সাইনবোর্ড, এই তো? ঠিক আছে...’

ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। ইঙ্গিতে হুকুম আলিকে বিদায় নিতে বলে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ছ’টা বেজে দশ। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল ও, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গভীর করে তুলে বলল, ‘ডিউক বলছি।’

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড কেউ কথা বলল না অপর প্রান্ত থেকে। লাইনের মধ্যে দিয়ে রানার কানে ভেসে এল একটা প্লেন স্টাট রানা-১৮

নেবার শব্দ। তেমন জোরাল নয় আওয়াজটা, ধীরে ধীরে মিলিয়ে
গেল। কয়েকটা অস্পষ্ট, জড়ান কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল রানা। কিন্তু
হঠাৎ করেই সেগুলো আর শোনা গেল না। রানার মনে হল, যে-
লোকটা ডায়াল করেছে সে যোগস্বর বন্ধ করে দিল টেলিফোন বুথের
দরজা।

তারপর হঠাৎ করেই কানে এল ভারি গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর,
'মিঃ ডিউক ?'

'বলুন।'

অপরপ্রান্তে আবার একটা বিরতি, যেন মনে মনে কথাগুলো
গুছিয়ে নিচ্ছে লোকটা। 'আমাকে আপনি চিনতেন না, তবে আপ-
নার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি।

'জানি না কি শুনেছেন।' গলাটা আরো গম্ভীর করে বলল
রানা। 'আপনি কে বলছেন ?'

আবার কিছুক্ষণ বিরতি। তারপর গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।
রানার মনে হল, কিভাবে শুরু করবে তা যেন ভেবে পাচ্ছে না।
'আমার হাতে সময় খুব কম। এরারপোট থেকে এলছি। আমি আপ-
নার সাহায্য চাই।'

'ও, তাহলে এই শুনেছেন—আমি সাহায্য করি ?'

'আমার খুব বিপদ, মিঃ ডিউক। আগে আমার কথাটা শুনুন,
শ্রীজ।'

রাইটিং প্যাড আর বলপয়েন্ট টেনে নিল রানা। 'আপনার নাম
আর ঠিকানা বলুন।'

'আতিকুল্লাহ খান, ৩৮/খ, উস্তর বাসাবো।'

লিখে নিল রানা। 'এবার বলুন, কি সাহায্য দরকার আপনার ?'

‘আমার...মানে, আমার পরিবারের খুব বিপদ। আমার স্ত্রীর ওপর হুমকি এসেছে।’ আবার কিছুক্ষণ বিরতি। আবার অপরপ্রান্ত থেকে স্তেসে এল একটা প্লেন স্টার্ট নেবার আওয়াজ। আতিকুল্লাহ খান কিছু বলল, কিন্তু জেট ইঞ্জিনের আওয়াজে তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেল না রানা।

‘শুনতে পাচ্ছি না, আবার বলুন...’

কীং হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল প্লেনের আওয়াজ। তারপর হঠাৎ খুব ভাড়াভাড়ি কথা বলতে শুরু করল লোকটা। ‘বিশেষ কাজে কোলকাতা যেতে হচ্ছে আমাকে। এই খানিক আগে খবর পেলাম, আমার স্ত্রীর একটা বিপদ হতে পারে। এই রকম একটা ভয়ংকর খবর, শুকে জানান উচিত মনে হল না। পুলিশের কথা ভাবছিলাম, তখনই আপনার কথা মনে পড়ল। এমন একটা ব্যাপার যে কি বলব, মিঃ ডিউক—আমি পরশু, মানে রোববারে ফিরে আসছি, তখন সব খুলে বলব। ভেবে দেখলাম, আপনার সাহায্যটাই এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল হবে। আর বিপদটা ঘটতে পারে আজ রাতেই... তিন বছরের একটা ছেলে আছে আমাদের...’ মিঃ ডিউক...

সাহায্য? এই রকম আরো অনেকগুলো টেলিফোন কলের কথা মনে পড়ে গেল রানার। ওগুলোর মতো এটাও কোন ফাঁদ বা অপকৌশল নয় তো? কে জানে। তবে, সন্দেহ করে উদ্ভ্রলোকের সাহায্যের অনুরোধ এড়িয়ে যাবারও তো কোন মানে হয় না। একটু বয়ং বাজিয়ে দেখা যাক।

‘আপনি কি করেন, মিঃ খান?’

হঠাৎ যেন কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। ‘আমি নিউমানে আছি।’

নিউম্যান করপোরেশন নাম করা একটা বহুজাতিক সংস্থা। বাংলাদেশে এদের ওয়ুথ, প্রসাধনী ইত্যাদির বিরাট কারবার। বাজারে এদের তৈরি জিনিসের যেমন ছড়াছড়ি, রেডিও-টেলিভিশন পত্রিকা খুললে এদের বিজ্ঞাপনেরও ভেঁমনি ধুমধাম।

‘আমার সাংসার্য পেতে হলে কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়, আশা করি সে-সবও শুনেছেন আপনি?’ ব্যাপারটার দ্রুত সমাপ্তি চাইছে রানা। ঘাপলাবাঁধি ছাড়া কিছুই নয়। খেলতে এসেছে, কাজেই খেলতে হবে সনাতন নিয়মেই।

‘হ্যাঁ, শুনেছি। ফীর অর্ধেক টাকা আডভাল করতে হয়। পার্টির যদি অন্য কোন মতলব থাকে, সে-টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় না। আমি একজন বিপনগ্রস্ত লোক, মিঃ ডিউক, এর মধ্যে আর কিছু নেই। আমার বিপনটা জেমুইন। কিছু লোক বেশ কিছুদিন থেকে আমাকে ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করছে, ওদেরই নতুন চাল, আমার জীবন ক্ষতি করবে—আপনাকে সব আমি খুলে বলব। এখন কাইগুলি বলুন কত আডভাল পাঠাব আপনাকে?’

‘পাঁচ হাজার।’

‘ঠিক আছে,’ এক কথায় রাজি হয়ে গেল আতিকুল্লাহ খান। ‘এখনই পাঠবে দিচ্ছি। আমার জীবন নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে যেতে পারি তো, মিঃ ডিউক?’

‘আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি একবার সময় করে আমার এখানে আসতে পারেন না, মিঃ খান? এসব ব্যাপারে ক্লায়েন্টের সাথে সামনাসামনি বসে কথা বলতে চাই আমি।’

‘আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এখন আমার হাতে একেবারেই

সময় নেই। প্লেন টেক-অফ করতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। কোলকাতা থেকে ফিরে, রোববারেই, আপনার সাথে দেখা করব আমি। এই ক’টা দিন, মানে আমি যে সময়টুকু থাকব না, আপনি দয়া করে আমার জ্বর ওপর খেয়াল রাখবেন, মিঃ ডিউক। বাচ্চা একটা ছেলে আছে আমার... আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো?’

‘নিশ্চিন্ত? আল্লাহ ভরসা।’ লাইনে আবার প্লেনের আওয়াজ শুনে পেল রানা, এবারের শব্দটা মনে হল ল্যাগ করার। ‘কিন্তু আপনার স্ত্রী সম্পর্কে এখনও আমি কিছু জানতে পারিনি, মিঃ খান। তাঁর চেহারার বর্ণনা...’

‘বললাম তো, ৩৮/খ, উত্তর বাসাবো আমার ঠিকানা। আর সময় নেই আমার, মিঃ ডিউক। যেতে হচ্ছে এখনই। রোববারে দেখা হবে। খোদা হাফেজ।’ কেটে গেল লাইন।

রিসিভার বেধে দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। জাবল, ডিউকি ঠিকানা বদল করে এই রক্সি বিল্ডিংয়ে মস্তত আসা উচিত হয়নি। তখন ভেবেছিল, মাস্তান ইমেজটা প্রতিষ্ঠিত করাব জন্যে এই বাচাল লোকজনের এলাকাটাই হবে তার জন্যে সুবিধাজনক। তবে মাস্তান ইমেজটার মতো কনসালট্যান্ট লেখা সাইনবোর্ডটাও কম ভাগাচ্ছে না ওকে। পৃথিবীতে কত বিচিত্র রকমেরই যে মানুষ আছে, আর তাদের কত বিচিত্র রকম সমস্যা আর উদ্দেশ্য। তবে ক্যাপাটে টাইপের মক্কেলরাই বেশি গোলমাল পাকায়। আগেকের এই আতিকুল্লাহ খানও বাধহয় তাই—ক্যাপাটে। বিপরীতদিক হয়ত বানানো কথা, সন্দেহ হয় বাস্তব থাকতে পারে, বউকে বাধহয় সন্দেহ করে। দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে এই সুযোগে বউ কিছু করে কিনা জানতে চায়। এই সূত্রে মাস্তান ডিউকের সাথে পরিচয়ও হয়ে গেল, কারো সাথে রানা-২

বউয়ের কষ্টিনষ্টি থাকলে তাকে দ্ব্যাসময়ে ধোলাই দেয়া যাবে—শেষ পর্যন্ত হয়ত এই রকম কিছু সমাপিত হবে। .স গাই হোক, টেলিফোনে এই রকম একটা ভৌতিক গলা শুনে ছুটে যেতে রাজি নয় সে, ভাবল রানা। তবে, ভদ্রলোককে দ্বখন কথা দিয়েই কেলেছে, দায়িত্বটা এড়িয়ে যাওয়াও তো আর দ্বখন নয় এখন। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেসল ও, লাভেদ না িসকত, থাকে হোক একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তার নিজের দাবার দরকার নেই।

ঠিক এই সময় টোকা পড়ল দরজায়। আবার জুজুম আলি ? না, ভেজান দরজা ঠেলে ভেতর ঢুকল পূর্ণা নাচ নাচক টাইপের একজন। ইয়া, পত্রবাহকই। এগিয়ে এসে পৌলের পূর্ণা মোটাসোটা একটা এনভেলোপ রাখল সে। হাতের খাতাটা গুলল, এগিয়ে দিল সেই করার জন্যে।

একহারা, লম্বা চেয়ারা লোকটার, যুখে হাজার হিজিবিজি দাগ। চোখ দুটো অবশ্য বেশ সতর্ক, রানার পট করাটা বেশ খেয়াল করে দেখল। তারপর খাতাটা টেনে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল কামরা থেকে।

এনভেলোপ খুলল রানা। ভেতরে পাঁচ শো টাকার দশটা নোট আর ছোট একটা চিরকুট। চিরকুটে লেখা : পেরক : আতিকুল্লাহ খান, ৩৮/খ, উত্তর বাসাবো, ঢাকা - ১৪।

অবাক হল রানা। এত তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক এখানে টাকা পাঠাল কিভাবে? বিদেশের মতো ঢাকায়ও কি তবে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিস চালু হয়ে গেছে? বছর কয়েক আগে চালু হবে বলে শুনেছিল বটে, কিন্তু তারপর আর খবর রাখা হয়ে ওঠেনি। বেশি বেশি দেশের বাইরে থাকলে এই হয়। দেশের অনেক নতুন ব্যাপার

জানতে হয় অনেক পরে। এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সাভিসও হয়ত অনেক দিন হল চালু হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ তার জানার সুযোগ হল। যাই হোক, ওদের সাথে এরকম টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই আছে আতিকুল্লাহ খানের। রানার সাথে কথা শেষ করে টেলিফোনে টাকা পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে কোম্পানীকে। আর এই কোম্পানীর অফিস রঞ্জি বিল্ডিং বা আশপাশে কোথাও থাকতে বিচিত্র নয়।

টেলিফোন-গাইডের পাতা ওপ্টাল রানা। নিউম্যান কর্পোরেশনের নির্ধারিত অংশে কোথাও আতিকুল্লাহ খানের নাম পাওয়া গেল না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল ওকে। বুক-শেপফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মিউনিসিপ্যালিটির স্ট্রীট ডাইরেক্টরিটা নেড়েচেড়ে দেখল। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। ৩৮/খ, উত্তর বাসাবোয় অন্য এক ভদ্রলোক থাকেন, কোন আতিকুল্লাহ খানের নাম সেখানে নই।

ব্যাপারটা কি হতে পারে? ভদ্রলোক কি তবে নিউম্যান কর্পোরেশনের কোন নতুন পদস্থ কর্মকর্তা? আর ওই বাড়িটা কি তিনি ভাড়া নিয়ে আছেন? কেমন ঘেন একটু খটকা লাগছে, তবে এমনটি হতেও তো পারে। ‘খুস...মরকগে।’ আতিকুল্লাহ খানকে মাথা থেকে বের করে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল রানা। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে একটা টান দিল সিগারেটে। ভাবল, সন্ধ্যাটা আজ কি করে, কার সাথে কাটান যায়। প্রিয় বান্ধবীদের কয়েকটা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। বাছাই পর্ব শুরু হয়ে গেল মনের ভিতর, ঠিক এই সময় সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলতে গিয়ে চোখ পড়ল এনভেলোপটার ওপর। আকাশ থেকে ঘেন ধপ করে মাটিতে পড়ল রানা। ‘টাকা নিয়েছি।’ বিড় বিড় করে নিজের

সাথেই কথা বলছে ও। এখন আর দারিদ্র এড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া, এর ভেতর কোন গোলমাল আছে তার এই ধারণাটা যদি সত্যি না হয়? যদি সত্যি কোন বিপদ হয় ভদ্রমহিলার? এর সাথে হয়ত জড়িয়ে পড়বে একটা শিশুও।

আবার রিস্টওয়াচ দেখল ও। ছ'টা পঁগরিণ। সাড়ে সাতটার আগে শাহের বা সৈকতকে পাওয়া যাবে না, ওরা কাজে ব্যস্ত থাকবে, জানে ও। অপরায় তজ্জিতে ঈদ শ্রাকাল একটু। অ্যান্ট্রোতে সিগারেটটা গুলে দিয়ে উঠে পাল চরার ভেড়ে। প্রিয় বান্ধবীদের একজনকে নিয়ে কোথাও গেরিয়ে পড়ার আগে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে ওকে। কামিজের মেয়ে পলি * আছে বোডিঙে, প্রতি শুক্রবারে তাকে দেখতে যায় ও, তাছাড়া, বোডিঙ স্কুলের বেতন ইত্যাদি দেবার আক্ট শেখ তারিখ।

দরজায় তাল লাগিয়ে গেরিয়ে এল রানা। করিডোর ধরে হেঁটে লিফটের কাছে চলে এল। রানার ঠিক পানের কামরাটা ইনডাস্ট্রিয়াল এমিস্ট জাকের আলি চৌধুরীর থাকিস। তার ভরাট কর্তব্যর শোনা যাচ্ছে, বেশ জোর গলায় কি যেন একটা ডিকটেশন দিচ্ছে সেক্রেটারীকে। ভদ্রলোক যেচেই কয়েকবার আলাপ করতে এসেছেন রানার সাথে, কিন্তু তার আলাপ ওই একটাই—বিজনেসটা তেমন জমিয়ে তোলা যাচ্ছে না।

বর্ণবীথি বাণীচন্দ্রের দরজা থেকে হুকুম আলি কিন্তু দেখে কেলেকে রানাকে। এলভেটর নিচে থেকে উঠে আসার আগেই প্রায় উড়তে উড়তে পৌছে গেল সে। 'স্যার কি রাইভের কামে হাললেন?' হুকুম আলি লোকটা কথাবার্তার এই রকমই, কিন্তু মানুষ সে

* বিষ নিঃশ্বাস ঔষব্য।

খারাপ না। মাস্তান ডিউকের ব্যাপারে তার আগ্রহ আর কোতূ-
হলের সীমা নেই ; শুধু নগদ প্রাপ্তির আশায় ফরমাশ খাটে না,
এক ধরনের বীরপূজার ভাবও আছে তার মধ্যে। মাস্তান জীবনের
কলিত কিছু দুঃসাহসিক কাহিনী মাঝে-মাঝে তাকে শোনায় রানা,
সে একদম হাঁ হয়ে শোনে।

‘অফিস থেকে তোমার এখন ছুটি, তাই না?’ পান্টা প্রশ্ন
করল রানা, যেন “রাইত্তের কামে” তাকে নিয়ে যেতে চায় ও। কিন্তু
এই রকম ভয়ংকর আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাবার বুদ্ধিও হুকুম আলি রাখে।

‘কি যে কন সাব, ফিলিম কোম্পানীর কাম কি আর শেষ অইতে
চায়। তার মইদো এখন আবার নতুন ফিলিম রিলিজ দেওনের
টাইম।’ হঠাৎ কোতূহলে চোখ দুটো চক চক করে ওঠে হুকুম
আলির। ‘তা স্যার, আইজ্জকার কামটা কি?’

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের আলাপ কিছুটা শুনে
থাকবে হুকুম আলি, সেজন্যেই বোধহয় আজকের কোতূহল একটু
বেশি। গভীর হয়েই বলল রানা, ‘তেমন কিছু না। এক ভদ্রলোকের
বউ বিপদে পড়েছেন, তার ওপর নজর রাখতে হবে।’

যেন দুর্ধর্ষ ফাইটিং ছবির গন্ধ পেল হুকুম আলি। ‘তাই নিকি?’
আগ্রহ আর উত্তেজনায় চোখ দুটো তার গোল গোল হয়ে ওঠে।
‘কিসুন দেখতে?’

‘তুমি সূচিআ সেনকে দেখেছ?’

‘কত।’

‘নাগিসকে?’

‘হা।’ উৎসাহে একদিকে প্রায় কাত হয়ে পড়ে হুকুম আলি।

‘জামাইলা ওদের কারো মতো দেখতে নন,’ বলে একটু হাসল

রানা।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে চোখ পিট পিট করল হুম্ম আলি, তারপর বজ্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল। ‘আপনে স্যার আমার লগে মসকরা করেন হেঁ-হেঁ...’

নিচে নেমে এসে গাড়িতে চড়ল রানা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে একজনের কথা মনে পড়ে গেল। শিমুল। এখনও প্রিয় বান্ধবী হয়ে ওঠেনি সে, কিন্তু প্রায় রোজই একবার করে টেলিফোন করে মেয়েটা। কোন এক ছাএ সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা না কি যেন, বলে, ডিউককে নাকি তার জীদগ ভাল লাগে। অথচ সময়ের অভাবে তার সাথে এতদিন বেহুতে পারেনি রানা। দেখা যাক আজকের এই নিরানন্দ সন্ধ্যোটা কেমন কাটে তার সাথে। এত সহজে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে মনটা পুলি হয়ে উঠল। নোটবুক বের করে দেখে নিল শিমুলের বাড়ির ফোন নাম্বারটা টোকা আছে কিনা। আছে। স্টাট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

সাতটার সময় বোডিঙ স্কুলে পৌঁছল রানা। বেতন ইত্যাদি মিটিয়ে দিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের খোলা মাঠে চলে এল ও। আলো ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে একদল ছেলে-মেয়ে। সবার বয়স ছয় থেকে দশের মধ্যে। ওকে দেখতে পেয়েই খেলা কেসে কাকা বলে ছুটে এল পপি। তার পিছু পিছু পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আরেকটা ছেলে। এই ছেলেটাকে আগেও পপির সাথে দেখেছে রানা, কিন্তু পরিচয় বা নাম জানা হয়নি। সুন্দর দেখতে ছেলেটা, পপির প্রায় সমবয়সী, এক দেড় বছরের ছোট হলেও হতে পারে। ঝুত ছুটে আসছে পপি, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

ফ্রুট একটা হিসেব করে নিল রানা—তা, পপির বরসও তো কম হল না। আগামী জুনে ছয় বছরে পড়বে। ক্লাস টুতে পড়ে, মন্দ নয়।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পপি রানাকে। শরীর কেমন আছে, পড়াশোনা ঠিক মতো করছে কিনা, নতুন কি কি ছুটামি আবিষ্কার করেছে—এই ধরনের নানান প্রশ্ন করে পকেট থেকে চারটে চকলেটের প্যাকেট বের করল রানা, ওর হাত থেকে সেগুলো ছেঁ। মেরে নিয়েই ঘাড় কিরিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার দিকে তাকাল পপি। ‘এই, শোন।’ হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। ‘কাকা তোমার জন্যে ও চকলেট এনেছে, এস, নিয়ে যাও, সাদেক।’

‘তুমি জানলে কিভাবে...’

প্রশ্ন করতে বাচ্ছিল রানা, চটপট উত্তর দিল পপি, ‘বা-রে, সে-দিন তুমি না ছ’প্যাকেট নিয়ে এসেছিলে। তা থেকে সাদেককে এক প্যাকেট দিয়েছিলাম আমি, সেজন্যেই তো আজ চার প্যাকেট নিয়ে এসেছ।’

‘কি বুদ্ধি মেয়ের।’ পপির মাথায় ছোট্ট একটা টাটি লাগিয়ে দিল রানা, ছেলেটা নিজের জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ও। ‘এস, পপি ডাকছে তোমাকে।’

গুটি গুটি পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। তার হাতে চকলেটের ছোটো প্যাকেট গুঁজে দিল পপি। রানা হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল, ‘তোমার নাম বুঝি সাদেক? পপির বন্ধু?’

রানার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট কণ্ঠে ছেলেটা বলল, ‘আমার নাম মীর সাদেকুর রহমান।’ কেন যেন, বলার ভঙ্গিটা যান্ত্রিক, শেখান বুলির মতো শোনাল রানার কানে। হয়ত তাই-ই, যাতে নাম বলতে ভুল না করে সেজন্যে মা-বাবা পাখি পড়ান পড়িয়ে

ছেড়েছে।

‘বেশ, বেশ,’ উৎসাহ দেখিয়ে বলল রানা। ‘কোন ক্লাসে পড় তুমি?’
‘তাও জান না?’ আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেয় পপি, ‘ও তো আমার
ক্লাসেই পড়ে। ছ’বছর ধরে আমি ফাস্ট’, ও সেকেন্ড—অনেক চেষ্টা
করছে যাতে ফাস্ট’ হতে পারে, কিন্তু আমিও তো পড়ায় ফাঁকি দিই
না...’ একটু যেন বিষন্ন দেখাল পপিকে। ‘ওর কোন চান্স নেই,
কাকা।’

হেসে উঠল রানা।

বোডিঙ স্কুল থেকে বেরিয়ে ম্যাগারিনে পৌঁছল রানা। বারে
চোকর আগে টেলিফোন করল শিমুলকে। বাড়িতেই পাওয়া গেল
তাকে। রানা তার সঙ্গ চায়, কথাটা শুনে মৃত্তের অন্য বোবা
হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেই সামলে নিয়ে অত্যন্ত
পরিণত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে বলল, ‘আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে
হবে তোমাকে। বাড়িতে কিছু মেহমান আছে, ওদেরকে বিদায় না
করে বেরুতে পারব না।’ আসলে ওসব কিছু না, ভাবল রানা, এই
আধ ঘণ্টা ধরে সাজগোজ করবে শিমুল।

বারে একটা কোন্ড ড্রিক নিয়ে বসেছে রানা, এই সময় মনে
পড়ল আতিকুল্লাহ খানের কথা। তাড়াতাড়ি উঠে টেলিফোনের
কাছে চলে এল ও। প্রথমে ফোন করল শাহেদকে। ওর বউ বলল,
শাহেদ বাড়িতে নেই। খানিক আগে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে
বলে যায়নি। ম্যাগারিনের কোন নাম্বারটা দিয়ে রাখল রানা,
এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরলে তাকে যেন কোন করে।

আধ ঘণ্টা পর নয়, প্রায় এক ঘণ্টা পর পৌঁছল শিমুল। এর
আগে দেখা সাধারণ বেশের ছিমছাম মেয়েটিকে চিনতে কষ্ট হল

রানার। রঙচঙে জামদানী পরেছে, প্রসাধনের আড়ালে হারিয়ে গেছে মুখের স্বাভাবিক কমনীয়তা। হরিণীর মতো চঞ্চল পদক্ষেপে বারের ভেতর ঢুকল সে, নারী-পুরুষ নিবিশেষে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। কারো দিকে ফ্রফ্রপ না করে সোজা রানার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে, মিষ্টি হেসে বলল, ‘সরি, একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি কিছু মনে করনি তো?’

‘না-না,’ শাস্ত হেসে বলল রানা। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, ‘বস।’ তারপর যা শুনবার জন্যে এতক্ষণ ধরে সেজেছে, সেই কথাটা বলল, ‘তোমাকে যা সুন্দর মানিয়েছে না।’

একটু লালচে হল শিমুলের চেহারা। ‘রিয়েলি?’

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রানা, শিমুলের জন্যে কোক আনতে বলল। ‘কোন তাড়া নেই তো?’ ওয়েটার চলে যেতে শিমুলকে জিজ্ঞেস করল ও। ‘রাতটা আমার সাথে গল্প করে কাটাতে পারবে?’

উদ্বেজনায় চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল শিমুলের। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে শরীর শিরশির করছে মেয়েটার। ‘না বাবা। বাইরে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে আত্মা আর আন্ত রাখবেন না।’

খানিক পর রিস্টওয়াচ দেখল রানা। শিমুল জেদ ধরেছে, ডিউকের জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গল্পটা এখনই ওকে শোনাতে হবে। মনে মনে কি শোনাবে তাও ফেঁদে কেলেছে রানা। শাহেদের ফোন আসার সময় এখনও উতরে যাবনি, কাজেই গল্পটা শুরু করল ও।

কিন্তু রাত সাড়ে ন’টার পরও যখন শাহেদের ফোন এল না, মনে মনে তাকে বাদ দিয়ে সৈকতের কথা ভাবতে শুরু করল রানা।

গল্পের মাকথানে ‘আসছি’ বলে আবার টেলিফোনের কাছে চলে এল ও। কোন করল সৈকতের বাড়িতে। ‘কে, মাসুদ ভাই?’ সৈকতের বোন কোন ধরল অপরাধবোধে। ‘সৈকতদা তো সেই বিকেলে বেরিয়েছে...না, কোথায় গেছে বলে যায়নি।...না, কোথায় যেতে পারে আমার কোন ধারণা নেই...ফেরে তো সেই অনেক রাতে... এটা কিন্তু ভীষণ অন্যায়, মাসুদ ভাই।’ গল্পটি ফোন করেন, শুধু সৈকতদার খোঁজ নেন, এ বাড়িতে আমরা আর কেউ নেই?’ রানা যতদূর জানে, বাড়িটার সৈকতের এই ইটনিষ্ঠা সিটিতে পড়ুয়া বোনটি ছাড়া আর কেউ থাকে না। ‘কই, তুলেও তো একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন না।’

‘ঠিক আছে, আসব একদিন.’ বলে ডাড়াডাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

চিন্তায় পড়ে গেল ও। রিসিটওয়াচ দেখল। পোনে দশটা। শাহেদ নেই, সৈকত নেই—তবে কি মুকুল, কারেস এদেরকেও পাওয়া যাবে না?

ভয়ে ভয়ে কোন করল আবার রানা। প্রথম কারেসকে। সদা বিয়ে করেছে, বাড়িতে থাকারই বোলা আনা সম্ভাবনা, তবে রানা যদি কোন কাজ দেয় আনন্দের সাথে সেটা করে দেবে সে। কিন্তু ওর বউ জানাল, কারেস তো গতকাল সিলেট গেছে।

রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা। অসহায় বোধ করছে ও। মুকুলই এখন শেষ ভরসা। তাকে যদি পাওয়া না যায়...সর্বনাশ! ভাবল করতে শুরু করেও হাতটা পাথর হয়ে গেল রানার। ছি, ছি। মনেই ছিল না। টিভির ‘যদি কিছু মনে না করেন’ অনুষ্ঠানে খোঁজার উত্তর দিয়ে বাংলাদেশ বিমানের রিটার্ন টিকেট পেয়েছিল,

সেটা নিয়ে সিঙ্গাপুর গেছে মুকুল, ফিরে আসবে পরও ।

এখন উপায় ? হাতে রিসিভার নিয়ে ঝাড়া এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল রানা । একে একে আরো কয়েকজনের কথা মনে পড়ল । হু'একজন জরুরী কাজে ব্যস্ত, তাদেরকে পাওয়া যাবে না । হু'একজনকে পাওয়া গেলেও, তাদেরকে এই রকম ছোটখাট কাজ দেয়া সম্ভব নয় । আবার রিস্টওয়াচ দেখল ও । দশটা । নিজের ওপর শুধু বিরক্ত নয়, আতিকুল্লাহ খানের জীব ভাল-মন্দ ভেবে উদ্বেগ বোধ করল ও । কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না । বুধা চেষ্টা ছেনেও আরো কয়েক জায়গায় ফোন করল ও । হু'জনকে পাওয়া গেল, কিন্তু তাদের ব্যস্ততার নমুনা শুনে নিজের সমস্যার কথাটা চেপে গেল ও । সবশেষে আবার শাহেদ আর সৈকতের বাড়িতে ফোন করল । ফেরেনি ওরা ।

পরাজয় মেনে নিল রানা । মাথা নিচু করে ফিরে এল টেবিলে । ওকে দেখেই উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল শিমুল, 'কি ব্যাপার, ডিউক ?'

'কিছু না,' মেজাজ বি'চড়ে থাকলেও অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বলল রানা, 'খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে ।' ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল ও ।

রাতটা ডিউকের সাথে কাটানো হচ্ছে না, বুঝতে পেরে মনকুহ্ন হল শিমুল, রানা সেটা টেরও পেল, কিন্তু কেউই এ-ব্যাপারে কোন কথা বলল না । একটু পরেই টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটার । হাত চালিয়ে খাওয়া শেষ করল ওরা ।

সোয়া এগারোটায় বাসাবোয় পৌঁছল রানা । পথে শিমুলকে রানা ২৮

ভানের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। দেরি হয়ে গেলেও, আচরণে কোন রকম তাড়াহড়োর ভাব নেই ওর মধ্যে। খুব আন্তে গাড়ি চালিয়ে ৩ নং নম্বর বাড়িটা পেরিয়ে এল। গল্প ত্রিশেক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা একটা জায়গা, সেখানেই গাড়ি দাঁড় করাল ও। স্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভারের সীট ছেড়ে পেছনের সীটে এসে বসল। এখান থেকে বাড়ির প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখা যায়।

অপেক্ষা ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে। মনে মনে ভাবল রানা। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাসের কোন আলামত চোখে পড়ল না। ভেতরে টোলভিশন চলছে, বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার আওয়াজ। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল ও। বেশ রাত হয়েছে, রাস্তায় লোক ঢোলাঢোল একেবারেই নেই, আশপাশের বাড়ি-ঘরগুলো একটু দূরে দূরে, অশ্রুত এখন পর্যন্ত কোন জানালা খুলে কেউ লক্ষ্য করছে না ওর গাড়িটাকে।

আধ ঘণ্টা বসে থাকল রানা। নিজের ওপর রাগে ফঁসেছে, তাছাড়া আর করার আছেই না কি এখন। এর মধ্যে ছুটো রিজ্ঞা আর একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে গেছে। আরো-হীরা কেউই ওর দিকে তাকায়নি ভাল করে। বারটার দিকে নড়ে-চড়ে উঠল ও। একটা সিগারেট ধরাল। গাড়ি থেকে বেরুতে যাবে, এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল—আচমকা লাকিয়ে নেমে এল ঘন কাল অন্ধকার। বাড়িটার প্রবেশ-পথের ওপর চোখ রেখে সিগারেট ফুঁকছে ও, আর ভাবছে আজ ঘুম থেকে ওঠে কার মুখ দেখেছিল...

সাড়ে বারটার দিকে ক্লান্তি অনুভব করল রানা। ঘুম তাড়াবার জন্যে আবার একটা সিগারেট ধরাল। এখন পর্যন্ত বাড়িটার গেট দিয়ে একটা বিড়ালও ঢোকেনি বা বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু বিদ্যুৎ না

খাকায় নজর রাখতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। খানিক পর গাড়ি হেড়ে নামল ও, রাস্তা পেরোল, চলে এল বাড়িটার গেট পর্যন্ত। ছোট্ট একটা উঠোন দেখা গেল ভেতরে। কিন্তু বাড়ির ভেতর কোন আলো নেই। বিছাৎ চলে যাওয়ায় মোমবাতি বা লণ্ঠনের যে ক্ষীণ আলোর আশা করা গিয়েছিল তাও নেই। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হল না। বাড়ির পিছন দিকটাও ঘুরে এল রানা। না, কোন ঘরে কোথাও আলো নেই। তাহলে টিভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যে ? পাশের বাড়ির ? শুনতে ভুল করেছে ও ? হয়ত তাই।

গাড়িতে ফিরে এল রানা। বেশ একটু হতাশ হয়ে পড়েছে ও। মনে হয়, আতিকুল্লাহ খান এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হবার সাথে সাথে তার জীও বেরিয়ে পড়েছেন, হয়ত কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন, অথবা... চিন্তার লাগাম টেনে ধরল ও। অনুমান করে কোন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে যা তা একটা কিছু ভাবা উচিত নয়। তিনি যে বিপদে পড়েননি, তাই বা কে বলবে। দোষটা তো তারই, সময় মতো নজর রাখার জন্যে আসতে ব্যর্থ হয়েছে সে। গাড়িতে ফিরে এসে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। ভাবছে কি করা যায়। সারারাত এখানে বসে কাটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। একটার মতো বাজে, কোথাও গিয়ে থাকলে, আজ রাতে কি আর ফিরবেন ভদ্রমহিলা ? মনে হয় না। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে নেই, তাও কি জোর করে বলা যায় ? যায় না। হয়ত বিপদ সম্পর্কে তিনিও সচেতন। তাই আলো না ঝেলে, কোন আওয়াজ না করে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন মানুষে মনে করে বাড়িতে কেউ নেই। বিশ্লেষণ, গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তোষ তাতে আরো বেড়ে গেল। রাস্তাটা এখন এই গাড়ির ভেতর বসেই কাটাতে হবে

তাকে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত। বলা যায় না, রাত আরো খানিকটা বাড়লে সত্যি বিপদ হতে পারে ভদ্রমহিলার।

কিন্তু অপরদিকে অল্পত এক ধরনের অস্বস্তিসোধ করছে রানা, ক্রমেই একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে ওর মনে।

রাত ছটোর দিকে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। চোখে মুখে রোদ এসে লাগতে লাগল সে-ঘুম। ঘড়িঘড়িয়ে উঠে বসল ও। গলার কাছে চিনচিনে একটা বাখা। ইস্। অল্পত চারটি ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। অথচ এই সময়টাতেই বেশি সজাগ থাকার কথা ওর।

রাস্তার মোড়ে দেখা গেল খবরের কাগজের হকারকে। ৩৮/খ নম্বর বাড়িটাকে ছাড়িয়ে ঠিক উল্টোদিকের একটা বাড়িতে ঢুকল সে। একটু পরই বেরিয়ে এল আবার, গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু নিল রানা। আধা-বয়েসী লোক, মুখে কাচা-পাকা দাড়ি। ঘাড় কিরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রানার দিকে। তারপর কিরে দাঁড়াল।

‘৩৮/খ নম্বর বাড়িতে পেপার দিলে না যে?’ জানতে চাইল রানা।

‘হেরা কেউ নাই অহন।’ ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল হকারের। ‘কেন কন দেহি? আপনারে তো আগে কুনো দিন দেহি নাই?’

চালাক-চতুর লোক, উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে কোন কথা আদায় করা যাবে না। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একটা নোট বের করল রানা। ‘ওই বাড়ির লোকদের চেন তুমি?’

‘চিনি। কিন্তু ঘেরাভো ঈদের ছুটিতে দ্যাশের বাড়িতে বেড়াই-তে গেছে।’

‘হেরা কারা ? নাম কি ?’

‘গজনকর আলি ।’

‘কিন্তু আমি জানি বাড়িটায় এখন আতিকুল্লাহ খান থাকেন, স্ত্রী আর একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে ।’

দশ টাকার নোটের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল লোকটা ।

‘আপনে ভুল হনছেন, সাব । অহন বাড়িটায় কেউ থাকে না ।

মহল্লার সকল বাড়িতে আমিই পেপার দেই, আর আমি জানুম না ?’

‘কিন্তু গজনকর সাহেব আর কাউকে বাড়িটা ভাড়াও তো দিয়ে যেতে পারেন ?’

‘আজ আট-নয় বছর ধইরা গজনকর সাহেব আমার পেপার নিতাহে । আইজ শুক্ এই বাড়ি ভাড়া দেয় নাই । পরতেক বছর ঈদের মাসটা তারা দ্যাশের বাড়িতে কাটায় ।’

ঘুরে চলতে শুরু করল লোকটা ।

‘তুমি এই এলাকায় আতিকুল্লাহ খান বলে কাউকে চেন না ?’
নোটটা সামনে বাড়িয়ে দিল রানা ।

‘এই মহল্লার পরতেকরে আমি চিনি, সাব,’ দশ টাকার নোটটা আস্তে করে পকেটে ফেলে বলল লোকটা । ‘আতিকুল্লাহ নামে এখানে কেউ নাই ।’ হনহনিরে চলে গেল হকার, ওপাশের একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল ।

বাড়ির নম্বর ঠিক আছে তো ? সন্দেশ জাগল রানার মনে ।
উহু, কোন ভুল হতে পারে না । টেলিকোনে নম্বরটা স্পষ্ট শুনেছে
ও । ভাড়াডা, আতিকুল্লাহর পাঠানো এনভেলোপে যে চিরকুট ছিল
তাতে এই নম্বরই লেখা ছিল । তাহলে ? ব্যাপারটা কি ? ফাঁকি
একটা বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করল
রানা-৯

লোকটা ? রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার গেটের কাছে আবার চলে এল ও। দিনের আলোর সব এখন পরিষ্কার। দরজা-জানালা তো বটেই, জানালার ভেতরের শাটারগুলো পর্যন্ত ফেলা। বাড়িটা একেবারে খালি, কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই।

গাড়িতে ফিরে এল রানা। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল। মেজাজ যে শুধু খিঁচড়ে গেছে তাই নয়, শুধু যে নিজের ওপর রাগ হয়েছে, তাও নয় ; ওর বুদ্ধিকে অপমান করা হয়েছে বলে আতিকুল্লাহ খানের ওপর অচণ্ড রেগে গেছে ও।

নির্জন ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি দুটিয়ে রান্নি দিল্লিতে পৌঁছতে পনের মিনিটের বেশি লাগল না এর।

চাবি বের করে অফিস গরের দরজা খুলতে যাবে রানা, কিন্তু তার আগে হাতলে হাত দিয়েই থামল ও, দরজা খোলা রয়েছে। অথচ গতরাতে চাবি লাগাতে তুল গয়নি তার, চাবি লাগিয়ে কবাত ঠেলে দেখেছে সে-কথাও স্পষ্ট মনে আছে তার। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঢুকতেই চোখে পড়ল, ভেতরের দরজা হাট করে খোলা, অথচ ওটাতেও চাবি লাগিয়ে গেছে ও।

সম্ভবত চীনা একটা মেয়ে, দেখতে খুব মিষ্টি, বসে আছে চেয়ারে। ভাঁজ করা হাত দুটো কোলের ওপর। চোখ দুটো শান্ত, কোন চঞ্চলতা নেই। সরু একটা রক্তের ধারা নৈমে গেছে ঠিক বীজনের নিচে থেকে। মনে হল, খুব কাছ থেকে অভ্যস্ত যন্ত্রের সাথে গুলি করা হয়েছে। মেয়েটার চেহারায় একটুও আতঙ্কের ছাপ নেই। আতঙ্কিত হয়ে ওঠার আগেই মারা গেছে সে। খুনি বোধ হয় পরিচিত কেউ হবে। একটা হাত বাড়িয়ে মেয়েটার গাল স্পর্শ করল রানা। ঠাণ্ডা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে।

মেকের দিকে ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা। শুধু অপমান নয়, আতিকুল্লাহ খান তার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ধীরে ধীরে একটা হাত বাড়াল ও। ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। খানার নশ্বরে ডায়াল শুরু করল।

দুই

পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করার সময় তার এই মঙ্গোলীয় অভিধিকে ভাল করে দেখল রানা। একে বিদেশী মেয়ে, তার চীনা, বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যেই হবে বলে ধারণা করল ও। পরনের জামা-কাপড়গুলো বেশ দামী, পায়ে আনকোরা নতুন জুতো। হাতের নখগুলোয় যত্নের স্পর্শ, চুলগুলো সমস্তে পরিপাটি করা। সাথে ভ্যানিটি ব্যাগ দেখল না-ও, ভুরু কুঁচকে আশপাশে একটু খোঁজাখুঁজিও করল, নেই। সম্ভবত খুনী নিয়ে গেছে ওটা। কিন্তু না, এট মেরেকে কব্বিনকালেও দেখেনি রানা।

একটু পরই অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে। সবার আগে ঘরে ঢুকল গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। আগেও দু'একবার তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ডিউকের। লোকটার চেহারায় খুঁততার ছাপ থাকলেও কথায় বা কাজে তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু

সার্জেন্ট আলতাককে পিছনে নিয়ে এমন একটা ভারি চালে ঘরের ভেতর ঢুকল সে, যেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পায়ে ঠেলে সামান্য একটা ব্যাপার দেখতে এসেছে। হু'জনের কেউই রানার দিকে তাকাল না। সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল লাশের সামনে। ঝাড়া তিন মিনিট পরীক্ষা করল। লাশের পাশে কিছু পরীক্ষা করার জন্যে এক সময় হাঁটু মুড়ে বসল আলতাক। ফয়েজ আহমেদকে সাথে নিয়ে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল রানা।

এরই মধ্যে ফয়েজ আহমেদের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। ডেস্কের ওপর এসল সে, খুলে খাকা পা দুটো দোলাতে দোলাতে বলল, 'সত্যি কথা বললে নিজের অপকার করা হবে, ডিউক। মেয়েটা কি তোমার কোন ক্রায়েন্ট ছিল?'

'না। ওকে আমি চিনি না, কোন দিন দেখিনি। খানিক আগে ঘরে ঢুকে ঠিক ওভাবে বসে থাকতে দেখেছি চেয়ারে।'

'হু,' এমন ভাবে মাথা দোলাল ফয়েজ আহমেদ যেন সে আশাই করেছিল ডিউক সত্যি কথাটা বলবে না। 'তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও। নিশ্চয়ই তুমি রোজ এত সকালে অফিস খোল না। আজ কেন এসেছ?'

গত রাতে যা যা ঘটেছে সবই খুলে বলল রানা। প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ করে আলতাক আর তার সঙ্গীরাও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনল সব।

'হ্যাওবাগ?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ। 'সেটা কোথায়?'

'আমিও খুঁজেছি। পাইনি। বোধহয় খুন্সী ওটা নিয়ে গেছে।'

এতক্ষণে সোজাশুজি রানার চোখে তাকাল ফয়েজ আহমেদ।

‘নিশ্চয়ই খুব দামী কিছু ছিল মেয়েটার সাথে। কিন্তু যত দামীই হোক, সেটার লোভে একেবারে খুনই করে ফেললে ?’

এই হল বেচারার ফয়েজ আহমেদ। খুব ভাড়াভাড়ি খুব সহজ সরল সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত। অবশ্য টেলিফোন করার সময়ই রানার মনে হয়েছিল, ফয়েজের প্রথম সন্দেহটা ওর ওপরই পড়বে।

‘হ্যাঁ, খুন করে ফেললাম,’ কৃত্রিম বোকার হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল রানা। ‘চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছিল ওর ভ্যানিটি ব্যাগে, দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার নিজের অফিসে ওকে খুন করলে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করবে, এই কথাটা তখন মনে ছিল না। ইন্সপেক্টর, প্লীজ, ভুলটা সংশোধনের একটা সুযোগ দিন আমাকে।’ হাসি ধামিয়ে চেহারাটা গভীর করে তুলল রানা। ‘কাউকে নিজের অফিসে খুন করব, আমাকে দেখে অত বোকা মনে হয় আপনার ? খুন যদি একান্তই দরকার হয়, ঠিকানা খুঁজে বের করে সেখানেই...’

‘এটা একটা মার্ডার কেস, কাজেই মস্করা করে ব্যাপারটার গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা কর না,’ ধমধমে গলায় বলল ফয়েজ আহমেদ।

‘এটা একটা মার্ডার কেস, কাজেই বোকার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে খুনীকে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না।’

কটমট করে তাকাল ইন্সপেক্টর। ‘আমাকে বোকাও, এখানে কি করতে এসেছিল মেয়েটা, তোমার অফিসে ঢুকলই বা কিভাবে ?’

‘জানি না। তবে অনুমান করতে পারি ?’

‘সেই অনুমানটাই বয়ান করে কৃত্তার্থ কর আমাকে।’

গতকালকের টেলিফোন ও রাতে বাড়ি পাহারার কথা আবার বলল রানা। তারপর বলল, ‘হয়ত আমার কোন সাহায্য দরকার

ছিল মেয়েটার। কিন্তু ওর সাথে আমার দেখা হোক তা চায়নি আতিকুল্লাহ খান। মেয়েটার যখন আমার চেয়ারে আসার কথা তার আগেই আমাকে ফাঁকা একটা বাড়ি পাওয়া দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিল। ভালোগুলো সাধারণ, মূলতঃ কোন অনুবিধে হয়নি তার। ঘরে ঢুকে মেয়েটা দেখে আমার ডেপের ওপাশে বসে আছে একজন লোক, মানে খান, কিন্তু খানকেই ডিউক বলে মনে করে সে। লোকটাকে চিনত না মেয়েটা, ওর মুখে আতঙ্কের কোন ছাপ নেই দেখেই বলছি কথটা।’

সার্বোত্তম আলতাকের দিকে ডাকাল ফয়েজ আহমেদ। ‘বুঝতে পারছ কিছু? ডিউক সাহেবের যা মাথা, তাতে আর তোমাদেরকে করে কন্সে খেতে চলে না।’ পরমুহুর্তে গম্ব মেয়ে গেল সে, মাথা নিচু করে কয়েক মৃত্তক পরে কি গেন গভীর ভাবে চিন্তা করল, সব-শেষে হঠাৎ মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাটল, ‘তা মেয়েটাকি টেলিফোন না করেই এসেছিল?’

‘হয়ত টেলিফোন করেই এসেছিল। তখন আতিকুল্লাহ খান আমার অফিসে চলে এসেছে। রিসিভার তুলে বলেছে, যেন ডিউক বলেছে, চলে এস আমার এখানে।’

আবার কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে ছ’পা এগিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে এল রানার সামনে। ‘বিদেশী মেয়ে, ওর পরিচয় ইত্যাদি বের করতে খুব একটা সময় লাগবে না। কিন্তু ওই আতিকুল্লাহ...সে কি আর দেখা করবে তোমার সাথে?’

‘কোন সম্ভাবনা নেই।’

‘হু’, মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। তারপর রিস্ট-

ওয়াচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ‘তোমার চেহারা দেখছি একেবারে চূপসে গেছে। চা খাবে নাকি? যাও, গলাটা ভিজিয়ে এস। আর, ইয়া, এ-ব্যাপারে লোকজনের সাথে বেশি কথাটথা বল না যেন। তোমার সাথে বসব আমি আশ-ঘন্টা পর।’

খুব সদয় ব্যবহার? মোটেই না, আসলে কিছুক্ষণের জন্যে রানাকে কাটাতে চাইছে কয়েক আহমেদ। রানাও কেটে পড়তে চায়, সাথে সাথে দরজার দিকে এগোল সে। পেছন থেকে ভারি গলায় সতর্ক করে দিল কয়েক আহমেদ, ‘শুধু চা খেয়েই কিন্তু ফিরে আসবে। তোমার আর কোথাও যাওয়া চলবে না।’

বাইরে বেরিয়ে এসে কোন দিকে তাকাল না রানা, সোজা ক্যান্টিনের দিকে এগোল। পেছনে বৃট জুতোর আওয়াজ শুনে বুঝল, পুলিশ-প্রহরায় চা খেতে হবে।

ডিম পোচ আর চায়ের কথা বলে একটা চেয়ারে বসল রানা, টেবিলের ওলা দিয়ে ছড়িয়ে দিল পা দুটো। হঠাৎ দেখল, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে হুসুম আলি, ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে পুলিশের গাড়ি আর আমবুলেন্স দেখছে। রানাকে দেখেই তার চেহারা উত্তেজনা ফুটে উঠল। হন হন করে এগিয়ে এল সে। রানার দিকে ঝুঁকে, ফিস ফিস করে জানতে চাইল, ‘ব্যাপারডা কি, স্যার? মনে অইল আপনের অফিসে?’

ক্যান্টিনের ঠিক বাইরেই, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ কনস্টেবল। তার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা, ‘আচ্ছা, হুসুম আলি, কাল রাত ক’টার এখন থেকে গেছ তুমি?’

‘এগারোটায় দিকে, স্যার। কিন্তু স্যার আপনের অফিসে কি

অইছে তা তো কইলেন না ?

‘খুন। একটা মেয়ে খুন হয়েছে।’

‘খুন ?’ চমকে উঠল হকুম আলি।

ওপর নিচে মাথা ঝাঁকাল রানা।

‘একটা মাইয়ামানুষ ?’ হকুম আলির কণ্ঠনালী তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে।

‘হ্যাঁ। একটা চীনা মেয়ে।’

খুন শুনে সেই যে কপালে উঠেছে হকুম আলির ভুরু জোড়া তা আর নামছে না। তাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রানা জানতে চাইল, ‘কাল আমি বেরিয়ে যাবার পর কোন চীনা মেয়েকে বিল্ডিঙে দেখেছ ?’

মাথা নাড়ল হকুম আলি। না।

ডিম পোচ আর চা দিয়ে গেল বেরারা। খিদে থাকলেও, মুখে রুচি নেই রানার। সব কেমন বিষাদ লাগল ওর। কাল রাত এগারটায় শিমুলকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত ওর একটা আলিবাই আছে। তারপর ? তারপর তো গজনকর আলির খালি বাড়ি সারারাত পাহারা দিয়েছে এক।। মেয়েটা যদি এগার-টার পর খুন হয়ে থাকে ?

‘স্বামি বেরিয়ে যাবার পর অপরিচিত কাউকে আমার অফিসের কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখনি তাহলে ?’

‘না, স্যার। মনে পড়তাকে না। বিল্ডিঙের দারওয়ান তো সাড়ে দশটা বাজতেই তালা লাগাইয়া দিছিল, আমাগোর যাওনের সময় খুইলা দিছিল গেট।’ আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় হকুম আলি। ‘খুন, আপনি ঠিক জাইনা কইতাছেন, স্যার ? করল কেডা ?’

‘জানি না,’ বলল রানা। ‘চুপ করে থাক।’ চারের কাপে চুমুক দিতে ভাল লাগছে না ওর। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। কয়েক আহমেদকে নিয়ে বিপদ হল, সব কিছু নিজের মতো করে বুঝতে চায় সে। পানির মতো সহজ ব্যাপারও তার কাছে ভীষণ জটিল মনে হয়, আবার সাংঘাতিক কঠিন কোন সমস্যার সমাধান নিজের মতো করে এক নিমেষে সেরে ফেলে। ওকে সন্দেহ হয়েছে তার, কাজেই খুঁনি নিজে এসে ধরা দিলেও ডিউকের পিছন ছাড়বে না সে।

হু’জন লোক ঢুকল ক্যান্টিনে, ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ম্যান-জারের সাথে ‘পুলিশ কেন’ ‘কি হয়েছে’ ইত্যাদি আলাপ শুরু করল। হু’তিন চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা, বেরিয়ে এল ক্যান্টিন থেকে। পিছু নিল পুলিশ। পিছন থেকে হেঁড়ে গলার জানতে চাইল, ‘যাওয়া হচ্ছে কোথায়?’

ধাড়িয়ে পড়ল রানা। ‘কেন? অফিসে। অসুবিধে আছে কিছু?’

‘সার না ডাকলে ওখানে আপনার ফেরা চলবে না। নিচে গিয়ে গাড়িতে বসতে পারেন।’

ভর্ক করা বৃথা। এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে এল রানা। পুলিশটাও সাথে সাথে থাকল। ফটকের কাছে দাঁড় করান পুলিশের গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। এরই মধ্যে চারপাশে ভিড় জমে গেছে। কয়েক জোড়া ধোতুহলী চোখ উকি-ঝুঁকি মেরে দেখছে ওকে। কারো দিকে না তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। কিছুটা অনামনস্ক হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা নিয়ে বতই ভাবছে, ততই বিচ্ছিন্ন লাগছে ওর। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বেশ মাথা খাটিয়েই কীদে ফেলা হয়েছে তাকে।

ঘটাখানেক পর লাশ নিয়ে চলে গেল অ্যামবুলেন্স, তার সাথেই রানা-২৮

চলে গেল মেডিকেল অফিসার, পুলিশের একটা গাড়ি। মেডিকেল অফিসার গাড়িতে ওঠার আগে পাহারারত কনস্টেবলকে ইঙ্গিতে কি যেন বলল। রানা বুল, ডাক পড়েছে ওর।

পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে ফটক পেরোতে যাচ্ছে ও, এই সময় জাকের আলি চৌধুরী, সেই ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট, তার গাড়ি থেকে নেমে রানার পাশে চলে এল। এক সাথেই এলিভেটরে চড়ল ওরা।

জাকের আলি চৌধুরীর চলনে বলনে একটা খেলোয়াড় স্তম্ভ ভাব আছে—বেশ স্কিপ্র এবং স্মার্ট। বয়সও এমন কিছু বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। মাঝে-মধ্যে দেখা হয় রানার সাথে, হয় অফিসে ঢোকান মুখে, নয় এলিভেটরে, সাধারণ ছ'চারটে কথা-বার্তাও হয়। হুম আলির মতো, এরও বিখ্যাত মাস্তান ডিউক সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ—কিন্তু সরাসরি তা কখনই প্রকাশ পায় না। চুটিয়ে গল্প করার সুযোগ না ঘটলেও, দাপট দেখান টুকরো গল্প একেও ছ'একটা শুনিয়েছে রানা, সেগুলো বেশ উপভোগও করেছে জাকের চৌধুরী।

‘পুলিশ কেন, জানেন কিছু?’ জানতে চাইল জাকের আলি চৌধুরী। এলিভেটর উঠতে শুরু করেছে ওপরে।

‘সকালে অফিস খুলে দেখি আমার চেম্বারে একটা চীনা মেয়ের লাশ।’

‘লাশ?’ প্রায় টেচিয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। ‘ওহ্, নো। তা কি করে সম্ভব।’

‘একজন খুনীর পক্ষে অ্যান্ড একটা মানুষকে লাশে পরিণত করা খুবই সম্ভব,’ গভীর সুরে বলল রানা। ‘গুলি করে খুন করা হয়েছে মেয়েটাকে।’

জাতকে উঠল জাকের চৌধুরী। ‘গুলি করেছে ৭ মানে, খুন ৭’

‘হ্যাঁ,’ কী একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। ‘কাল রাতে আপনার অফিস বন্ধ করেছেন কখন ৭ আমি যখন বেরিয়ে গেলাম, তখনও আপনি ছিলেন, তাই না ৭’

‘এই সাড়ে দশটার দিকে। দারোয়ান এসে গেটে তালা লাগাল, আমিও একটু পর চলে গেলাম। কেন বলুন তো ৭’

‘যাওয়ার সময় আমার অফিসে আলো জ্বলতে দেখেছিলেন কিনা মনে পড়ে ৭’

‘কই, না! আপনি তো কাল সাতটার দিকে চলে গেলেন, তাই না ৭’

জবাব দিল না রানা। ক্রমেই অস্বস্তি বাড়ছে ওর। এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা খুন হয়েছে এগারটার পর। তার মানে, যেসময়ের পর থেকে ওর কোন অ্যালিবাই নেই।

লিফট থেকে বেরিয়ে রানা দেখল, সার্জেন্ট আলতাফ আর বিল্ডিংয়ের দারোয়ান নিচে নামার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে কোন ভাবান্তর হল না আলতাফের, কিন্তু দারোয়ানের চোখ জোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর থেকে। হুকুম আলিকে কোথাও দেখল না রানা। ওর অফিসের সামনে টুলের ওপর দু’জন পুলিশ কনস্টেবলকে বসে থাকতে দেখে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল জাকের চৌধুরী। চট্ করে একবার আড়চোখে তাকাল রানার দিকে, বলল, ‘আপনাকে তো এখন বোধহয় লাগ লাগতে হবে। যদি কোন প্রয়োজন হয়, বলবেন।’

‘ধন্যবাদ।’

ডেস্কের পেছনে, রানার চেয়ারে তেলান দিয়ে বসে আছে গো-

য়েন্না ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। রানাকে দেখেই জানতে চাইল,
'কায়ার-আর্মস আছে তোমার কাছে ?'

'আছে।'

'লাইসেন্স ?'

'আছে।'

'কি আর্মস ?'

'পয়েন্ট ব্লি-টু ওয়ালথার পি. পি. কে।'

হাত পাতল ফয়েজ আহমেদ। 'দাও।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ডান দিকের ড্রয়ারে, ওপরের
দেয়ালে আছে।'

অপলক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে ঝাড়া পনের সেবেও চুপচাপ
ভাকিয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর বলল, 'নেই। ছোটো কাম-
রার কোথাও খুঁজতে বাকি রাখা হয়নি। নেই।'

বিপদটা আরো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে
হল না রানার। তবু শাস্তভাবেই উত্তর দিল, 'ওখানেই থাকার কথা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার জন্যে
আরো একটা হুঃসংবাদ আছে, ডিউক। মেয়েটাকে একটা পয়েন্ট
ব্লি-টু পিস্তল দিয়েই গুলি করা হয়েছে। মেডিকেল অফিসারের
বিশ্বাস, মেয়েটা মারা গেছে আজ ভোর তিনটে নাগাদ। মিছেই
পানি ঘোলা করছ, ডিউক। তোমাকে আমি এই শেষ একটা সুযোগ
দিচ্ছি, সত্যি কথা বলে হয়রানীর হাত থেকে বাঁচাও আমাকে, তা না
হলে তোমার কপালে খারাবী আছে।' একটু বিরতি নিল সে, তার-
পর জানতে চাইল, 'কি ছিল মেয়েটার ব্যাগে ?'

অনেক কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখল রানা। 'আবার সেই বোকার

পাশের কামরা

মতো কথা। নিজের অফিসে ক্রায়েন্টকে বসিয়ে নিজেরই পিস্তল দিয়ে তাকে খুন করার মতো বুদ্ধি কেউ আছে ?’

‘কি জানি।’ রানাকে বাধা দিয়ে বলল ফয়েজ আহমেদ। ‘ইয়ত দুঃসই একটা অ্যালিবাই আগেভাগেই তৈরি হবে তারপর কাজে নেমেছ তুমি।’

‘কাল সারারাত কি করেছি, কোথায় ছিলাম সবই তো। আপনাকে বলেছি। সেরকম কোন প্লান থাকলে অ্যালিবাইটা ভোর তিনটে পর্যন্ত করে রাখতাম।’

‘দেখ, ডিউক,’ অস্থির অথচ অন্তরঙ্গ সুরে বলল ফয়েজ আহমেদ, ‘এটা একটা মার্ডার কেস। পত্রিকার লোকেরা এটার পেছনে আদা-জল খেয়ে লাগবে। জীবনটাকে হেল বানিয়ে ছাড়বে ওরা। ওদেরকে দেয়ার জন্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আমার দরকার। তখন অনুমান করে কি বলতে যাচ্ছিলে, বল, আমি শুনব। তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমিও তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আমার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে, তাতে অনায়াসে তোমাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে তা আমি করছি না, তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। এখন প্রমাণ কর যে আমার ধারণা ঠিক নয়, ভুল।’

ডেস্কে বসে একমনে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল রানা, তারপর বলল, ‘ধরা যাক, মেয়েটা কোলকাতা থেকে এসেছে। এখানকার, মানে ঢাকার কাউকে, ধরুন আমাকেই, জরুরী কিছু বলার ছিল তার। খুন্সী প্ল্যান মার্কিন আমার টেলিফোন নম্বার দিয়েছিল তাকে। কাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে সিদ্ধান্ত নেয় মেয়েটা, রাতের ক্লাইটেই ঢাকায় পৌঁছুবে সে। ঢাকায় পৌঁছেই যাতে আমাকে পায়, তার জন্যে ওই সাতটার সময় ঢাকায়, আমার নাম্বারে টেলিফোন করেছিল সে।

তখন কিন্তু অফিসে নেই আমি, আমাকে ঝাঁকা বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে আমার চেয়ারে বসে আছে আতিকুল্লাহ খান। মেয়েটাকে আমি, মানে ডিউক মনে করে জানাল, রাত ছটো নাগাদ ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছবে সে। আতিকুল্লাহ তাকে বলল, সে যেন সোজা অফিসে চলে আসে। এয়ারপোর্ট থেকে মেয়েটা এলও তাই। আতিকুল্লাহকে আমি মনে করে মেয়েটা তার কথা সব বলল, এবং সব শানার পর তাকে তুলি করল আতিকু...

‘তোমার পিস্তল নিয়ে?’

‘হ্যাঁ, আমার পিস্তল নিয়ে।’

‘কিন্তু রজি বিল্ডিংয়ের গেট তো রাত এগারটায় বন্ধ হয়ে যায়? তালাও ভাঙা হয়নি। আতিকুল্লাহ বা মেয়েটা ভেতরে ঢুকল কিভাবে?’

‘দারোয়ান গেট বন্ধ করার আগেই আতিকুল্লাহ ঢুকে পড়ে। আমি যে কাছেপিঠে নেই, তা তো সে জানতই—কাজেই নিশ্চিত মনে আমার চেয়ারে বসে ফোন ধরেছে, তারপর মেয়েটার আসার সময় হতেই নিচে নেমে খুলে দিয়েছে গেট। গেটে তো ইয়েল লক, কাজেই ভেতর থেকে খুলতে কোন সম্ভাব্যেই হয়নি তার।’

‘জমজমাট সিনেমার গল্প।’ তেতো হাসি ফুটল ফয়েজ আহমেদের ঠোঁটের কোণে।

‘আমার অনুমানটা অবশ্য যাচাই করে দেখতে হবে। এয়ারপোর্টে গিয়ে ট্যাক্সি ওয়ালাদের জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে কিছু

‘আর বানানো আতিকুল্লাহ খান? তার খবর কে দেবে, কাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে?’

‘আতিকুল্লাহ কোন বানানো লোক নয়,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা।

‘এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সাভিসে গিয়ে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ওদেরকে দিয়ে সে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। আর আমি উত্তর বাসাবোর একটা বাড়ির সামনে সারারাত ছিলাম, ভাল করে খোঁজ করলে তারও সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। রাত দুটো-তিনটোর দিকে আমার পাশ দিয়ে যদি কোন গাড়ি গিয়ে থাকে, তাহলে আরোহী বা ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য করেছে। আর সকালে হকার লোকটা যে আমাকে দেখেছে তা তো বলেইছি।’

‘এত কথায় আমার কাজ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, রাত একটা থেকে চারটে পর্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি?’

‘বলেছি তো—গজদফর আলির বাড়ির সামনে।’

‘দেখি, তোমার পকেট সার্চ করতে দাও,’ কাঁধ ঝাঁকাল ফয়েজ আহমেদ। ‘আমাদের রেকর্ড ঠিক রাখার জন্যে...’

‘পাগল না গর্দভ আপনি?’ রেগেই গেছে রানা। ‘মেয়েটার কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকলে সেটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াব আমি?’ কেউ ওর পকেটে হাত দেবার আগেই পকেট থেকে সমস্ত জিনিস এক এক করে বের করে টেবিলের ওপর রাখল ও। সেগুলোর ওপর নামমাত্র একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ফয়েজ আহমেদ।

বলল, ‘হু’, ঠিক আছে। ডেস্ক ঘুরে এল, এগোল দরজার দিকে। ‘তবে, শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না তোমার। আরো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তোমাকে গ্রেফতার করেও লাভ নেই, ফসকে বেরিয়ে যাবে তুমি। সমস্ত ব্যাপারটা শুদ্ধিয়ে নিতে দাও, তারপর তোমাকে আমি দেখে নেব।’ দরজাটা হাট করে খুলে রেখে গট গট করে বেরিয়ে গেল সে।

সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল রানা। এখনও জোরাল কান

কেস দাঁড় করান যায়নি ওর বিরুদ্ধে, তবে চেষ্টা চালিয়ে বাবে
কয়েক আহমেদ। সেই সাথে, জানে রানা, ওকে আরো ভালভাবে
কাঁসাবার জন্যে পুলিশের সামনে আরো কিছু সূত্র ছড়িয়ে দেবে খুনী।
পিস্তলটা সেই মতলবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অফিস বন্ধ করে নিচে নেমে এল ও। গাড়িতে উঠে বসার পর
মনে পড়ল, ভুলে ফেলে রেখে এসেছে সিগারেটের প্যাকেট। ড্যাশ-
বোর্ডের নিচের কম্পার্টমেন্টে একটা প্যাকেট থাকার কথা। ভেতরে
হাত ভরতেই শক্ত, ঠাণ্ডা কি যেন একটা ঠেকল। সারা শরীরে
একটা ভয়ের ঝাঁকুনি অনুভব করল রানা।

গ্রাভ কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে এক এক করে বের করল ও
প্রথমে একটা পিস্তল, ওর নিজের পিস্তল, তারপর গো সাপের চামড়া
দিয়ে তৈরি একটা হাতব্যাগ।

শি

সি. আই. ডি হেড কোয়ার্টার।

গাড়ি থেকে নেমে অফিস ভবনের দিকে পা বাড়াল ইন্সপেক্টর
কয়েক আহমেদ, এই সময় পেছন থেকে ডাক এল। ঘাড় ফিরিয়ে
দেখল নিজের গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে রঙবাজ চুড়ামণি
ডিউক। কাঁধ ছোটো শক্ত হয়ে গেল কয়েক আহমেদের। তিরিকি
মেজাজে প্রশ্ন করল, 'তুমি। তুমি এখানে কি করছ ?'

হাতের মুঠো খুলে দেখাল রানা। 'দেখুন, কিছু নেই। ছিনতাই-

টিনতাই করতে আসিনি। আপনার সাথে আমার কথা আছে।’

‘বল কি কথা।’

‘আমার গাড়িটা সার্চ করতে ভুলে গিয়েছিলেন আপনি, তাই ওটা নিয়ে এসেছি।’

আবার শক্ত হল ফয়েজ আহমেদের কাঁধ। ‘তোমার গাড়ি সার্চ করতে হবে কেন?’

‘সার্চ শুরু করলেই বুঝতে পারবেন কেন। যদি জিজ্ঞেস করেন, প্রথমে দেখতে বলব ড্যাশবোর্ডের নিচের খুপরিটা।’ গাড়ির দরজা খুলে দিল রানা। ‘আসুন, দেখুন।’

ঝুঁকে পড়ে খুপরিটা দেখল ফয়েজ আহমেদ। রাগের ভাবটা সাথে সাথে মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। বোকা বোকা দেখাল তাকে। কিন্তু বুদ্ধি করে পিস্তল বা হাতব্যাগ কোনটাই স্পর্শ করল না সে। প্রায় বিশ সেকেন্ড পর সোজা হল সে, তাকাল রানার চোখে। ‘ডিউক! তোমার পিস্তল ওটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘হাতব্যাগটা ওই চীনা মেয়ের?’

‘তাও কি বলার অপেক্ষা রাখে?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফয়েজ আহমেদ, রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন দ্রুত ভাবছে কিম্বা ভাবার চেষ্টা করছে। তারপর ভারি গলায় বলল, ‘এস।’

‘কোথায়?’

‘আমার অফিস ঘরে।’

অবাক দেখাল রানাকে। ‘কেন?’

‘কেন আবার, জবানবন্দি দেবার জন্যে। মেয়েটাকে যে খুন

করেছে তা স্বীকার করে একটা বিবৃতিতে সহী করতে হবে তোমাকে ।
এস । তাড়াতাড়ি কর । তোমাকে দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয়া যায় না ।’

‘দ্বিতীয় সুযোগ ?’ বলল রানা । ‘ধরুন, জিনিসগুলো দেখাবার
জন্যে আনি নি আমি । তাহলেই তো আর দ্বিতীয় সুযোগের প্রশ্ন
ওঠে না । কিন্তু আমি যখন ওগুলো দেখাবার জন্যে এসেছি, দ্বিতীয়
সুযোগ আমাকে নিতেই হবে ।’

রানার কথা শোন শুনেই পায়নি ফয়েজ আহমেদ, অস্থিরভাবে
পায়চারি শুরু করেছে সে । তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জানতে
চাইল, ‘গাড়িটায় কি সব সময় চাবি দিয়ে রাখ ?’ অর্থাৎ মাথা
খাটাতে শুরু করেছে গোয়েন্দা প্রবর ।

‘হ্যাঁ, তবে ডুপ্লিকেট চাবিও একটা আছে । সেটা পিস্তল ঘে-
দে রাখা থাকে সেখানেই রাখি । খুঁজে দেবিনি বটে, কিন্তু জানি
চাবিটা সেখানে এখন আর পাওয়া যাবে না ।’

কানের নিচেটা চুলকাতে চুলকাতে ফয়েজ আহমেদ বলল, ‘বোধহয়
তাই । পিস্তলটা খোজার সময় দে রাখা তো কোন চাবি দেখলাম না ।’

সার্জেন্ট আলতাক এসে দাঁড়াল । গাড়ি, পিস্তল, হাতব্যাগ
ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল তাকে ইন্সপেক্টর, তারপর
রানাকে নিয়ে নিজের অফিস কামরায় ঢুকল সে । চেয়ারে বসেই
মেজাজ গরম হয়ে উঠল তার । ঝাঁঝের সাথে বলল, ‘ওই পিস্তল
দিয়েই যদি খুন করা হয়ে থাকে, আর ওটা যদি তোমার—হাত
ব্যাগটা যদি মেয়েটার হয়—তুমি মরেছ, ডিউক । তোমার মাস্তান-
গিরি খতম ।’

‘তাই নাকি ?’ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা । ‘জিনিস দুটো
যদি গায়েব করে ফেলতাম, কারো সাধ্য হত না খুঁজে বের করার ।

কিন্তু আমি তা চাইনি, ইম্পেক্টর। আমি চাই এই খুনের একটা কিনারা হোক। খুনি আমার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি সেটা গ্রহণ করতে চাই। পুরো ব্যাপারটাই একটা প্ল্যান-মাস্টিক সাজান হয়েছে, সে চাইছে আমাকে খুনি ভেবে নিয়ে আপনি শুধু আমার পেছনেই লেগে থাকুন।’

বেশ কিছুক্ষণ থিম মেয়ে বসে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘ঠিক আছে, ডিউক, তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু মুশকিল কি জান, বড় কর্তাকে বোঝানো কঠিন হবে। হাতের কাছে হাজতে পোরার মতো কেউ আছে শুনলে ধৈর্য ধরে কিছু শুনতে চাইবেন বলে মনে হয় না। কাজেই তোমাকে নিয়ে কি করা হবে তা ঠিক করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন।’ উঠে দাঁড়াল সে, চিন্তিতভাবে বেরিয়ে গেল অফিস-কামরা থেকে।

বলল বটে কিছু সময়, কিন্তু ঝাড়া দশ ঘণ্টা নজরবন্দী করে রাখা হল ডিউককে। অস্বস্তিকর এক পরিবেশে ছোট একটা ঘরে সময়টা কাটাতে হল ওকে। অবশ্য ছ’একজন তরুণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গ পাওয়া গেল, লাফটাও মন্দ ছিল না, তবু এরকম একটা প্রতীকার কথা ভাবা যায় না। তাই ডাক পড়ামাত্র রানা প্রায় ছুটে চলে এল ফয়েজ আহমেদের কামরায়। এক রাশ ক্লান্তি আর তৃপ্তিস্তার নিচে ঘেন তলিয়ে আছে লোকটা, অন্তত রানার তাই মনে হল। ইঞ্জিতে বসতে বলল ওকে, অনেকক্ষণ কথা না বলে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরাল, রানার সিগারেটটাও পরিয়ে দিল। বলল ‘বুন্ধলে, ডিউক, তুমি খুব লাকি।’

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা একটু একটু করে ছাড়ল রানা। ‘লাকি?’

‘হ্যাঁ। দেখ, বার-তের ঘণ্টা ধরে আমার পুরো টীম এই কেস-

টার পেছনে খাটছে। আমরা একজন সাক্ষী পেয়েছি, তিনি তোমাকে রাত আড়াইটা তিনটের দিকে উত্তর বাসাবোয় দেখেছেন, নিজের গাড়িতে বসে ছিলে তুমি, ঘুমোচ্ছিলে। ভদ্রলোক তাঁর অশুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে অতরাতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন।’ সিগারেটে কষে একটা টান দিল ইন্সপেক্টর, তারপর আবার বলল, ‘এখন ধরে নেয়া যাক, মেয়েটাকে তুমি খুন করনি।’

‘এবার তাহলে খুনীর পেছনে লাগছেন আপনি?’

‘কিন্তু সূত্র কোথায়?’ অসহায় দেখাল ফয়েজ আহমেদকে।

‘কোথেকে তার খোঁজ শুরু করব?’

‘চীনা মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন?’

‘ওর সম্পর্কে জানতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। এয়ারপোর্ট থেকেই সব জানা গেছে। হঙকঙ থেকে এসেছিল, নাম মীর সুজি কোয়াও...’

‘মীর?’ ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

‘হ্যাঁ, প্রথমে আমারও অবাক লেগেছিল,’ বলল ফয়েজ আহমেদ।

‘আসল ব্যাপারটা হল, মেয়েটা মীর মোখলেসুর রহমানের পুত্রবধূ।’

ভুরু জোড়া আবার একটু কুঁচকে উঠল রানার। ‘মীর মোখলেসুর রহমান, মানে...’

‘হ্যাঁ কোটিপতি, শিল্পপতি মীর মোখলেসুর রহমানের কথাই বলছি আমি। তার ছেলে মীর শফিকুর রহমান এই বছরখানেক হল হঙকঙে বিয়ে করে মেয়েটাকে। একটা মোটর দুর্ঘটনায় হঠাৎ করে মারা গেছে শফিক। তার লাশ এখানে নিয়ে আসছিল মেয়েটা।’

‘কেন?’

‘মীর সাহেব চেয়েছিলেন তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানেই

ছেলেকে মাটি দেবেন। লাশ আনা বাবদ ব্যবসায়ী ধরচে তিনি পাঠিয়েছিলেন।’

‘সে-লাশ এখন কোথায়?’

‘এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে বোধহয় মীর-মঞ্জিলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।’

‘আপনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন?’

হঠাৎ কেপে উঠল ফয়েজ আহমেদ। ‘আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়ে কফিন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি। কোথাও কোন ঘাপলা নেই। রাত দেড়টায় এয়ারপোর্টে নামে মেয়েটা। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যায় রজি বিল্ডিং। এখন প্রশ্ন হল, বিদেশী একটা মেয়ে, যে ঢাকার আর কখনও আসেনি, সে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোমার সাথে দেখা করার জন্যে এল কেন?’

‘আমার সাথে নয়,’ শুধরে দিল রানা। ‘আমার নাম ভাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে আর একজনের সাথে।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদ। ‘কিন্তু কেন গেল ওখানে?’

‘মীর সাহেবের সাথে দেখা করেছেন?’

চব্বিসর্বস্ব বেচল মুখটা কদাকার হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদের। ‘করেছি বৈকি। কোটি শতী কিনা, সবই আলাদা। চোখ গরম করে শাসিয়ে দিয়েছেন আমাকে, বলেছেন, তাড়াতাড়ি ওর পুত্রবধূর খুনীকে ধরে দিতে না পারলে আমাকে নাকি দায়িত্ব পালনের অযোগ্য ঘোষণা করার ব্যবস্থা করবেন।’ কৌস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। ‘বড় কর্তারা আবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু... হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে

কোটপতি মীর সাহেব আমাকে বেকায়দায় ফেলতে পারেন।’

হাসিটা চেপে গেল রানা। জানতে চাইল, ‘বুড়ো কোন সাহায্য করবেন বলে মনে হয়?’

‘এই সব ধনী বুড়োদের সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, ডিউক। এরা সাহায্য পেতে অভ্যস্ত, করতে নয়।’

‘সেই এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারের খোঁজ পেয়েছেন—গার হাত দিয়ে টাকা পাঠানো হয়েছিল আমার কাছে?’

‘পেয়েছি, কিন্তু ঘোড়ার ডিম কিছুই জানা যায়নি। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জান, এক্সপ্রেস অফিসে এনভেলোপটা পাঠানো হয়েছিল বিকেল চারটের দিকে, আর নির্দেশ দেয়া ছিল তোমাকে যেন ওটা পৌঁছে দেয়া হয় পৌনে সাতটার দিকে। অফিসের বুড়ো কেরানীরা কেউই খেয়াল করে রাখেনি কে দিয়ে গিয়েছিল এনভেলোপটা।’

‘আর নিউম্যান করপোরেশন—ওখানে কেউ আছে আতি-কুলাহ ধান নামে?’

‘না,’ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ। ‘মেলা কাজ করেছি আজ। আর না। দেখা যাক, কাল কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় কিনা।’

রানাও উঠল। আর একটা মাত্র প্রশ্ন করার ছিল ওর। ‘খুনটা কি আমার পিস্তল দিয়েই...?’

‘হ্যাঁ। তবে পিস্তলে হাতের কোন ছাপ পাওয়া যায়নি। গাড়িতেও না। যে-ই হোক সে, ব্যাটা মহা ধুরন্ধর। তবে একটা না একটা, কোথাও না কোথাও ভুল তো সে করেছেই...সব খুনীই তা করে...’

‘সব খুনীই নয়,’ বলল রানা। ‘অনেকেই।’

ঢ়ার

পরদিন সকাল। রস্মি বিল্ডিঙ ডিউকের অফিস। ষটাখট একটা চিঠি টাইপ করছে রানা, এই সময় খুক করে কেশে কে যেন টোকা দিল দরজার। ভেতরে আসতে বলল রানা, কবাট খুল উকি দিল পাশের কামরার ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চৌধুরী। সারা মুখে অপ্রতিভ, জোর করা হাসি টেনে বলল সে, 'বাস্তব'।

জাকের চৌধুরী এবং হুকুম আলি, এরা দু'জন আজ নেতাকে একবার করে হলেও বিরক্ত করবে তা মনে মনে আগেই ঝগড়া রেখেছিল রানা। কাজেই ঝামেলা সেবে ফেলাই দরকার ভেবে বলল, 'না। আসুন। কি হল না হল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে না'।

ভেতরে ঢুকল জাকের চৌধুরী। দীর্ঘ ঝড়ু শীটটা ক্রমশ যেন হয়ে পড়া দেখাচ্ছে আজ। চোখের মণি ছোটো অশ্রু 'না মানে,' বিরক্ত দেখাল তাকে। এগিয়ে এসে বসল রানার সামনের একটা চেয়ারে। 'বোধহয় অনধিকার চর্চ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি আমার প্রতিবেশী, ভাল-মন্দ খবর যদি না রাখি, সেটা খুব খারাপ দেখায়, বিশেষ করে বিশেষ সময়...তাই জানতে এলাম, পুলিশ কি খুঁজছে পরিচয় জানতে পেরেছে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা।

‘সেদিন সন্ধ্যায় আপনি চলে যাবার পর...’খানিক ইতস্তত করে আবার বলল জাকের চৌধুরী, ‘অবশ্য! এটা তেমন কোন তথ্য নয়, আপনার কোন সাহায্যে লাগবে বলে মনে হয় না। তবু, শুনেছি, খুন-খারাবীর মতো ভয়ংকর কেসে খুঁটিনাটি অনেক তথ্য নাকি সাংঘাতিক কাজে লেগে যায়। কথাটা হল, সেদিন আপনি চলে যাবার পর আপনার টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল।’

‘হুঁ,’ মনে মনে একটু নিরাশই হল রানা। ভেবেছিল, হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে জাকের চৌধুরীর কাছ থেকে। ‘ধন্যবাদ। পুলিশকে জানান, ওদের কাছে এটা একটা দরকারী খবর হতে পারে।’

ব্যাকব্রাশ করা চম্বা চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে জাকের চৌধুরী বলল, ‘কেসটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। মেয়েটা আপনার অফিসে ঢুকল কিভাবে? এই প্রশ্নে পুলিশ বোধহয় আপনাকে একটু বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করবে, তাই না?’ রানা কি বলে শোনার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, গোথের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সেখানে রাজ্যের কৌতূহল।

‘বেকায়দায় ফেলবে?’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। ‘মনে হয় না। অনেক আগে থেকেই আমার অফিসে ঢুকে বসে ছিল খুনী, সে ই বিল্ডিংয়ের গেট আর আমার অফিসের দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়েছে মেয়েটাকে।’

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জাকের চৌধুরী। ‘যাক, আপনি তাহলে বেঁচে গেলেন। আচ্ছা, মেয়েটা সম্পর্কে জানা গেল কিছু?’
‘হুঁকড় থেকে এসেছিল। নাম মীর সুজি কোয়াও।’

‘মীর ?’ সচকিত হয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। ‘আমি একজন মীর শফিকুর রহমানকে চিনি... হ্যাঁ, যতদূর মনে পড়ছে, হঙকঙেই গিয়েছিল সে... আমার ছোটবেলার বন্ধু, একসাথে স্কুলে পড়তাম... তার কেউ নয় তো ?’

‘হ্যাঁ, সে-ই।’ সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল রানা। ‘চা আনাব ?’ দ্রুত মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী। রানা আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না। ‘বলছেন, তাকে চিনতেন আপনি ? ভালই হল। শফিকুর রহমান সম্পর্কে আমি আগ্রহী। কি জানেন তার সম্পর্কে, বলুন তো ? ওই চীনা মেয়েটা, সুজি কোয়াও শফিকুর রহমানের স্ত্রী ছিল।’

বেশ একটু হতচমক দেখাল জাকের চৌধুরীকে। ‘বলেন কি। শফিকুর স্ত্রী। আমাদের শফিক একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল ? ঘন ঘন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। ‘আমি তা বিশ্বাসই করতে পারছি না। ওর বাবা, মোখলেসুর রহমান... আরিস্বাপ।... সাংঘাতিক কড়া মেজাজের মানুষ, তিনি ছেলের এই বিয়ে মেনে নেবেন বলে তো মনে হয় না। তা, এখানে কি করতে এসেছিল মেয়েটা ?’

‘স্বামীর লাশ কবর দেয়া হবে এখানে, সটা নিয়ে আসছিল।’

জক, পাথর হয়ে গেল জাকের চৌধুরী ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড পর ফিস ফিস করে জানতে চাইল, ‘শফিক শফিক মারা গেছে ?’

‘কার অ্যান্ড্রিডেট। গত হুণ্ডায়।’ জাকের চৌধুরীকে খানিক খাতখ তথ্য অযোগ্য দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, ‘ওর সম্পর্কে না জানেন সব আমাকে বলুন, মিঃ চৌধুরী।’

হ’ আঙ্গুলের কীকে গোঁজা সিগারেটের ছাইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে

ভাকিয়ে থাকল জাকের চৌধুরী। আরো খানিক পর মুখ তুলে তাকাল সে। ‘কি জানেন, আমরা ওর বন্ধুরা অনেক আগে থেকেই বলাবলি করতাম, নির্ধাৎ কোন অলম্বাতে মৃত্যু হবে শক্তিকের। সাং-
ঘাতিক চঞ্চল প্রকৃতির ছিল ও, সেই ছোটবেলা থেকেই। আমাদের ভীতুর ডিম বলে গাল দিত, আর নিজে এমন সব গুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসত যে সে-সব দেখে ভয়েই আমরা আধমরা হয়ে যেতাম। হৈ-
চৈ না করে এক সেকেন্ড থাকতে পারত না। গাড়ি চালাত ফুল স্পীডে। মেয়ে দেখলেই হয়, পিছনে লাগা চাই। তারপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম, ওর সাথে খুব কম দেখা হত। তবে খবর পেতাম। নিজের এলাকায় হীরো এনে গেল ও। মদ ধরল। মারপিট, মেয়েমানুষ, নেশা এইসব নিয়েই সময় কাটাত। ইচ্ছে করেই ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখিনি। তারপর সুনলাম, ওর বাবা ওকে হুকুঙ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা সে ওতো আজ বছর পাঁচ-ছয় আগের কথা।’ অন্যমনস্ক ভাবে টান দিল সিগারেটে। ‘ওখানে গিয়ে ও তা-
হলে একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল আবার?’

মুখে সিগারেট তুলতে যাচ্ছিল রানা, মাথা পথে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ‘আবার?’

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল জাকের চৌধুরী। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘আপনার অবশ্য জানার কথা নয়। এর আগে শক্তিক একটা মেয়েকে বিয়ে করছিল—ওটা ছিল...কি বলব, ফলস্ একটা বিয়ে।’

‘ফলস্ বিয়ে মানে?’

‘ও হুকুঙ চলে যাবার বছর দেড়েক আগের ঘটনা। একটা মেয়ে ভালবাসত শক্তিককে। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু আহামরি কিছু নয়।

তবে, স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। কিন্তু শফিক ছিল ঠিক তার উল্টো। মেয়েটা ওকে ভালবাসলে কি হবে, তার ওপর শফিকের কোন রকম দুর্বলতা ছিল না। তবে প্রেমের অভিনয় আর-সব মেয়ের সাথে যেমন করছিল, এর সাথেও সেটা চালু রাখে। উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েটাকে নষ্ট করা। কিন্তু, আগেই বলেছি, মেয়েটা ছিল অসাধারণ ভাল, বিয়ের আগে শফিককে কাছে ঘেঁষতে দিতে রাজি নয়। অগত্যা বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় একটা কুমতলব পাকাল শফিক। বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে বের করে আনল। ও-হো, বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটা ছিল শফিকের বাবারই প্রাইভেট সেক্রেটারী।’

‘নাথ ?’

‘দাঁড়ান মনে করি...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পারভিন।’

নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ‘তারপর ?’

‘পারভিনকে নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গ্রাম সাইডে চলে গেল শফিক,’ আবার শুরু করল জ্বাকের চৌধুরী। কথাবার্তায় এখন আগের চেয়ে সতর্ক মনে হচ্ছে তাকে। অনেক দিন আগের ঘটনা, ঠিক মতো সব স্মরণ করতে গিয়েই বোধহয় সতর্ক হয়ে উঠতে হয়েছে তাকে। ‘একটা বাড়িতে উঠল ওরা। বাড়িটা শফিকেরই এক বন্ধুর। গ্রামের অন্য কোন লোক সে বিয়েতে উপস্থিত ছিল না। এমন কি কোন মৌলভীকেও ডাকা হয়নি...’

‘তাহলে বিয়ে পড়াল কে ?’

‘ভিক্ট একটু হাসল জ্বাকের চৌধুরী। ‘কে আবার, ওরই এক বন্ধু, মুখে নকল দাড়ি লাগিয়ে।’

‘ইন্টারেস্টিং। তারপর ?’

‘বিয়ে হয়ে গেল। আগেই ঢাকার একটা হোটেলে স্মাইট ভাড়া করে রেখেছিল শফিক, মাইক্রোবাসে করে সোজা শহরে ফিরে সেখানেই হানিমুনের জন্যে ওঠার কথা ছিল। পারভিনকে নিয়ে বাড়িতে ওঠার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল শফিকের, বিয়ের কথাটা যথা-সম্ভব কম লোককে জানান। পারভিনকে বুঝিয়েছিল, বাবা এ-বিয়ে মেনে নেবেন না, অন্তত এখুনি মেনে নেবেন না, তাই আপাতত ওদেরকে হোটেলেই উঠতে হবে। সরল মনে কথাটা বিশ্বাস করেছিল পারভিন।’

‘তারপর কি হল বলুন,’ বিরক্তি চেপে বলল রানা।

‘ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক, কিন্তু শফিকের জন্যে সেটা হল শাপে বর। মাইক্রোবাসে ওর বন্ধুরাও সবাই ছিল। শহরে ফেরার পথে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে শফিক, রাস্তার কিনায়া থেকে চল্লিশ ফুট নিচের নদীতে পড়ে গেল সেটা। তিন জন ছাড়া বাকি সবাই মারা যায়।’

ঘটনার তাৎপর্যটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, ‘তিন জন কে কে?’

‘শফিক, পারভিন আর সেই আলগা দাড়িওয়ালা নকল মৌলভী, অর্থাৎ শফিকের এক বন্ধু,’ একটা সিগারেট ধরাল জাকের চৌধুরী। ‘এক বছর পর শফিক স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে পারভিনকে। পারভিন তখন আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সে জানতে চাইল আমাদের বিয়ে কি তাহলে মিথ্যে? শফিক বলল, ইয়া, মিথ্যে। কোন সাক্ষী-প্রমাণ কিছু নেই। যারা সাক্ষী ছিল তারা সবাই মারা গেছে। নকল মৌলভীর কথা-টাও পারভিনকে বলল শফিক। সেই সাথে জানিয়ে দিল, তার সেই বন্ধুর পরিচয় কোন দিনও জানতে পারবে না পারভিন। তাকে

দেখলেও চেনার সাধ্য নেই তার। দাড়ি ছাড়া শফিকের সেই বন্ধুকে সত্যিই নাকি চেনা সম্ভব নয়।’

‘বাস্টার্ড।’ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রানা, পরমুহূর্তে ভাবল, মরা একটা লোককে গালিগালাজ করে লাভ নেই। জানতে চাইল, ‘তারপর ? কি অবস্থা হল বেচারী পারভিনের ?’

কৌস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জাকের চৌধুরী। ‘পারভিনকে হোটেলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল শফিক। তার খোঁজে মীর-মঞ্জিলে এল পারভিন। দেখা করল শফিকের বাবা মীর মোখলেসুর রহমানের সাথে। তিনি তো পারভিনকে দেখে মহা খাল্লা। বললেন, কিছু না বলে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন ? পট লক্ষ্য করে আরো বললেন, কাকে বিয়ে করেছে ? আমাকে জানাওনি কেন ? ইত্যাদি। বুড়ো একটু শাস্ত হতে তাকে সব কথা ধুলেবলল পারভিন। বলল, আমি আপনার ছেলের সম্ভান বয়ে বেড়াচ্ছি।’

‘কিন্তু এত সব কথা আপনি জানলেন কোথেকে ?’

কৌস একটু তেতো হাসল জাকের চৌধুরী। ‘হঙকঙ চলে যাবার কয়েকদিন আগে শফিকের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। হঠাৎ দেখা, অনেকদিন পর, রাস্তার ওপর, জোরজোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা রেস্টোরায় বসাল। কাজু বাদাম আর কফি খাইয়ে চিটিং-বাজীর পুরো গল্পটা শোনাল আমাকে। বরাবরই এ-ধরনের গল্প শুনিয়ে অছুত এক আনন্দ পত শফিক—কৃতি-বিকৃতি আর কি।’

‘হু,’ বলল রানা। ‘তারপর কি হল ? উত্তরে পারভিনকে কি বললেন বুড়ো মীর সাহেব ?’

‘মীর সাহেব মানুষ হিসেবে খারাপ নন, কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে আগে হল বংশ এবং সামাজিক মর্যাদা। কোথাও কিছু নেই তাঁর

গ্রাইভেট সেক্রেটারী এক বছর গায়েব থাকার পর হঠাৎ উদয় হয়ে বলল, আমি আপনার পূজবধু, আর তিনি তা মেনে নিলেন, এমনটি আশা করা যায় না। পারভিনকে তিনি চিনতেন, জানতেন মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয় ও। নিজের ছেলেকেও তিনি হাড়ে হাড়ে চিনতেন, জানতেন লম্পটটা অনেক মেয়েরই সর্বনাশ করেছে। যাই হোক ছেলেকে ডেকে পাঠালেন তিনি। পারভিনকে দা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ও যা বলছে সব সত্যি? তুমি ওকে বিয়ে করেছ? অসম্ভব, ওকে কেন বিয়ে করত যাব আমি, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শফিক।

‘অদ্ভুত!’

‘পারভিনকে মীর সাহেব বললেন, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও সমাজ বিশ্বাস করবে না। আর সমাজ যদি এই বিষেটাকে স্বীকৃতি না দেয়, আমিও স্বীকৃতি দিতে পারি না। বললেন, তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তুমি আবার বিয়ে করে শ্রী মীর চেষ্টা কর। কিন্তু আবার বিয়ে করতে রাজি হয়নি পারভিন। আগেই বলেছি, আদর্শ নারী বলে যে বা বাক্য পারভিন তাই - অন্য অনেকের কাছে সেকলে বলে মনে হবে। যাই হোক, টাকা নয়, মীর সাহেবের কাছে পুরনো চাকরিটা ফেরত চাইল সে। মীর সাহেব রাজি হলেন। এর তিন মাস পর চাকরিতে জয়েন করল পারভিন...

‘এখনও কি সে...’

‘বোধহয়। আমি যতদূর জানি, এখনও মীর সাহেবের সেক্রেটারী হিসেবে চাকরি করছে পারভিন। শুনেছিলাম একটা পূজ-সন্তান হয়েছিল, কোথায় আছে না আছে জানি না...

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে রানা। বুড়ো মীর কোটিপতি, অগাধ

পাশের কামরা

সম্পত্তির মালিক, তাঁর মৃত্যুর পর কে পাবে এসব ? একমাত্র ছেলে মারা গেছে, পুত্রবধূদের একজন খুন হয়েছে, অপরজন বেঁচে থাকলেও তার সামাজিক স্বীকৃতি নেই। তাহলে ? কাকে এসব দিয়ে যাবেন বৃদ্ধ ?

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল রানা। ‘আচ্ছা, সেই নবল মৌলভী আসলে কে ? শফিকের বন্ধু যখন, আপনি তাকে নিশ্চয়ই চেনেন ?’

‘নিজের স্বার্থের ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান ছিল শফিকের,’ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল জাকের চৌধুরী। ‘জানত, ওই বন্ধুর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলেই পারভিন বিয়েটাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা চেষ্টা চালাবে সেজন্যেই কিছুতেই সেই বন্ধুর পরিচয় জানাননি আমাকে।’

‘হুঁ,’ চিন্তিত দেখাল রানাকে। ‘সেই বন্ধুটিই বা কেমন লোক ? একটা মেয়ে পথে বসছে জেনেও সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দেয়নি কেন ?’

‘শফিকের বন্ধু শফিকের মতোই হবে,’ তাক্কিল্যোর সাথে বলল জাকের চৌধুরী। ‘মেয়েটার জন্যে তার কোন দরদ থাকার কথা নয়, শফিকের স্বার্থটাই তার কাছে বড়।’

‘আপনি অনুমান করেও বলতে পারেন না, শফিকের সেই বন্ধুটি কে হতে পারে ?’

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী। বিষম দেখাল তাকে : ‘ওর সব বন্ধুকে আমি চিনতামও না, মিঃ ডিউক। কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছু জেনে লাভ আছে কোন ? আপনার এই কেসের কোন সুরাহা হবে তাতে ?’

‘তা হয়ত হবে না, কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার,’ বলল রানা। ‘ইচ্ছে হচ্ছে একমাত্র জীবিত সাক্ষীকে খুঁজে

বের করে তার কপালে পিস্তল চেপে ধরে বলি, সত্যি কথাটা স্বীকার কর বাটা, নইলে দিলাম তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে।’

হো হো করে হেসে উঠল জাকের চৌধুরী। ‘তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায় যে...তার পরিচয় একমাত্র শফিকই জানত, শফিক মারা যাবার পর সবার নাগালের বাইরে চলে গেছে সে...’

গম্ভীর হল রানা। ‘আমি কি এত সহজে নিরাশ হই না। কারো কাছে না কারো কাছে তার সেই বন্ধুটির নাম শফিক বলে থাকতেও তো পারে?’ কি যেন বলতে যাচ্ছিল জাকের চৌধুরী। তাকে ধামতে ইশারা করে আবার বলল রানা, ‘মেয়েটাকে দেখিনি, কোনদিন দেখার সুযোগ হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু আপনার মুখে তার হৃৎকের কাহিনী শুনে আমার বুকে একটা আঁচড় পড়েছে। চোখ কান খোলা রাখব আমি, আমার সাধের মধ্যে হলে তাকে আমি তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব...’ হঠাৎ থেমে গেল রানা, মনে মনে ভিরঙ্কার করল নিজেকে, সে কি পাগল হয়ে গেল। এসব কথা কাউকে শোনাবার কোন মানে হয়।

রিস্টওয়াচ দেখল জাকের চৌধুরী। মুখ তুলে বলল, ‘আমরা কিন্তু মার্ডার কেস থেকে অনেক দূরের প্রসঙ্গে চলে এসেছি। ভাবছিলাম, ওই চীনা মেয়েটা, শফিকের দ্বিতীয় স্ত্রী, সে খুন হল কেন?’

‘এই প্রশ্নের উত্তরই তো খুঁজছে পুলিশ।’

‘আপনার জন্যে একটা উটকো সমস্যা, তাই না?’ কণ্ঠে সহানুভূতি টেনে বলল জাকের চৌধুরী। ‘মানে, মেয়েটা আপনার কাছে কেন এসেছিল সেটা একটা রহস্য, তাই না?’

বিরক্তি বোধ করল রানা। লোকটা একটু বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছে। ‘রহস্য? হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু কোন রহস্যই শেষ পর্যন্ত

পাশের কামরা

রহস্য থাকে না। এরও একটা মীমাংসা হবে।’

পাশের কামরা থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এল। তাড়া-তাড়ি উঠে দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। ‘আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিন্তু একটা কথা, যদি মনে করেন আমি কোন সাহায্যে লাগব, সাথে সাথে জানাবেন। সাধ্যমতো করব আমি।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা।

দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। ‘শফিক সম্পর্কে আর কিছু যদি মনে করতে পারি, আপনাকে জানাব, কেমন?’

‘অবশ্যই।’

চলে গেল জাকের চৌধুরী। তার বলা কথাগুলোই ভাবছিল রানা, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই মিষ্টি সুরেলা একটা নারী-কণ্ঠ কানে এল। ‘আমি মিঃ মীর মোখলেসুর রহমানের সেক্রেটারী বলছি। আপনি মিঃ ডিউক?’

সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না রানা। এতক্ষণ এই পারভিনের কথাই ভাবছিল ও। গলাটা তো আশ্চর্য! সেখতেও নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে? মনে মনে পারভিনের একটা ছবি কল্পনা করে নিল ও। ‘হ্যাঁ।’

‘মিঃ ডিউক, আজ বিকেলের দিকে আপনি একটু সময় দেবেন, প্লীজ? মিঃ রহমান আপনার সাথে দেখা করতে চান।’

চট্ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-রেজিস্টারটা দেখে নিল রানা। বলল, ‘সময় দেয়া সম্ভব, কিন্তু ঠিক কি ব্যাপারে দেখা করতে চান তিনি তা যদি..’

বাধা দিয়ে সেক্রেটারী বলল, ‘কেন দেখা করতে চান তা বোধহয় আপনারও জানা আছে, তাই না, মিঃ ডিউক?’ শাস্ত সুরে বলল

কথাটা, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কী একটু কাঠিন্যও অনুভব করল রানা।
ওকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আবার বলল সে, 'মীর-
মঞ্জিল, গুলশান, নিশ্চয়ই চেনেন আপনি? তিনটির সময়, কেমন?'
বলে আর অপেক্ষা করল না, যোগাযোগ কেটে দিল।

সারাটা সকাল এবং দুপুর আর কিছু ঘটল না। পাশের কাম-
রার ইন্সট্রিয়াল কমিস্ট জাকের চৌধুরী ওপর একটু চটেই উঠল
রানা, ছ' এক মিনিট পরপরই তার অফিস কামর' থেকে ঝনঝন টেলি-
ফোনের আওয়াজ ভেসে আসছে, তার ওপর টাইপরাইটারের খটা-
খট তো আছেই, একাএ মনে কিছু চিন্তা করতে পারছে না রানা।
বেলা একটার দিকে একটা চান্স নিয়েছিল হুসুম আলি, কিন্তু ঊকি
দিয়ে রানার গম্ভীর চেহারা দেখে ভেতরে ঢুকতে বা কোন প্রশ্ন করতে
সাহস পারনি।

ঠিক তিনটির সময় মীর-মঞ্জিলে পৌঁছল রানা। মস্ত গেট, ছ'
ধারের ছটো খামের মাথায় সিংহের আবক্ষমূর্তি। গেট থেকে কং-
ক্রিটের চল্লিশ ফিট লম্বা রাস্তা চলে গেছে বিশাল একটা কৃত্রিম ঝর্ণার
কাছে, ঝর্ণটাকে ঘুরে সোজা গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে রাস্তা।
গেট খোলাই পেল রানা। রাস্তার হ'দিকে সুন্দর করে ছাঁটা লতা-
গাছ। গাড়ি বারান্দায় কাউকে দেখল না ও। বাড়ির সামনে
দাঁড়িয়ে থানি ইতস্তত করে দরজার দিকে এগোল। কলিংবেলের
বোতামে টাপ দিয়ে শুনতে পেল, অনেক দূরে টুং-টাং-টুং মুছ ঘণ্টা
বাজল। উনি পরা একজন বাটলার এসে খুলে দিল দরজা। নিজের
পরিচয় দিল রানা, 'ডিউক।'

সবিনয় ভদ্রতার সাথে রানাকে একটা হলঘরে নিয়ে এসে বসাল
বাটলার। চলে গেল সে, কিন্তু একটু পরই ফিরে এল আবার।

পাশের কামরা

রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ভেতরের একটা কামরায় । ছোট, কিন্তু
 সুন্দর সুন্দর দামী আসবাবে সাজান ঘর । টেবিলের ওপর পত্র-
 পত্রিকা পড়ে আছে । একটা জানালার বাইরে মস্ত দীঘি চোখে পড়ে-
 আরেকটার সামনে দাঁড়ালে বাগানের অংশ বিশেষ দেখা যায় ।
 গোটা বাড়ি নিরুপ, কোথাও একটু আওয়াজ নেই । নিঃশব্দ পায়ে
 কখন যে ঘরের ভেতর ঢুকেছে মেয়েটা, টেরই পায়নি রানা । নিজের
 অজান্তে ওর বষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল বোধহয়, হঠাৎ কাঁধের
 ওপর দিয়ে পিছন নিকে তাকাল ও । দেখল, দরজার কাছ থেকে ওর
 দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা । দেখতে আহামরি কিছু নয়, বলেছিল
 জাকের চৌধুরী । কিন্তু রানার চোখে পারভিনকে অপরূপ সুন্দরী
 বলে মনে হল । পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে বসে, কোমরের নিচ
 পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে একরাশ কাল কোঁকড়ান চুল । চোখ দুটো,
 যাকে বলে দীঘল আঁবি, ঠিক তাই । চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ । গাঢ়
 নীল রঙের একটা শিকন পরে আছে । ঐবাটা খুব সুন্দর পারভি-
 নের, একেই বোধহয় মরাল ঐবা বলে । কিন্তু দীঘল আঁবিতে
 রাজ্যের বিস্ময়, দৃষ্টি এড়াল না রানার তবে, এই মেয়েটার প্রতি
 যতই সহানুভূতি থাক, একটা কথা মন থেকে তাড়াতে পারছে না
 রানা, সেটা হল — নিজের বিয়েটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বুড়ো মীর
 সাহেবের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পারভিন এবং তার নাবালক
 ছেলে । এমন কি বিয়েটা যদি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নাও হয়, তবু হয়ত
 মীর সাহেব তার মগাধ সয়-সম্পত্তির বেশ কিছুটা নিয়ে যাবেন ওকে ।
 ওর প্রতি যে মীর সাহেবের সহানুভূতি আছে তাতে কোন সন্দেহ
 নেই । আর, ছেলে এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী সৃষ্টি কোথাও মারা যাবার
 পর অন্য কোন উত্তরাধিকারী যদি না থাকে, তাহলে হয়ত সমস্ত
 রানা-২

সম্পত্তিই তিনি দিয়ে যাবেন পারভিন আর তার সন্তানকে। কাজেই, শাস্ত্র প্রকৃতির মেয়ে পারভিন শফিকের দ্বিতীয় স্ত্রীকে পথ থেকে সরাবার জন্যে যদি কোন গোপন ষড়যন্ত্র করে থাকে, জাভেদে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বৈধবতে ভালমানুষ, মনে চর ভাঙ্গা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, অথচ মনের ভেতর বাস করে নির্দুঃ এক খুশী, ছুনিয়ায় এ ধরনের মানুষেরও কোন অভাব নেই। গতই সত্যী-সাবিত্রী মনে হোক, গোপন একজন গোপিত থাকাকিছু বিচিত্র নয়। উচ্ছাভিলাষী প্রেমিকের প্ররোচনাক অনেক নিরীহ টাইপের মেয়েও নির্মম স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে।

রানাকে ভাল করে, খুঁটিয়ে দেখল পারভিন। তার দৃষ্টির প্রথ-রতা, কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্য করে এবং তারপর শাস্ত্র কণ্ঠস্বর শুনে রানা বুকল, এ মেয়ের মাথাটা খুব ঠাণ্ডা।

‘আপনি মিঃ ডিউক?’ মুহূ, সুরেলা কণ্ঠস্বর। একবার শুনেলে বারবার শুনেতে ইচ্ছে করে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘আপনি মীর সাহেবের সেক্রেটারী মিস...

‘আমার নাম পারভিন। আসুন। মিঃ ব্রহ্মান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’ ঘুরে দাঁড়াল পারভিন, দরজার দিকে পা বাড়াল। তাকে অনুসরণ করল রানা। লক্ষ্য করল, সহজ অনাগ্রাস হাঁটার ভঙ্গি পারভিনের, কোন রকম জড়তা নেই। বিশাল নিঃশ্বাস, সুগঠিত, কিন্তু তাতে ঢেউ তোলার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা নেই। হাঁটার সময় অদ্ভুত একটা ছন্দ ‘ফুটে উঠছে বটে, কিন্তু সেটা এমনই সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ যে দেখে মুগ্ধ হতে হয়, পাবার লোভ জাগে না।

অপেক্ষাকৃত বড় একটা কামরায় এল ওরা। এটাও খুব দামী কাঠের আসবাবে সাজান। দেয়াল-ছোড়া জানালা, বাইরে গোলাপ

বাগান। চাকা লাগান একটা বেড-চেয়ারে আধ শোয়া ভঙ্গিতে বসে আছেন মীর মোখলেসুর রহমান। বৃদ্ধ বেশ লম্বা, একটু বেশি রোগা, তবে চেহারায় আভিজাত্যের ছাপটুকু দৃষ্টি এড়াবার নয়। নাকটা খাড়া, পুরানো হাতির দাঁতের মতো হলুদ গায়ের রঙ, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, শিরা ওঠা হাত। সাদা একটা লিনেন-শ্রাট পরে আছেন তিনি, পায়ে হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে জানালার দিক থেকে মুখ ফেরালেন, রানার সাথে চোখাচোখি হতে মূহ একটু হাসলেন তিনি।

রানার পরিচয় জানিয়ে দিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারী। নিজের কাছের একটা চেয়ার ইঙ্গিতে দেখিয়ে রানাকে বললেন বৃদ্ধ, ‘এখানে এসে বস, বাবা। আমি ভাল শুনতে পাই না, কাজেই একটু জ্বারে কথা বলতে হবে তোমাকে। আর, অভ্যেস থাকলে তুমি ধূমপান করতে পার।’

এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল রানা। কিন্তু সিগারেট ধরাল না।

‘তোমার সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেয়েছি আমি,’ বেড-চেয়ারে সিঁথে হয়ে বসলেন বৃদ্ধ। ‘লোকে যে বাই বলুক, আমার কিন্তু মনে হয়েছে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ।’

খবরটা কে দিয়েছে জানা নেই, তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করল রানা।

‘বটনাটা তোমার অফিসে ঘটেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক,’ আবার বললেন বৃদ্ধ। ‘আমি আগাগোড়া পুরো ঘটনাটা, তুমি যে-টুকু জান, বিস্তারিত শুনতে চাই। চীনা মেয়েটা কেন এসেছিল তোমার কাছে, তারপর সেই লোকটা, আতিকুল্লাহ খান, কোনে ঠিক কি বলেছিল তোমাকে—সব, স-ব আমি শুনতে চাই।’ একটু থেমে জানতে

চাইলেন, 'হাতে সময় নিয়ে এসেছ তো ?'

রানা লক্ষ্য করল, পুত্রবধূ না বলে চীনা মেয়ে বললেন মীর সাহেব, এবং শব্দ ছোটো উচ্চারণ করার সময় তাঁর মুখে দৃশ্যের ভাব ফুটে উঠল। প্রথম থেকে পুরো ঘটনাটা বলে পেল রানা। গভীর মনো-যোগের সাথে সব শুনলেন বুদ্ধ। রানার বলা শেষ হয়েছে, এই সময় কফি আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকল সেজেস্টারী। ঘরের ভিতর বত-কণ থাকল মেয়েটা, তার মুখ থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না রানা, কিন্তু ভুলেও একবার রানার দিকে তাকাল না সে। রানার উপস্থিতিতে তার মধ্যে কোন জড়তা বা দ্বিধা থাকোঁচও লক্ষ্য করা গেল না। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে গাঁটাচলা করল সে। ছ'একটা প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কথা বলল মীর সাহেবের সাথে। বুদ্ধের পা ছোটো ঢেকে দিল চাদর দিয়ে। তারপর নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'তুমি তাহলে অসুমান করেও বলতে পার না কেন মেয়েটা তোমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ?' পারভীন চলে যেতে জানতে চাইলেন বুদ্ধ। 'কিংবা কেন সে খুন হল, কে তাকে খুন করল, এসব প্রশ্নের উত্তরও তুমি পাওনি ?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর বলল, 'আফিকুন্নাহখান হয় নিজেই খুনি, নয়ত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'ইন্সপেক্টর ফরেজটা কোন কন্ডেরই নয়, ওর ওপর আমার একদম বিশ্বাস নেই। আমি তো ভেবেই পাই না ওর মতো গর্দভকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে কেন রাখা হয়েছে।' মুখ নামিয়ে নিয়ে আগের চেয়ে দৃঢ় সুরে বললেন বুদ্ধ, 'ঘটনাচক্রে, চীনা মেয়েটা আমার পুত্র-

বধু। আমি চাই তার খুশী ধরা পড়ুক। এও সাথে মীর বংশের
 সর্ষাদা জড়িয়ে পড়েছে। মীরদের একটা বউকে খুন করে রেহাই পেয়ে
 যাবে খুশী, এ হতে পারে না।’ হঠাৎ খাদে নেমে গেল তাঁর গলা,
 জানালা পথে উদাস চোখে তাকালেন। বললেন ভাড়াটা, শক্তি
 ছিল আমার একমাত্র সম্ভান, ও মারা যাবার পর এখন বাক্যে পারছি,
 ওর সাথে হয়ত আরো ভাল ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার তাহলে
 হয়ত এতটা নষ্ট হয়ে যেত না ও। ও বেঁচে থাকতে আমি ওর প্রতি
 সুবিচার করতে পারিনি, সেটা বড় দুঃখ। তেলে পতি এটা আমার
 একটা কর্তব্য বলে মনে করছি আমি—খুশীকে পরে উপযুক্ত শাস্তির
 ব্যবস্থা করা। এতে যদি আমি সফল হই, কিছুটা শান্তি পাব। কিন্তু
 আমি বুড়ো হয়েছি, মনের সেই জোরও আর নেই। কাণ্ডটা আমার
 পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব। মেয়েটা তোমার অকি-
 সেই খুন হয়েছে। তার মানে খুশী তোমাকে কাঁসাতে চেয়েছে। তাই না ?
 তোমার সময়ের পুরো দাম যা হয় সবটুকু দেব আমি—আমি চাই,
 আমার তরফ থেকে খুশীকে ধরার জন্যে যা যা করার দরকার সব
 তুমি কর।’ একটু ধামলেন বৃদ্ধ, তারপর জানালার দিক থেকে মুখ
 ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। ‘এটা একটা অনুরোধ, ডিউক।
 যদি রাখা আমি খুশি হব।’

‘কিন্তু,’ বলল রানা, ‘কেসটা এখন পুলিশের হাতে। বাইরের
 কেউ এ ব্যাপারে নাক গলাক তা ওরা চাইবে না। আপনি বরং...’

বাধা দিলেন বৃদ্ধ, রাগের সাথে বললেন, ওরা কি চাইল না
 চাইল তাতে কি আসে যায় ? আমার পুত্রবধু খুন হয়েছে, আমি নাক
 গলাব না তো কে গলাবে ? তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজে হাত
 দেবে, কার সাধ্য বাধা দেয়। কয়েককে বলেছিলাম হুকুমের ব্রিটিশ

কর্তৃপক্ষকে টেলিগ্রাম করে মেয়েটা সম্পর্কে যেন বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠায়—কি করল কে জানে। শফিকের চিঠি পড়ে আমি শুধু জানতে পেরেছিলাম যে সুজি কোয়াও রেড চায়নার রিকিউজিদের একজন...

‘কিন্তু একজন রিকিউজি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কি প্রয়োজনীয় কোন তথ্য দিতে পারবে?’ সংশয় প্রকাশ করল রানা।

বুদ্ধ একটু নড়েচড়ে বসলেন। কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে নামিয়ে রাখলেন সেটা। বললেন, ‘তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। শোন। ফি বছর অনেক রিকিউজি হঙকঙে আসে। এদের সাথে কোন কাগজপত্র থাকে না। খালি হাতে শুধু প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসে আর কি। কিন্তু চীন থেকে সরাসরি হঙকঙে আসে না তারা। পাল তোলা নৌকায় করে প্রথম আসে পতুংগীজ এলাকা মাকাও, কিন্তু সেখানে অত রিকিউজির জায়গা মেলে না, তাই হঙকঙগামী নৌকায় তুলে তাদেরকে চালান দেয়া হয়। কিন্তু সাগরে পাহারা আছে, রিকিউজি ভাঙি নৌকা দেখলেই ধাওয়া করে হঙকঙ নৌ-পুলিশ। কিন্তু মুশকিল হল, ওই এলাকার হাজার হাজার মাছ ধরার নৌকা আছে, সেগুলোর সাথে মিশে যায় রিকিউজিদের নৌকাগুলো। তার মানে, পুলিশরা রিকিউজিদের নৌকা খুঁজে বের করতে পারে না। হঙকঙ সমুদ্র-সীমানার ভেতর কোন রিকিউজি নৌকা চুকে পড়লে তাকে আর ফেরত পাঠান হয় না। বাই হোক, শেষ পর্যন্ত নৌ-পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রিকিউজিরা হঙকঙে পৌঁছায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এদের নতুন কাগজ পত্র দেয়, তারপর থেকে শুরু হয় এদের নতুন জীবন। বলতে পার, এরা নবজন্ম লাভ করে। আমার পূজবধুও এই রকম একজন রিকিউজি। সেজন্যেই

আমার ধারণা, ওর প্রকৃত পরিচয় ইত্যাদি না জানা থাকলে এই খুনের কিনারা হওয়া কঠিন।’

‘কিন্তু প্রকৃত পরিচয় ইত্যাদি জানতে হলে হওকঙ যেতে হয়...

‘ঠিক,’ হু’চোখভরা প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। ‘আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। যাবে তুমি, ডিউক? সমস্ত খরচ আমার। হওকঙে যাবার প্রয়োজন আছে, আমার মতো তুমিও যে এটা উপলব্ধি করেছ, সেজন্যে আমি উৎসাহিত বোধ করছি। তোমার আমার চিন্তাধারা একই খাতে বইছে, সেটা কম কথা নয়। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। বোধহয় একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব এই খুনের মীমাংসা করা। যাবে তুমি, ডিউক?’

চূপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘যাব। কিন্তু ওখানে গেলেই যে সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারব, ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে।’

‘জানি। আমারও ধারণা, এই রহস্যের জড় শুধু হওকঙে নয়, ঢাকাতেও আছে। তুমি আমার অনুরোধ ফেলনি, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, ডিউক। যাও, আমার সেক্রেটারীর সাথে দেখা কর। ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমার ছেলের লেখা চিঠিগুলো একবার দেখে নাও। কাজে লাগতে পারে।’

উঠে দাঁড়াল রানা।

‘ডানদিকের বারান্দায় বেরোও, তিন নম্বর কামরায় পাবে ওকে,’ বেড-চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। ‘ফয়েজ তোমাকে বাধা দিতে পারে। হয়ত বলবে, ঢাকার বাইরে যাওয়া চলবে না তোমার। যাই বলুক, কান দিয়েও না। যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু কর। ফয়েজ যাতে কোন গোলমাল না করে তার ব্যবস্থা

আমি করব ।’

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। বেকুবের আগের মুহূর্তে ঝাঙ্ক
কিরিয়ে দেখল, সামনের সাদা দেয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছেন বৃদ্ধ। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, যার অতীত অত্যন্ত বেদনাময়,
সেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে পাখর হয়ে গেছেন বেন।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সেক্রেটারী, রানাকে ঘরে ঢুকতে
দেখে নির্মল একটু হাসল, বলল, ‘বসুন।’ টেবিলের ওপর ঝুঁকি
পড়ে আবার খস খস করে কি বেন লিখতে শুরু করল। টেবিলের
সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। দেখল, পারভিনের সামনে
অনেকগুলো চেক বই রয়েছে, এক এক করে চেকের ওপর সই করছে
সে। মুখ তুলল না আর, হাতও চালু থাকল, জানতে চাইল, ‘আপনি
তাহলে হওকঙে যাচ্ছেন, মিঃ ডিউক?’

‘বোধহয়।’

‘তাহলে স্মল পল্লের টিকা নিতে হবে আপনাকে। কলেরা ইন্জেক-
শনও ইচ্ছে করলে নিতে পারেন। তবে বাধ্যতামূলক কিছু নয়।’

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, ‘সিগারেট
খেলে আপনার অসুবিধে হবে?’

হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল পারভিনের, মুখ তুলে তাকাল।
আবার সেই সরল হাসিদেখা গেল মুখে। বলল, ‘কোন অসুবিধে হবে
না।’ দেয়াল খুলে একটা এনভেলোপ বের করল সে, রানার দিকে
সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘এর ভেতর শফিকের চিঠিগুলো আছে।
বছরে একটার বেশি চিঠি লেখেনি, ঠিকানা ছাড়া বিশেষ কোন তথ্য
পাবেন বলে মনে হয় না।’

সবগুলো চিঠির ওপর চোখ বুলাল রানা। ছোট ছোট চিঠি, প্রতি-

টিতে শুধু টাকা পাঠাবার অনুরোধ। প্রথম চিঠিটা ছয় বছর আগের
এবং প্রতিটি এক বছর ব্যবধানে লেখা। শেষ চিঠিটা আগ্রহী করে
তুলল রানাকে।

হোটেল কসমোপলিটান
ওয়ানচাই

আম্বা,

আমি একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। রেড
চারনার রিফিউজি, নাম সুজি কোয়াও। খুব স্মার্ট, কিন্তু সরল।
আমার বিশ্বাস, ওকে বিয়ে করে আমি সুখী হব। আশা করি এ
বিয়েতে তোমার আপত্তি হবে না। তুমি তো বলেই দিয়েছ,
নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলো আমার নিজেরই নেয়া উচিত।

এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই বিয়ের পর
কিছুদিন হোটেলেই থাকব আমরা। এখানে একটা বাড়ি কেনার
খুব ইচ্ছে আমার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে চাইলে টাকা পা-
কিনা জানি না। যদি ইচ্ছে কর, একটা চেক পাঠিয়ে দিয়ো।

তোমার শফিক।

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলল রানা। পারভিন বলল, 'শেষ
চিঠি ওটা। পড়ে মিঃ রহমান সাংবাদিক স্কেপে উঠেছিলেন। সাথে
সাথে টেলিগ্রাম করে ছেলেকে বিয়ে করতে নিষেধ করেন।
কিন্তু সেই টেলিগ্রামের কোন উত্তর আসেনি, বা শফিকও আর
কোন চিঠি লেখেনি।' আরেকটা চিঠি রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে,
বলল, 'এটা দিন দশেক আগে এসেছে, সুজির লেখা।'

চিঠিটা পড়ল রানা। তুল ইংরেজীতে জড়ান অঙ্করে লেখা,
পড়তে অসুবিধে হয়। বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায় :

জনাব মীর মোখলেসুর রহমান,

আপনার ছেলে শফিক গতকাল এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমি যতদূর জানি, ওর ইচ্ছে ছিল যত্নার পর যেন ওকে আপনাদের পারিবারিক গোরস্থানে মাটি দেয়া হয়। কিন্তু আমার কাছে এমন পরস্যা নেই যে ওকে প্লেনে করে ঢাকায় নিয়ে যাব। আপনি যদি টাকা পাঠান তাহলে সে ব্যবস্থা হতে পারে। ওকে এখানে কবর দেব, সে-সঙ্গতিও আমার নেই।

ইতি, মীর সৃজি কোয়াও।

দুঃখবোধ করল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা— সামনে স্বামীর লাশ নিয়ে বসে আছে একটা মেয়ে, হাতে কোন পরস্যা নেই। কি ভয়ংকর পরিস্থিতি। নিজেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই, খন্তর যদি দয়া করে বাড়িতে জায়গা না দেন তাহলে নামতে হবে পথে।

সেক্রেটারী পারভিনের দিকে তাকাল রানা। মাথা নিচু করে সোনালী ফাউন্টেন পেন দিয়ে ঝাঁকিঝুঁকি কাটছে কাগজে। চোখের পাতা নামান, মুখ দেখে বোকা গেল না কি ভাবছে।

খুক করে কাশল রানা। প্রায় চমকে উঠল পারভিন। মুখ তুলে তাকাল। চোখের দৃষ্টি দেখে রানার মনে হল, গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল মেয়েটা এতক্ষণ, তুলেই গিয়েছিল রানার উপস্থিতি। ‘তারপর কি হল?’ জানতে চাইল ও।

‘ছেলে মারা গেছে একথা প্রথমে বিশ্বাস করেননি মিঃ রহমান,’ খীর, ক্লান্ত সুরে বলল পারভিন। ‘উনি ভেবেছিলেন টাকা আদায়ের জন্যে মেয়েটার একটা চাল এটা। কিন্তু হঠকণ্ডের একটা দৈনিক পত্রিকায় টেলিফোন করে খবর নিই আমি, জানতে পারি শফিক

পাশের কামর

সত্যি মারা গেছে। মিঃ রহমান এরপর বললেন, মেয়েটার আসার দরকার নেই, সে যেন শুধু লাশটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে।’

‘কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটা তো অসহায় হয়ে পড়ল, তাই না...?’

রানাকে বাধা দিয়ে বলল পারভিন, ‘মিঃ রহমান বললেন, আমি যেন চিঠি লিখে মেয়েটাকে জানাই, হুগকঙেই তার রুটি-রোজগারের একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। কিন্তু, জানেনই তো, লাশের সাথে সে-ও চলে এসেছিল...কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে এখানে না এসে সোজা আপনার অফিসে...’

‘জানি,’ বলল রানা। পারভিনের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, ‘শফিকের লাশ ? সেটা কোথায় ?’

নিমেষের মধ্যে মুখের চেহারা ক্যাকাশে হয়ে গেল পারভিনের। মনের ভেতর যে একটা সাংঘাতিক ভাবাবেগের আলোড়ন উঠেছে, বাইরে থেকে দেখেও সেটা পরিষ্কার টের পেল রানা।

‘আছে,’ ক্রান্ত নিঃশ্বাসে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল পারভিন। ‘পরশু মাটি দেয়া হবে।’

কয়েক সেকেন্ড পারভিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর জানতে চাইল, ‘হুগকঙে কি করত শফিক ?’

‘সেটা ঠিক জানা যায়নি। প্রথম দিকে মিঃ রহমান এখান থেকে চেষ্টা করে ওখানে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন— একটা ইণ্ডেস্ট্রি ফার্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। কিন্তু মাস ছয়েক পর চাকরিটা ছেড়ে দেয় সে। এরপর কি করত, কিভাবে চলত, ওর বাবাকে তা জানায়নি।’

‘চিঠি লিখে টাকা চাইলেই কি তা পাঠান হত এখান থেকে ?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে বছরে একবারের বেশি টাকা চাইত না ও।’

পাঁচশো ডলারের বেশি চায়ওনি কখনও। মনে হয়, রোজগারের একটা রাস্তা তার ছিল।’

পারভিনকে সতর্ক হবার কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করে প্রশ্নটা করল রানা। শফিকের সাথে আপনার কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল? মানে, তাকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন?’

চমকে উঠল পারভিন। প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর বিমূঢ়, সবশেষে রাগের ভাব ফুটে উঠল চহারায়। কিন্তু নিজেই সামলে নিল ক্রোধ। ঘীরে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। চেক বইয়ের একটা পাতা হিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘আপনার কি কত জানা নয় আমাদের, এটা অগ্রিম হিসেবে রাখুন। এক লক্ষ টাকা। আপাতত চলবে তো? হওকঙ থেকে ফিরে এসে বিল করবেন, সব মিটিবে তেরা হবে। আর, কবে রওনা হতে পারবেন, সেটা জানালেই আমরা আপনার প্লেনের টিকেট কেটে রাখতে পারব। এখন আপনি আসুন মিঃ ডিউক।’

চেকটা নিল রানা। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল। ওঠার কোন লক্ষ্য দেখা গেল না ওর মধ্যে। ‘বলুন,’ নরম সহানুভূতির সুরে বলল ও ‘আমি শুনেছি...

‘না।’ চাপা গলায় বাধা দিল পারভিন। ‘আপনি কি শুনেছেন তা আমি জানতে চাই না। প্লীজ, আপনি এখন আসুন।’

অসহায় ভক্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘বেশ। এ-প্রসঙ্গে আমি আর কোন প্রশ্ন করব না আপনাকে। কিন্তু আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। এই খুনের কিনারা করতে হলে এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা দরকার।’

‘বলুন।’ ধমধমে গলায় বলল পারভিন। রানা লক্ষ্য করল, একই

পাশের কামরা

একটু কাপছে মেয়েটা ।

‘কেমন লোক ছিল শফিক ?’

‘লম্পট, মিথ্যাবাদী, নাঁচ ছিল । পেয়েছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর ?’
ধরধর করে কাপছে এখন পারভিন । ‘দয়া করে এবার আপনি যাবেন
কি ?’

বীয়ে বীয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা । ‘আর যদি কিছু
বলার না থাকে আপনার...’ কাঁধ ঝাঁকাল ও ।

‘নেই ।’ কঠিন সুরে বলল পারভিন ।

‘তবু যদি কিছু বলার আছে বলে মনে করেন, আমার কোন
নাশার তো আপনার কাছে আছেই !’ বলে আর দাঁড়াল না রানা ।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার ।

‘কি ?’ খুব ধেন অবাক হয়েছে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ । ‘মীর
সাহেব তোমাকে হওকও পাঠাচ্ছেন ? কেন ?’

‘তার ধারণা, সুজি কোয়াও-র ক্যাকগ্রাউণ্ড জানা থাকলে এই
কেসের সুরাহা করা সহজ হবে,’ বলল রানা । ‘আইডিয়াটা আমার
ভাল লেগেছে ।’

‘যন্তোসব ।’ বিরক্তি প্রকাশ করল ইন্সপেক্টর । পরমুহূর্তে সগর্বে
হাসল সে ‘হওকও না গিয়েও মেয়েটা সম্পর্ক যতটুকু জানতে
পেরেছি আমি, ওখানে গিয়ে তার সিকি ভাগও জানতে পারবে
না তুমি । আমার কানেকশন আছে, একটা টেলিফোন করে সব
জেনে ফেলেছি ।’

‘তাই ?’ বলল রানা । ‘তা কি জানতে পেরেছেন ?’

‘মেরেটার নাম সূজি কোয়াও। চীন থেকে ম্যাকাও এসেছিল, সেখান থেকে হঙকঙ। হঙকঙ পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে। ছ’হপ্তা জেল হয় ওর। তারপর ছাড়া পেলে কাগজ-পত্র মানে নতুন পরিচয়-পত্র দেয়া হয় ওকে। সেই থেকে গোল্ডেন ড্রাগনে চাকরি করত ও—নাচত। তার মানে, বুঝতেই পারছ, আসলে কলগার্ল ছিল।’

‘হু,’ বলল রানা। ‘আর কি?’

‘শফিকের সাথে ওর বিয়ে হয় গত বছর একুশে সেপ্টেম্বর...

‘কোথায় হয় বিয়েটা?’

‘হঙকঙে প্রচুর মুসলমান আছে, জ্ঞান বোধহয়? বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সাধারণত কাজীর অফিসে সারা হয়। ওদের বিয়েটাও তাই হয়। বিয়ের পর হোটেল রুমোপলিটানে ওঠে ওরা। শফিকের বোধহয় কোন রোজগার ছিল না, বউয়ের রোজগারেই বাবুগিরি করত।’ এক গাল হাসল কয়েজ আহমেদ। ‘এর বেশি জ্ঞান আর কি আছে? হঙকঙে গিয়ে এর চেয়ে বেশি আর কি জানতে চাও তুমি?’

প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে রানা জ্ঞানতে চাইল, ‘এদিকে আপনি কতদূর এগোতে পারলেন?’

‘কই আর এগোতে পারছি!’ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কয়েজ আহমেদ। ‘সেই প্রথম প্রশ্নটারই তো উত্তর মিলছে না। অত রাতে, তিনটির দিকে, তোমার অফিসে কেন গিয়েছিল সূজি কোয়াও?’

‘আমারও ওই এক প্রশ্ন,’ বলল রানা। ‘তাছাড়া, হঙকঙের একটা মেয়ে, আমার কথা জানলই বা কিভাবে? ভাল কথা, মেরেটার সাথে লাগেজ কি ছিল না ছিল খোঁজ নিয়েছেন?’

‘নিয়েছি। সামান্য কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই

তার স্যুটকেসে ।’

‘আমার কাছে কেন গিয়েছিল, এর উত্তর বোধহয় হঠকঙে গেলে পাব,’ সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। ‘আরেকটা কথা ভেবেছেন কি ?’

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ইন্সপেক্টর ।

‘বুড়ো মীর সাহেবের অগাধ সয়-সম্পত্তি, বেঁচে থাকলে শফিকই এসব পেত । উনি যদি উইল পাণ্টে না থাকেন, তাহলে এসব পাবে তার পুত্রবধূ সুজি কোয়াও ।’ শফিকের প্রথম বিয়ের কথাটা ইচ্ছে করেই তুলল না রানা । ‘এখন জানতে হবে, এমন কেউ আছে কিনা যে সুজি কোয়াও-র অবর্তমানে সব সম্পত্তির মালিক হবে ? খুনের এটা একটা মোটিভ হতে পারে ।’

‘নাহ্, তোমার এই গুণটার কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে —নতুন নতুন আইডিয়া আসছে ত আসছেই । দেখব, ব্যাপারটা আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখব ।’

‘বুড়ো মীর সাহেবের সেক্রেটারীর সাথে কথা বলেছেন ?’ জানতে চাইল রানা । ‘বুড়ো মারা গেলে সম্পত্তির কিছু ভাগ ও যদি পায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । বুড়োর সব কিছুতেই তো ওই সেক্রেটারী । শুনেছি, শফিকের সাথে ওর নাকি হৃদয়ঘটিত একটা ব্যাপারও ছিল । সুজি কোয়াও যখন খুন হয়, রাত তিনটের দিকে, সেক্রেটারী মেয়েটা তখন কোথায় ছিল, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না ।’

‘তোমার এই আইডিয়াটা আমার তেমন পছন্দ হল না,’ বলল কয়েজ আহমেদ । ‘কে কার সাথে প্রেম করত তা আমার জানার কোন দরকার নেই । আমি শুধু জানতে চাই, হঠকঙ থেকে ঢাকায় নেমে অত রাতে সুজি কোয়াও তোমার অফিসে গেল কেন ? এই

‘প্রশ্নের উত্তর পেলে সবরহস্যের মীমাংসা করে ফেলব।’ খুব আশ্ব-
বিশ্বাসী মনে হল ইন্সপেক্টরকে।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল রানা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে সোজা রশ্মি বিন্ডিঙে ফিরে এল
ও। নিভের অফিসের দরজা খুলতে যাবে, এই সময় একটা বুদ্ধি
দুকল মাথায়। কবিরডোর ধরে কয়েক গজ এগিয়ে ইনভাস্ট্রিয়াল
কেমিস্ট জাকের চৌধুরীর অফিসের সামনে দাঁড়াল, তারপর নক
করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সাজান গোছান বড় আকারের অফিস। দরজার সামনে দাঁড়ালে
সোজা সামনে একটা ডেস্ক দেখা যায়, তাতে ছোট একটা ক্যাসেট
টেপরেকর্ডার, টেলিফোন এবং পোর্টেবল টাইপরাইটার রয়েছে।
ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে পাইপ টানছে জাকের আলি চৌধুরী।
রানাকে দেখেই ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে।
‘কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন, মিঃ ডিউক।’ পাশের গদিমোড়া
একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, ‘বসুন, এখানটায় বসুন।’

রক্তবাজ হিসেবে যার কুখ্যাতি আছে, এবং অতি সম্প্রতি যার
ঘরে খুন হয়েছে একটা মেয়ে, তাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানটা
হয়ত একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু ভয়ে বা অমঙ্গল এড়াবার জন্যে মানুষ
অনেক সময় তার আচরণে কৃত্রিম আন্তরিকতা একটু বেশিই দেখিয়ে
ফেলে—ব্যাপারটাকে তাই তেমন গুরুত্ব দিল না রানা। হাসিমুখে
এগিয়ে গিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসল ও। পাশের ঘর থেকে খটা-
খট আওয়াজ আসছে, ওখানে বসে টাইপ করছে জাকের চৌধুরীর
গ্রাইভেট সেক্রেটারী মেয়েটা।

‘জা ? কফি ? না, কোক ?’ রানার দিকে বুকু হঠাৎ গলা-

পাশের কামরা

টাকে একেবারে খাদে নামিয়ে আনল রসায়নবিদ। ‘নাকি বিকেলের দিকে এসব আপনার চলে না? যদি বলেন তো একটু স্বচের ব্যবস্থাও করতে পারি আপনার জন্যে।’ হে হে করে একটু হাসল জাকের চৌধুরী। ‘ব্যবসা যখন মন্দা যায়, মনটাকে চাও’ করার জন্যে হু’ এক চোক আমিও খাই আর কি? চলবে?’ রানার দৃষ্টি অমুসরণ করে ভেস্কের ওপর রাখা টেপেরকর্ডারের দিকে তাকাল সে। ‘মাকে মধ্যে হু’ একটা গানও শুনি আর কি! মাল্লা ড, কিশোর, আশা ভেঁশলে...তা চলবে? স্বচ?’

‘লাজ ওসবের কোন দরকার নেই, আরেকদিন এসে আপনার স্বচ এবং সঙ্গীতের সঙ্গ্যবহার করা যাবে। আমি একটা কাজে এসেছি।’

‘বলুন। বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি।’

‘না, ভয়ন কিছু না,’ বলল রানা। ‘একটা তথ্য দরকার আমার, আপনি জানেন কিনা...মানে, মীর সাহেবের এই যে অগাধ সম্ভ্রম, ছেলের মৃত্যুর পর এসব পাবে কে? নিশ্চয়ই তার কোন আত্মীয় আছে...?’

ফ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী। ‘পরিবারটিকে অনেক দিন থেকে চিনি আমি। শফিক নিজেই একবার বলেছিল আমাকে, ওর বাপের সম্ভ্রম ও একাই পাবে, কারণ আর কোন দাবীদার নেই।’

‘তাহলে? এখন মীর সাহেব কাকে...’

‘কাকে আবার, পারভিনকে দিয়ে যাবেন সব।’

‘হু,’ বলল রানা। ‘তার মানে, চীনা মেয়েটা খুন হয়ে পারভিনের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।’

কেমন যেন একটু বিমূঢ় দেখাল জাকের চৌধুরীকে। ‘ঠিক তানয়, কারণ, চীনা মেয়েটা বেঁচে থাকলেও শকিকের বাবা তাকে কিছু দিয়ে যেতেন বলে মনে হয় না।’

‘কিন্তু শকিকের স্ত্রী হিসেবে দাবী করার অধিকার থাকত তার। কোর্ট বোধহয় তার পক্ষেই রায় দিত।’

ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল জাকের চৌধুরী। তারপর বলল, ‘বোধহয়।’ ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল হঠাৎ করে। ‘তার মানে, যেই খুন করে থাকুক চীনা মেয়েটাকে, নিজের অজান্তেই বোধহয় পারভিনের উপকার করেছে সে।’

‘নিজের অজান্তে বলছেন কেন? এমনও তো হতে পারে যে পারভিনের উপকার হবে মনে করেই খুনটা করা হয়েছে? এমনও তো হতে পারে যে নিজের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি পারভিন, কিন্তু সোজা পথে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে বাকী অর্থাৎ ক্রাইমের পথ ধরেছে সে?’

কয়েক সেকেন্ড বোকার মতো ভাকিয়ে থাকল জাকের চৌধুরী। তারপর ফিসফিস করে বলল, ‘মাই গড! চমৎকার একটা মোটিভ আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি, ইয়েস।’

‘পারভিন সম্পর্কে আর কি জানেন, বলুন তো?’ একটা সিগারেট ধরাল রানা। ‘ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি...’

‘মা ছোটবেলায় মারা গেছে, কোন ভাই-বোন নেই, বাবা সাখাওয়াৎ হোসেন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু তিনিও পারভিনের নিয়ের আগে মারা যান—এর বেশি আর কিছু জানি না আমি।’

জাকের চৌধুরীর সেক্রেটারী মেয়েটা কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে

পাশের কামরা

এসে রাখল ডেস্কের ওপর। উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আজ চলি। ওদের সম্পর্কে যদি কিছু মনে করতে পারেন, আমাকে জানাতে ভুলবেন না, কেমন, মিঃ চৌধুরী? এই কেসের সুরাহা করতে হলে খুঁটিনাটি সব কিছু আমার জানা দরকার।’

‘অবশ্যই।’ উঠে দাঁড়িয়ে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল জাকের চৌধুরী। ‘কেসটার কতদূর কি হল, আমাকেও জানাবেন আপনি, কেমন, মিঃ ডিউক?’

জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

পাঁচ

পরদিন সকালে মীর-মঞ্জিলে ফোন করল রানা। পারভিনকে বলল, ‘এদিকে আমার আর কোন কাজ নেই, কালই হঙকঙে যেতে পারি। প্লেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কি?’

‘আজ সন্ধ্যার মধ্যে সব সেরে রাখব আমি,’ বলল পারভিন।

‘আর কিছু?’

‘আর কিছু মানে?’

‘আপনার আর কিছু দরকার হবে?’

‘মীর-মঞ্জিলে আমার একবার যেতে হতে পারে,’ বলল রানা।

‘এই সন্ধ্যার দিকে।’

‘কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তো মিঃ মীর বাড়িতে থাকবেন না...

‘আপনি থাকবেন তো ?’

‘তা থাকব, কিন্তু আমাকে আপনার কি দরকার, মিঃ ভিটক ?’
শান্ত বর্জস্বর, কোন রকম উত্তেজনা নেই।

‘দেখা হলো বলব,’ পারভিনকে আর কিছু বলতে না দিয়ে রিসি-
ভার রেখে দিল রানা।

বেলা এগারোটোর দিকে হুকুম আলিকে মাত্র বিদায় করে একটা
সিগারেট ধরিয়েছে রানা, এই সময় পর্দা সরিয়ে উকি দিল জাকের
চৌধুরী। ‘না, আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসিনি। একটা কথা
জিজ্ঞেস করেই কেটে পড়ব। আপনি জানেন, কখন মাটি দেয়া হবে
শফিককে ? আমারও যাওয়া উচিত, তাই না ? হাজার হোক ছোট-
বেলার বন্ধু ছিল...’

‘কাল মাটি দেয়া হবে, কিন্তু কখন তা তো জানি না।’

নিরাশ হল জাকের চৌধুরী। ‘কি করে জানা যায় বলুন তো ?’

‘আজ সন্ধ্যায় পারভিনের সাথে দেখা করছি, তখন জিজ্ঞেস করে
জেনে নেব।’

‘প্রীজ ! খুব ভাল হয় তাহলে।’ দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করল জাকের
চৌধুরী। ‘হুকুম আলি বলছিল, আপনি নাকি কাল হুগুগুত যাচ্ছেন ?’

‘হ্যাঁ, আপনার বন্ধুর বাগার প্রতিনিধি হিসেবে। মীর সাহেবের
ধারণা, ওখানে অনেক সূত্র পাওয়া যাবে।’

‘ওনার সাথে তাহলে দেখা করেছেন ? কেমন মনে হল ভদ্র-
লোককে ?’

‘নিঃসঙ্গ। পুত্রশোকে কাতর। ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প হল।
অল্প ক’টা দিন বাঁচবেন আর, অথচ আপনজন বলতে কেউ নেই
বাকে দেখে অতীতের মর্যাস্তিক ঘটনাগুলো ভুলে থাকতে পারেন।’

ফাঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল চৌধুরী। ‘সত্যি। বড় প্যাথ-টিক।’ আবার দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করল সে। ‘আপনার অনুপস্থিতিতে যদি কোন কাজ করার থাকে, বলতে পারেন আমাকে।’

‘ধন্যবাদ। অফিস বন্ধ করেই যাব আমি।’

‘ফিরে এসে কিন্তু ওখানে কি দেখলেন, কি ঘটল সব বলতে হবে আমাকে।’ আবদারের সুরে বলল চৌধুরী।

‘বলব।’

চলে গেল চৌধুরী।

সেদিন বিকেলে গাড়ি নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা। আগেই বলে রেখেছিল ও, মর্গ থেকে সূজি কোয়াও-র একটা ফটো তুলিয়ে রেখেছিল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে ফটোগ্রাফার, ফটোতে একেবারে জ্যাস্ত লাগছে মেয়েটাকে। ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে আগেই জেনেছে রানা, আজিমপুর কবরস্থানে মাটি দেয়া হবে সূজিকে, তার মানে মীরদের পারিবারিক কবরস্থানে তার ঠাই হচ্ছে না।

সেদিনের মতো সন্ধ্যা ছটার দিকে অফিসে তালা দিল রানা। কাল ক’টার সময় ফ্লাইট জানা নেই, শেষ মুহূর্তে যাতে ভাড়াহুড়া করতে না হয় তাই পুরনো ডেরায় ফিরে এসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা পৌছল মীর-মজিলে।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে বাটলার নয়, সেক্রেটারী পারভিন নিজেই খুলে দিল দরজা। শাস্ত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে না আছে

আনন্দ, না বিরাগ। 'আমুন' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হলক্রমে, সেখান থেকে একটা প্যাসেঞ্জর ধরে নিজের ড্রইং-ক্রমে। পথে কোন কথা হল না, পিছন ফিরে একবার তাকালও না পারভিন। ড্রইংক্রমটা রুচিসম্মত ভাবে সাজান, দেয়ালে কয়েকটা তৈলচিত্র, জানালায় মখমলের পর্দা, মেঝেতে দামী কার্পেট। একটা সোফা দেখিয়ে বসতে বলল পারভিন। বসল রানা। সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে লক্ষ্য করল, আজ একটু সাজগোজ করেছে পারভিন। রানার সামনের সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বলল, 'মীর-মঞ্জিলে এসে কেউ খালি মুখে ফিরে যাবনা, চা বলি?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমি এসেছি শফিকের একটা কটো চাইতে। আছে আপনার কাছে?'

'শফিকের ফটোগ্রাফ?' অবাক বেখাল পারভিনকে। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল সে। 'কেন? কি দরকার?'

'আমি যে শুধু সূজি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হওকঙ যাচ্ছি তা নয়, শফিক সম্পর্কেও খবর ঘোগাড় করতে হবে আমার। সেজন্যেই ওর ছবি দরকার। আছে?'

কি যেন একটু চিন্তা করল পারভিন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় কাত করে বলল, 'আছে।' ঘুরে একটা শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কবাত খুলে ভেতর থেকে অনেকগুলো খামের ভিতর থেকে একটা খাম বেছে নিল সে। আবার ঘুরল, ধীর পায়ে চলে এল আগের জায়গায়। খামটা খুলছে, এই সময় সেটার ভেতর থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ পড়ে গেল সোফার ওপর। সামনের দিকে একটু ফুঁকে ফটোটা দেখল রানা। বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারা। চোখের সামনে ভেসে উঠল পণির সেই সঙ্গীটির চেহারা।

সেই সাথে মনে পড়ে গেল ছেলেটির সেই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে উচ্চারিত কথাটা—‘আমার নাম মীর সাদেকুর রহমান’।

ক্রম কটোটা তুলে খামের ভেতর ভরে রাখল পারভিন। অন্য একটা কটো রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, ‘এই নিন, ওর এই একটা ছবিই ছিল আমার কাছে।’

সাধারণ কোন স্টুডিওতে তোলা হয়েছে ছবিটা। হাফ পোস্টকার্ড সাইজ। ছবির লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। মুখটা হাসি হাসি, চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, সাংঘাতিক ধূর্ত একজন লোক। ভুরু জোড়া বড় বেশি মোটা। কর্কশ মুখের ঠ’পাশে হাড় ওঠা চেহারা। একজন ক্রিমিন্যালের চেহারা, মনে হল রানার। রীতিমত বিস্মিত হয়েছে ও। শকিত যে এই রকম দেখতে হবে, ভাবতেও পারেনি। মিথ্যেবাদী, লম্পট, নীচ—শকিত সম্পর্কে কি বলেছিল পারভিন, মনে পড়ে গেল ওর। ছবি দেখে কথাগুলো বিশ্বাস হল। চোখ তুলে দেখল, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে পারভিন। চেহারায় কোন ভাব নেই।

থুক করে একটু কেশে বলল রানা, ‘ছবির এই লোকটা যে মীর সাহেবের ছেলে, বিশ্বাসই হয় না।’

একচুল নড়ল না পারভিন, একটা কথাও বলল না। যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকল।

‘ভাল কথা, চীনা মেয়েটা কেমন দেখতে ছিল, জানতে ইচ্ছে করে আপনার?’ পকেট থেকে স্মৃতি কোয়াও-র কটোটা বের করে পারভিনের দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

এক হুই করে দশ সেকেন্ডে পেরিয়ে গেল, ছবিটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল না পারভিন। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখল রানা, রানা-১৮

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। আরো ছ'সেকেণ্ড পর রানার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতে ধরা ফটোর দিকে তাকাল। রানার মনে হল, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পারভিন। নিজেই শান্ত রাখতে অনেক যেন কষ্ট হচ্ছে তার। হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল এবার। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। অভিব্যক্তিহীন চেহারা। মনের ভেতর কি হচ্ছে না হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। তারপর ছবিটা ফেরত দেবার জন্যে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

মুহূ গলায় বলল, 'খুব সুন্দরী ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আপনি জানেন, কাল কখন মাটি দেয়া হবে শফিককে?'

হঠাৎ কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠল পারভিন। 'কেন? তা জেনে আপনার কি দরকার?'

'শফিকের একজন স্কুল-ফ্রেন্ড সময়টা জানতে চাইছিল। ভদ্র-লোকের নাম জাকের আলি চৌধুরী।'

সারা শরীর পাথর হয়ে গেল পারভিনের। 'শফিকের বাবা মিঃ রহমান ছাড়া ওখানে আর কেউ থাকবে না। বন্ধুটি যেই হোক তাকে বলে দেবেন মীর পরিবার বাইরের কাউকে ওখানে চায় না।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাকিয়ে বলল রানা। 'বলে দেব। কবর দেবার সময় থাকতে না পারলে ভদ্রলোক বোধহয় কিছু ফুল পাঠিয়ে দেবেন...'

হঠাৎ রানার দিকে পিছন ফিরল পারভিন। 'না।' কঠিন সুরে বলল সে। 'ওখানে কারো ফুল পাঠাবারও দরকার নেই।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, মিঃ ডিউক?'

‘আছে,’ বলল রানা। ‘এইমাত্র বাচ্চা ছেলের বেকটোটা সোকার পড়ে গিয়েছিল, জানতে পারি কে ও ?’

চরকির মত আধপাক ঘুরল পারভিন। চোখ দুটো ঝলছে তার। ‘আপনার এসব প্রশ্নের মর্থ কি বলুন তো ? গতকালও আপনি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে আমাকে বিভ্রত করেছেন। কেন ?’

‘কেন ?’ তিস্ত একটু হাসল রানা। ‘এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না ? খুনটা আমার অফিসে করা হয়েছে। খুনী ফাঁসাবার চেষ্টা করেছে আমাকে। আমি যে নির্দোষ, সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে না ? এবং তা করতে হলে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে আমার। কিভাবে তা সম্ভব, বলতে পারেন ? সম্ভব মীর পরিবারের সাথে কোন না কোন সম্পর্ক আছে এমন সবাইকে সন্দেহের তালিকায় ফেলে এক এক করে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করা। শেষ পর্যন্ত এক কি দু’জনকে কোনোভাবেই তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। কারণ সে অথবা তারাই প্রকৃত অপরাধী। এই মুহূর্তে আপনিও আমার সন্দেহের তালিকায় আছেন।’

‘আ-আমি ?’ হতভম্ব দেখাল পারভিনকে।

‘হ্যাঁ, আপনি। আমার সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটাই আপনার।’

‘এসব কি বলছেন আপনি ?’ অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিফারিত হয়ে উঠল পারভিনের।

‘সুজি কোয়াও মারা গেলে একমাত্র আপনারই লাভ, কথাটা অস্বীকার করতে পারেন ?’

‘আমার লাভ ?’

‘নয় ?’ নির্মম শোনালা রানার কণ্ঠস্বর। ‘ফটোর ওই বাচ্চা ছেলে-

টা কে ? ওর নাম মীর সাদেকুর রহমান নয় ? ওর মায়ের নাম পারভিন আর বাবার নাম মীর শফিকুর রহমান নয় ? আপনি এ-বাড়ির বউ নন ?' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর বলল, 'চুপ করে থাকবেন না, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন ।'

পারভিন যেন পাথর হয়ে গেছে । স্তব্ধ বিষ্ময়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে ।

'এসব সত্যি জেনেও আপনি চুপ করে থাকছেন । কারণ, আপনার হয়ত ভয়, কথাগুলো স্বীকার করলেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে । সেই সাথে খুনের সম্ভাব্য একটা মোটিভ প্রকাশ হয়ে পড়বে । সেজন্যেই চুপ করে আছেন আপনি কে জানে, আপনার এই চুপ করে থাকার পেছনে হয়ত আরো অনেক বড় কারণ আছে ।'

'আ-আমি এ-বাড়ির ব-বউ ?' ফিস্‌ফিস করে বলল পারভিন । 'আ আপনি জানলেন কিভাবে ? কারো তো জানার কথা নয় ।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর হল না ওটা ।'

'না !' হঠাৎ তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় বলল পারভিন । 'মিথ্যে কথা ! আমি-এ বাড়ির কেউ নই । আমি মিঃ রহমানের সেক্রেটারী, তার বেশি কিছু না । কোথেকে শুনেছেন আপনি ? কে বলেছে আপনাকে ?'

'শফিকের বন্ধু নকল মৌলভী সঙ্গে আপনার বিয়ে পড়িয়েছিল, কথাটা মিথ্যে ?' হঠাৎ গলার সুর নরম করে আনল রানা । 'এই খুনের কিনারা হোক আপনি কি তা চান না ? আপনার বিয়েটা স্বীকৃতি পাক, তাও কি আপনি চান না ? আমার কথায় জবাব দিন, আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই । সেই নকল মৌলভীর খোঁজ করেছেন কখনও ? সে বেঁচে আছে কিনা জানেন ?'

বিমূঢ়, বিহ্বল দেখাল পারভিনকে । বোকার মতো তাকিয়ে

পাশের কামরা

থাকল সে। তারপর হঠাৎ অস্থিরতা প্রকাশ পেল তার চোখের দৃষ্টিতে। ‘এসব আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন ? প্রীজ, বলুন আমাকে !’

‘শফিকের একজন বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছি সব,’ বলল রানা। ‘শফিকই গল্প করেছিল তার কাছে। আমার কথার জবাব দিন, সেই নকল মৌলভীকে চেনেন আপনি ?’

‘অনেকক্ষণ চূপ করে থাকার পর মুহূ, শাস্ত গলায় বলল পারভিন, ‘না।’

‘তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না ?’

‘না।’

‘আবার যদি দেখেন তাকে, দাড়ি না থাকা অবস্থায়, চিনতে পারবেন ?’

‘না।’

‘দাড়ি থাকলে চিনতে পারবেন ?’

‘পারব।’ দাড়িয়ে আছে রক্ত-মাংসের পারভিন নয়, যেন একটা কাঠের পুতুল।

‘বিয়ে পড়াবার সময়, তার আগে বা পরে, লোকটাকে আপনি লক্ষ্য করেননি ? তার কোন বৈশিষ্ট্য আপনার চোখে ধরা পড়েনি ?’

‘না।’

‘কখনও তার খোঁজ করেছিলেন ?’

‘মিঃ রহমান করেছিলেন, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমি জান-তাম তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না, তাই...’

‘হু’, গম্ভীর সুরে বলল রানা। একটু চিন্তা করল ও। তারপর বলল, ‘শফিকের সেই সময়কার বন্ধুদের একটা নামের তালিকা দিতে

পারেন আমাকে ? যারা মাইক্রোবাস অ্যান্ড্রিডেটে মারা গিয়েছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে তৈরি করতে হবে তালিকাটা। নাম, সেই সাথে ঠিকানা, এবং সম্ভব হলে একটা করে ফটো। সম্ভব ?

‘কয়েক জনের নাম এবং তখনকার ঠিকানা আমার জানা আছে, আর ফটোর জন্যে শফিকের অ্যালবামগুলো দেখতে হবে আমাকে। কিন্তু অ্যালবামগুলো কোথায় আছে জানি না’, হু’ একদিন সময় লাগবে খুঁজতে।’ কি যেন ভাবল সে, তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, ‘কিন্তু এসব কিসের জন্যে, মিঃ ডিউক ?’

‘আপনি মীর বাড়ির বউ হিসেবে স্বীকৃতি চান না ? চান না, আপনার সম্মান তার ন্যায্য সম্মান আর অধিকার ফিরে পাক ?’

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পারভিন। রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল ও, বলল ‘যার স্বীকৃতি দরকার ছিল সে-ই যখন নেই, ও দিয়ে আর কি হবে ? এমনি তো ভালই আছি। চাকরি করে ছেলেটাকে ঠিকই মানুষ করতে পারব আমি। মীর বাড়ির বউ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মানেই তো অগাধ স্নায়ু-সম্পত্তির নিচে চাপা পড়া। ওসব আমার দরকার নেই।’

দরকার নেই, নাকি সোজা পথে পাবার কোন আশা নেই জেনে বাকা পথে নিজের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে ? কিন্তু সন্দেহটা মনেই পুষে রাখল রানা। বলল, ‘কিন্তু আপনার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতিকার আপনার চাওয়া উচিত এবং অন্যায় শুধু আপনার ওপর করা হয়নি, মীর সাহেবের ওপরও করা হয়েছে। তাঁর একমাত্র বংশধর বেঁচে আছে, অথচ তাকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারছেন না—তাঁর এই নিঃসঙ্গতার জন্যে আপনার হুঃখ হয় না ?’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় পারভিন বলল, ‘হয়।’

আমি বুঝতে পারি, এই বুড়ো বয়সে আমাদের কথা ভেবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি। কিন্তু আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন, সে উপায়ও তাঁর নেই। আমি যার স্ত্রী সে-ই আমাকে স্বীকার করেনি।
উনি কি করতে পারেন ?’

‘আমি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই,’ বলল রানা।
‘চেষ্টা করলে আপনাদের বিয়েটা হয়ত এখনও প্রমাণ করা সম্ভব।’

‘আমি তা মনে করি না। প্রমাণ করতে গেলে শুধু শুধু মীর পরিবারের হুঁসুমি ছড়াবার পথই প্রশস্ত করা হবে—সেটা আমার কাম্য নয়।’

‘হুঁ,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা। ‘ঠিক আছে, দেখা যাক ঘুরে দাঁড়াল পারভিন, দেবরাজ খুলে একটা এনভেলোপ বের করল এগিয়ে এসে সেটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ‘এতে আপনার প্লেনের টিকেট আর কিছু হওকও ডলার আছে। টেলিফোন করে ওখানে কোন হোটেলের রুম রিজার্ভেশন করে রাখব ? মিরমো আর দি পেনিনসুলা ওখানের সবচেয়ে ভাল হোটেল...’

‘না, আমি হোটেল কম্বোপলিটানে উঠব বলে ঠিক করেছি।’

হঠাৎ মতর্ক সঙ্গিত হয়ে উঠল পারভিন। ‘ও, আচ্ছা।’

‘ক’টার সময় ফ্লাইট ?’ উঠে দাঁড়াল রানা।

‘এগারোটায়,’ বলল পারভিন। ‘ঘাবার আগে আর কিছু প্রয়োজন হলে টেলিফোন করবেন, কেমন ?’

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে বসে সিগারেট ধরাল। মাত্র আটটা বাজে। কোথায় যাওয়া যায় এখন ? মনে কী একটু আশা ছিল পারভিনের সাথে সাপার খাবে। কিন্তু প্রস্তাব দেবার মতো ঘনিষ্ঠ হবার অবকাশই দেয়নি মেয়েটা। ওকে সঙ্গ দেবার রানা-:

মতো মেয়ে ঢাকা শহরে কম নেই, কিন্তু পারভিনের জায়গায় তাদের কাউকে মনে ধরল না ওর। অগত্যা ঠিক করল, বাড়ি ফিরবে। কাল হওকঙে নেমেই হয়ত তদন্তের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে ওকে, আজকের রাতটা স্টেটে ঘুমান যাক।

গাড়ি হাঁকিয়ে মগবাজারে চলে এল রানা। এখানেই ওর পুরনো আস্তানা। মেইন রোডের ওপর একসার গ্যারেজ। গ্যারেজের ওপর দুই কামরার ছোট ফ্ল্যাট। কামরা দুটো স্বচ্ছকার, দেয়ালগুলো সীাতস্টে। জানালাগুলো লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু সেগুলো সচরাচর খোঁলে না ডিউক। কৌতূহলী মানুষের চোখের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে ও। আধ-বহেসী ঠিকে যি রোজ একবার করে এসে ঘর-মোছা আর বাসন পেয়ালা ধোয়াধুয়ের কাজগুলো সেরে দিয়ে যায়। ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা একটা বারান্দা, পাতলা তারের জাল দিয়ে ঘেরা সেটা। সিঁড়ির হ'পাশে উঁচু পাঁচিল, ওঠা নামার সময় কারো চোখে পড়তে হয় না। সিঁড়ির নিচে অত্যন্ত মজবুত সদর দরজা, বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সেটার তালা দিয়ে গেলেও কারো কিছু বলার নেই। আর সব গ্যারেজের ওপরও এই রকম কিছু ফ্ল্যাট আছে, সেগুলো সব অফিস ঘর হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর এলাকাটা একেবারে ফাঁকা মুক্তাঙ্গন হয়ে যায়।

দোতালার উঠে কামরার সামনে দাঁড়াল রানা। পকেট থেকে চাবি বের করে ইয়েল লকটা খুলল। বসার ঘরে ঢুকল ও। বন্ধ করল দরজা, কিন্তু তালা দিল না। হঠাৎ কি যেন দেখে ছ'্যাৎ করে উঠল বুক। ফ্ল্যাটের পিছন দিকে একটা প্রথম সাহির প্রসাধনী কোম্পানীর নিওন সাইন আছে, সেটার লাল নীল আলো ঘরের ভেতরে ঢুকছে বলে লোকটাকে দেখতে পেল রানা। জানালার ধারে একটা

পাশের কামরা

আর্মিচেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ আরাম করে বসেছে সে, পায়ের ওপর তুলে দিয়েছে পা, কোলের ওপর ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজের ওপর নিঃসাড় পড়ে আছে হাত দুটো। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় এ লোকের আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।

প্রতি মুহূর্তে বিপদের সাথে সহবাস ঘা, বিপদ চিনতে তার তুল হবার কথা নয়। অন্ধকার ঘরে লোকটাকে বসে থাকতে দেখে হাট-বিট বেড়ে গেল রানার। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল ওর। নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, অনুভব করল এরই মধ্যে জুলফির নিচে সড় সড় করছে ঘামের ধারা। পাশেই আলোর সুইচ, হাত তুলে সেটা টিপে দিল ও।

অল্প বয়স, বাইশ কি তেইশ। বয়সের তুলনায় কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। কোমরটা সরু, কিন্তু বুকটা প্রশস্ত। এ ছোকরা অশ্রুর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, মনে মনে স্বীকার করে নিল রানা। কালো একটা লেদার জ্যাকেট পরে আছে, ট্রাউজারটাও কালো। গলার একটা লাল রুমাল প্যান বর্ঠনালীর কাছে উঁচু হয়ে আছে রুমালের গিটটা।

দেখেই চিনতে পারল রানা—জাত খুনী। অনেক শিশু যেমন পিঁপড়ে টিপে মেরে আনন্দ পায়, এরা তেমনি অকারণে বা সামান্য কারণে মানুষ খুন করে মজা পায়। ছেলেটার চোখ দুটো আঁকা ছবির মতো, সমতল। মণি দুটো ঝলঝল করছে। জুলফির নিচে থেকে চিবুক পর্যন্ত সাদা একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন, বোধহয় ছুরি খেয়েছিল। এদেরকে চেনা আছে রানার। ড্রাগ অ্যাডিক্ট। এই বয়েসী যত খুনী এর আগে দেখেছে রানা তাদের সবার চেয়ে ভয়ংকর মনে হল একে। আশ্চর্য এক অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা অনুভব করল সে।

কীণ, ঠাণ্ডা, নিঃশব্দ হাসি ফুটল ছেলেটার ঠোঁটে। গলার আঙ
 সাজটা খসখসে, কর্কশ শোনাল, 'বেশ ভাল লোক তো হে তুমি।
 সবার সাথেই এই রকম ভদ্রতা কর ? কাউকেই অপেক্ষা করিয়ে
 রাখতে জান না ? আমি তো ভেবেছিলাম, রাত কাবার ন' করে
 ফিরবে না তুমি।'

পিস্তলটার কথা মনে পড়ল রানার। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে
 বোখাও রয়ে গেছে ওটা। ধীরে ধীরে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠছে ও,
 কিন্তু পকেটে পিস্তল থাকলে এতটা ঘামতে হত না তাকে। 'কে
 তুমি ?' কঠিন সুরে জানতে চাইল ও। 'এখানে কি করছ ?'

'ভয় পেয়ো না। ভীত লোক মেরে আমি মজা পাই না,' তাজ্জি-
 ল্যের সাথে হাসল মুক্তিমান বিপদ। একটা হাত নেড়ে সামনের
 চেয়ারটা দেখাল, 'বস। তোমার সাথে কাজ আছে আমার।'

এতক্ষণে লক্ষ্য করল রানা, হাতে কালো দস্তানা পরে রয়েছে
 ছেলেটা। শিরশিরে একটা অমুভূতি হল শিরদাঁড়ার কাছে।
 নিঃশব্দে একটা ঢোক গিলল ও। গলাটাকে ভারি করে বলল, 'তু'-
 সেকেও সময় দেব তোমাকে, তার আগেই যদি ঘর থেকে বেরিয়ে না
 যাও, জানালা গলিয়ে ফেলে দেব নিচে।'

ঠোঁটের নিঃশব্দ ঠাণ্ডা হাসিটা একটুও কাঁপল না। এক পায়ের
 ওপর থেকে অপর পা নামাল শুধু ছেলেটা, মেরেতে পড়ে গেল খব-
 রের কাগজ, দেখা গেল উকুর ওপর শুয়ে রয়েছে চকচকে কালো একটা
 পয়েন্ট ফোর ফাইভ। পিস্তলটার সাথে ফিট করা রয়েছে বার ইঞ্চি
 লম্বা একটা সাইলেন্সার। 'আবার সাবধান করে দিচ্ছি, ভয় পেয়ো
 না।' হাসিটা একটু চওড়া হল। 'আমি জানি, তোমার কাছে পাইপ
 নেই। পাইপ মানে পিস্তল, বোঝো তো ?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর অত্যন্ত সতর্ক-
তার সাথে কয়েক পা এগিয়ে চেয়ারটার বসল রানা। ওদের মাঝ-
খানে ছয় ফিট কার্পেট। এই সামান্য দূরত্ব থেকে ছেলেটার গায়ের
ঘাম, কাপড়ের ময়লা এবং নিঃশ্বাসে সস্তা তামাকের গন্ধ পেল রানা।
'কি চাও তুমি?'

'কি চাই?' সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।
'তোমার কলজেরটা ফুটো করতে চাই। নিশ্চয়ই বাচার খুব একটা
শখ নেই তোমার?'

'বঃ বলতে পার, মরার কোনই ইচ্ছে নেই আমার,' কিছু একটা
বলা দরকার, তাই বলল রানা।

হঠাৎ সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা রানার দিকে তাক করল
ছেলেটা। 'প্রিয় কোন বান্ধবী আছে তোমার?'

'অনেক—কেন?'

'এমনি জানতে চাইছিলাম। তুমি মারা গেলে তারা কি হুঃখ পাবে?'

'হু' একজন পেতে পারে।' দূরত্বটা একলাফে পেরোন কোন সম-
স্যাই নয়, ভাবল রানা, কিন্তু, পিস্তলটা নাগালের মধ্যে পাবার
আগেই গুলি করবে ও—ফুটো হয়ে যাবে হুঃপিও। 'এসব আবোল
তাবোল কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কি বল তো? আমার বিরুদ্ধে
কোন অভিযোগ আছে তোমার? কি করেছি আমি?'

'কিছু করনি, কিন্তু আমার হাতে খুন হবার জন্যে কাউকে কিছু
করতেই হবে এমনও কোন কথা নেই।' রক্তহীন মোটা ঠোঁট জোড়ার
একটা কোণ মল্লুত ভাবে বেঁকে গেল ছেলেটার। হাসিটা দেখে গা-
শির শির করে উঠল রানার।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি আমাকে বলবে তো?' চেয়ারে একটু নড়ে-

চড়ে বসল রানা, ডান পা তুলে বাঁ পায়ের চেয়ে একটু সামনে বাড়িয়ে রাখল, যাতে সুরযোগ পেলেনই লাফ দিতে পারে।

‘ব্যাপার ? ব্যাপার কি জানি না। তাতে আমার কিছু এসেও যায় না,’ তাক্কিল্যের সুরে বলল সে। ‘জানার মধ্যে শুধু এইটুকু জানি, এবং সেইটাই আসল কথা, কিছু টাকা রোজগার করতে যাচ্ছি আমি।’

‘তার মানে, আমাকে গুলি করার জন্যে কেউ তোমাকে টাকা দিচ্ছে ? তাই কি ?’

মাথাটা একদিকে কাত করল সে। ‘নিশ্চয়। তা না হলে শুধু শুধু তোমাকে আমি গুলি করতে যাব কেন ? গুলির দাম নেই ?’

‘সব খুলে বল আমাকে,’ শাস্ত সুরে বলল রানা। ‘আমাকে খুন করার জন্যে কে তোমাকে টাকা দিতে চেয়েছে ?’

‘জানি না,’ হাসিটা তার ঠোঁটে লেগেই আছে। ‘টাকার ধাক্কা ঘুর ঘুর করছিলাম, এই সময় এক ব্যাটা ভদ্রলোক এসে বলে কিনা, ওহে, হাজার পাঁচেক টাকা নেবে ? পকেট থেকে বেরিয়ে এল আমার হাত, পেতে দিলাম, বললাম, দাও। ব্যাটা ভদ্রলোক পকেট থেকে হাত বের করে পাঁচখানা পাঁচশো টাকার পান্ডি বের করে গুঁজে দিল আমার হাতে, বলল, বাকিটা কাজ শেষ হলে পাবে। কাজ ?—জানতে চাইলাম। তোমার ঠিকানা দিল, বলল, খতম করে ফিরে এসে সাথে সাথে পেয়ে যাবে টাকা। এখন বৃষ্টিতে পারছ, বাওয়া, কেন আমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে ?’

‘লোকটা কে ?’

‘জানি না।’ আবার একটু প্রসারিত হল হাসিটা। ‘কোন জায়গাটার, বাওয়া ? কোনখানটার খেতে চাও গুলি ? বুক ? নাকি খুলিতে ? কেউ কেউ আবার কপালের পাশে গুলি করে আত্মহত্যা করে।

তোমার নিজের কোন পছন্দ আছে ?

রানা যেন তার কথা শুনতেই পায়নি, জানতে চাইল, 'কেমন দেখতে লোকটা ?'

'রেডি...'রানার মাথার দিকে পিস্তল তাক করল সে। 'ওয়ান ...টু...'

হঠাৎ হেসে উঠল রানা। 'তোমার হাত কাঁপছে কেন ?'

'কি।' যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। 'কি বললে ?' মুহূর্তের জন্যে নিজের হাতের দিকে তাকাল সে। 'অসম্ভব ! কক্ষণো না।'

'লোকটা দেখতে কেমন ?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার চোখে তাকিয়ে আছে ও।

হো হো করে হেসে উঠল ছেলেটা। 'বুঝেছি।' হঠাৎ হাসিটা খামিয়ে বলল, 'একটু সময় পেতে চাইছ—হাত কাঁপছে না সে তুমি ভালই জান। কিন্তু লোকটা কে, দেখতে কেমন এসব জেনে লাভ কি তোমার ? কতক্ষণই বা বেঁচে আছ তুমি ?'

'কিন্তু কার লুকুমে আমি খুন হলাম তা না জেনেই মরে যাব ? বুঝতে পারছি, আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে না, কিন্তু মারার আগে একটা অনুরোধ অস্বত রাখ। কে সে ?'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। 'আর কোন কথা নয়। আল্লার নাম নাও...রেডি...ওয়ান...'

'পাঁচ হাজার আবার একটা টাকা হল ?' দ্রুত বলল রানা। 'আমি তোমাকে বিশ হাজার নগদ দিচ্ছি, পিস্তলটা সরাও।' পিস্তলে এঁটে বসে ছেলেটার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'কথা দিয়ে সেটা রাখি আমি, বরখোলাপ করি না।' এই প্রথম

ছেলেটাকে রাগতে দেখল রানা। ‘এক বার জবান দিলে প্রাণ দিয়ে হলেও সেটা রক্ষা করি।’

এই সময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে ছেলেটা, লাফ দিল রানা, হাত ছুটো বাড়িয়ে দিল পিস্তল লক্ষ্য করে।

ঠিক একটা রকেটের মতো আঘাত করল রানা। ছেলেটার মুখ আর নাক ওর মাথার প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে সাংঘাতিক খেঁতলে গেল। একই সাথে হাত ছুটো পৌঁছে গেল পিস্তলের গায়ে, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে, এই সময় গুলিও হল, ফট করে বাতাস ভরা একটা ঠোঙা ফাটল যেন। চেয়ার নিয়ে ছড়মুড় করে পড়ে গেল ওরা দু’জনেই। কিন্তু ছেলেটা যে কঠিন পাত্র, বুঝে নিল রানা। তার হাত থেকে পিস্তলটা খসাতে পারেনি ও। আকস্মিক আক্রমণে একটু বোকা হয়ে গেছে সে, তা না হলে মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থাতেও রানাকে কাবু করতে পারত। ছেলেটা মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই এক গড়ান দিয়ে একটু সরে এল রানা, তার মোটা ঘাড়ের একপাশে গোটা দুয়েক ভারি ঘুসি ঝাড়ল। এবার একটু ঠাণ্ডা হল ছোকরা, পিস্তল ধরা হাতের আগুলগুলোয় টিল পড়ল। তিন সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ওটা রানা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পান্টা আঘাত খেল ও। ঘুসিটা এত দ্রুত গতিতে এল, ভাল করে দেখতেই পেল না ও। চোখের পাশে হাতুড়ির প্রচণ্ড একটা বাড়ি সম্ভব করল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

এক সেকেণ্ড পর চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটোছুটি করতে দেখল রানা। উপলব্ধি করল, পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। নিজেই মেঝেতে আবিষ্কার করল ও, জ্বল করছে। কাপসা ভাবটা

পাশের কামরা

কেটে গিয়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দেখল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে ছেলেটা, সারা মুখ ঘন দগদগে ক্ষত আর তাজা লাল রক্তে তৈরি একটা বীভৎস মুখোশ। রানার মুখ লক্ষ্য করে লাথি ঝাড়ল সে, কিন্তু তাতে তেমন জোর নেই। ঘাড়ের পাশে ঘুসিগুলো কাজে লেগেছে, বুঝতে পারল রানা। হাত তুলে লাথি-টাকে ঠেকাল ও। গড়িয়ে সরে এল নিরাপদ দূরত্বে, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে ওরা। ওদের মাঝখানে পড়ে রয়েছে পিস্তলটা।

আহত হিংস্র পশুর মতো লাগল ছেলেটাকে রানা মুখ ভেঙাচ্ছে ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পশুটা যে বুদ্ধিমান, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল খুঁকে পড়ে পিস্তলটা দখল করার কোন চেষ্টা করল না সে। জানে, তা করতে গেলেই রানা ওর মুখের চেহারা নষ্ট করে দেবে চিরতরে।

হঠাৎ রানাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ছোকরা। াকাটা ঝাওয়ার আগে সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি মারল রানা। বুক, পরমুহূর্তে ছ'জনই ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে। দুই হাতে সনানে ঘুসি চালিয়ে ছোকরার খেঁতলান মুখটা আরো কতকিঞ্চি করে তুলল রানা। গোটা দুয়েক মারল তলপেট বরাবর। পিছিয়ে গেল ছোকরা। তলপেটে ঝাওয়া ঘুসিগুলো নরম করে এনেছে তাকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে এখন। বুঝতে পেরেছে, সত্যি সহজ হবে না রানাকে কাবু করা। লাফ দিয়ে আবার ওর ওপর পড়তে গিয়েও ছিটকে সরে গেল রানা, ছোকরার হাতে চকচকে ছুরিটা দেখতে পেয়েছে সে।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে দুজন। এটাই শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে

তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করার চেষ্টা করছে ছোকরা।

মুখ দেখে তাকে আর চেনার ঘো নেই, ক্ষতগুলো জোড়া লাগাতে গোটা দশেক সেলাই তো লাগবেই। কিন্তু তবু সে দমেনি। এখনও সে ভয়ংকর। তার চোখে খুনের নেশা আর হাতে ধারাল ছুরি দেখে আবার একটা ঢেঁক গিলল রানা। এত ভয়ংকর লোক সে জীবনে দেখেনি। প্রাকৃতিক চূর্ণাঙ্গের মত, দুর্বীর, দুর্দম।

পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও।

বীভৎস মুখটা ভেঁচানর ভঙ্গিতে বিকৃত করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল ছোকরা।

রানার একটা কাঁধ পিছনের দেয়াল স্পর্শ করল। দ্রুত, একটা ঝটকায়, গায়ের কোট খুলে ফলে বাঁ হাতের চারদিকে সেটা জড়িয়ে নিল ও। ফণা তোলা সাপের ছোবল মারার গতিতে ওর দিকে ছুটে এল ছুরি। আঘাতটা বাঁ হাতের প্যাডে নিল রানা, সেই সাথে ডান হাতে কায়দামত একটা ঘুসি ঝাড়ল তার চোয়ালে। বড়াং শব্দে ঘাড়ের সব কটা হাড় কুটল ঘুসিটার প্রচণ্ড আঘাতে। টলমল করে উঠল ছোকরা, পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে পারল না, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। ছুরিটা আগেই খসে গেছে হাত থেকে। জুতোর ডগা দিয়ে ঢোকা দিল রানা, ঘরের শেষ প্রান্তে চলে গেল সেটা।

পিছিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিল রানা, হাঁপাচ্ছে, দ্রুত উঁচু-নিচু হচ্ছে চওড়া বুক। অসহায় শিশুর মত দুর্বল লাগছে নিজেকে ওর। মনে হল, শরীরে আর কোন শক্তি নেই।

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা, ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকল দুধন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

ঠিক এই সময় মেঝেতে একটা গড়ান দিল ছোকরা। হাঁটু ভেঙে নিজের পিস্তলের ওপর পড়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা চলে এসেছে এখন তার হাতে। সব শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার শেষ চেষ্টা করল সে। পিস্তল ধরা হাতটা তুলেই অন্ধের মত রানার দিকে গুলি করল সে। ঠিক কানের পাশে দেয়ালে এসে লাগল গুলি।

পুলিশদের একজন গুলি করল। চিৎকার করে বারণ করল রানা, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ছেলেটা আবার ওকে লক্ষ্য করে গুলি করতে যাচ্ছে, এমনি সময় মারা গেল সে।

‘ওকে ফলো করে এসেছিলাম আমরা। তিনটে মার্ডার কেসের পলাতক আসামী,’ এগিয়ে এসে রানার সামনে ঠাড়াল একজন সাব-ইন্সপেক্টর। ‘আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখে ভেবেছিলাম আপনারা বোধহয় বন্ধু। কিন্তু ধস্তাধস্তির আওরাজ শুনে...’

দুই

সামনের বোর্ডে ‘নো স্মোকিং’ সাইনটা ঝলে উঠল। একটু খুঁকে জানালা পথে বাইরে তাকাল রানার পাশের সীটের আরোহী। বিশালদেহী না হলেও, লোকটা বেশ মোটাসোটা, মাথায় তেল চক-চক টাক, বড় সাইজের ঘামের ফোঁটা বিজ বিজ করছে সেখানে। গা তুলিয়ে অদ্ভুত এক স্থূল ভঙ্গিতে হাসল সে, বলল, ‘কি মজা। এই তো আমরা পৌঁছে গেলাম হস্তকঙ।’ কিন্তু রানা উকি খুঁকি দিয়েও

জানালা পথে বাইরে তাকাবার কোন সুযোগ পেল না, লোকটার মোটা ঘাড় ওর দৃষ্টি পথকে আড়াল করে রেখেছে।

নিজের বেস্ট বেঁধে নিল রানা। দেখাদেখি লোকটাও ক্রান্ত হাতে সারল কাজটা। এই সুযোগে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। জানালার বাইরে নীল সাগর আর সবুজ সবুজ পাহাড়ের মাথা, চিক চিক করছে সূর্যের আলো লেগে। সাগরে কিছু পাল তোলা সাম্পানও ভাসছে।

পাশের আরোহী ব্যাংকক থেকে প্লেনে উঠেছে। প্লেন রানওয়েতে থামতেই নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ‘নিশ্চয়ই পেনিনসুলা হোটেলে উঠছেন আপনি?’

‘না,’ সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

‘কেন? কাউলুন অভ্যন্তর চমৎকার জায়গা—সেরা হোটেল, সেরা মার্কেটিং সেটআপ, আড়ম্বর-জৌনুস সবই তো আছে। ও, আপনি বুকিং ব্যবসায়িক কাজে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

লোকটা একটু বেজার হল বোধহয়, আর কোন প্রশ্ন না করে দর-জার দিকে এগোল। একটু সময় নিল রানা, প্লেন যখন একেবারে খালি হয়ে এসেছে, এই সময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ও।

কাস্টমসের কামেলা মিটেতে তেমন দেরি হল না। এয়ারপোর্টের ভিড়, ব্যস্ততা আর কোলাহলমুখর এলাকায় চলে এল ও। পাশের সীটের আরোহী লোকটাকে দেখা গেল এখানে, একটা হোটেলের মাইক্রোবাসে উঠছে। রানাকে দেখে একগাল হেসে হাত নাড়ল। দশ বার জন রিজ্ঞাওয়ালা ছেঁকে ধরল রানাকে, সবাই একযোগে ডাকছে ওকে, চেহারায় এবং কণ্ঠে রাজ্যের অনুন্নয় বিনয়। কিভাবে

উদ্ধার পাওয়া যায় ভাবছে, এই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান সুবেশী একজন চীনা। লোকটা একটু বেঁটে, চেহারায় মার্জিত ভদ্রতার ছাপ। একটু ঝুঁকে চীনা রীতিতে অভিবাদন করল সে। ‘কিছু যদি মনে না করেন, আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার ট্যাক্সি লাগবে?’

‘ওয়ানচাই যাব,’ বলল রানা। ‘হোটেল কসমোপলিটানে।’

লোকটাকে বেশ একটু অবাক হতে দেখল রানা। ‘ওয়ানচাই? ওটা তো দ্বীপের ওপর,’ বলল সে। ‘তার মানে ট্যাক্সি নিয়ে ফেরীবাটে যেতে হবে আপনাকে। ওখান থেকে যে-কোন মাঝিকে বললেই সে আপনাকে নৌকো করে ওয়ানচাই পৌঁছে দেবে। দ্বীপের ফেরীবাটের উন্টোদিকেই হোটেল কসমোপলিটান।’

‘ধন্যবাদ। ডাইভাররা ইংরেজী বোঝে তো?’

‘কাজ চালাবার মতো বোঝে,’ ইঙ্গিতে একটা ট্যাক্সি ডাইভারকে আসতে বলল লোকটা। প্রায়সাথে সাথে ওদের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ডাইভারকে দেখিয়ে আবার বলল সে, ‘উঠে পড়ুন, এ আপনাকে ফেরীবাটে পৌঁছে দেবে। এক হঙকঙ ডলার ভাড়া।’ হাসল লোকটা। প্রায় সবগুলো দাঁত সোনার। ‘জানেন তো, ছয় হঙকঙ ডলারে এক মার্কিন ডলার?’

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে দ্রুত রানার পাশে চলে এল লোকটা। শাস্ত বিনয়ের সাথে বলল, ‘কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি?’ চোখে মুখে অপ্রতিভ একটা ভাব দেখা গেল। ‘হোটেল কসমোপলিটানে বিদেশী কোন লোক সাধারণত ওঠেন না। হোটেল হিলটন, ইন্টারকন...’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘কিন্তু আমি ঠিক করেছি কসমোপলি-

টানেই উঠব।’

‘ও, আচ্ছা! আশা করি নাকি গলালাম বলে কিছু মনে করেননি,’ পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ‘আমি একজন গাইড। বিদেশী ট্যুরিস্টদের সাহায্য করি। কার্ডে আমার ফোন নম্বর আছে, যদি প্রয়োজন মনে করেন, ডায়াল করলেই চলে আসব আমি...’

কার্ডটা নিল রানা। রিস্টওয়াচের চেইনের তলায় গুঁজে রাখল সেটা। ‘ঠিক আছে।’

আবার খুঁকে অভিবাদন জানাল লোকটা, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ক্ষুণ্ণ হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

উপদ্বীপের নাম কাউলুন, এয়ারপোর্টের নাম কাই তাক, যেখানে নেমেছে ও। প্রণালীর ওপারে হঙকঙ দ্বীপ। ফেরী পার হতে সময় লাগে মিনিট পাঁচেক। ওয়ানচাইয়ে থাকত শক্তিক, সেটা সাগর তীরে হঙকঙের একটা ছোট শহর।

কাউলুনের সাগর তীরে পৌঁছে মানুষের ভিড় দেখে রানার মনে হল, পিপড়ের টিবিতে ঢিল মেরেছে কেউ। শয়ে শয়ে কুলি আড়াই তিন মনের বস্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। সেই আগের মতই, যার যেখান দিয়ে খুলি রাস্তা পেরোচ্ছে, ট্রাফিক সিগন্যাল মানার বালাই নেই। কোন কারণ নেই, তবু গলা চড়িয়ে হৈ-চৈ করছে সবাই। মেলাতেও এক সাথে এত লোক দেখেনি রানা। রাস্তায় মার্কিন মুলুকের তৈরি গাড়ির সংখ্যাই বেশি, পেটমোটা চীনারা বসে আছে ব্যাক সীটে—এরা বোধহয় ব্যবসায়ী। রাস্তার ধারে পাঁচ-সাত টনী ট্রাকগুলো সার সার দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথের হুঁধারে পাশাপাশি অগণতি

দোকান-পাট, সেতুলোর সামনে ভিড়ও প্রচণ্ড। প্রতিটি দোকানের সামনে এবং মাথায় রঙগুণ্ডে চীনা হরকের সাইনবোর্ড। এই অতি ব্যস্ত স্কুটপাথের ওপর শিটে হুঙ্কাণ। শিশু বেঁধে নিয়ে খেলা করছে কিছু চীনা কিশোরী। তাদের পোশাক এবং হাত-পা অত্যন্ত নোংরা। রেস্টোরাঁর ভেতর এত ভিড় যে ভেতরে ঢুকতে না পারে বাইরে দাঁড়িয়েই চীনা নারী-পুরুষ দ্রুত হাত চালিয়ে কাঠি দিয়ে খাবার খাচ্ছে। স্কুটপাথে ইউরোপীয় লোকজনও দেখা গেল। তবে সংখ্যায় তারা খুব কম। ওদের চেয়ে বরং ভারতীয় শিখর সংখ্যায় বেশি। দু'জন বাঙালীকেও দেখল রানা, হাত ধরাধরি করে গানের সুর ভাঁজছে, মেয়েদের নিত্যশ্রের দিকে চোখ।

ফেরীতে উঠে কয়েকটা সুন্দরী চীনা যুবতীকে দেখল রানা। এদের পোশাক-আশাকও বেশ দামী। প্রায় সবাইই হাঁটুর ওপর উঠে আছে স্কাট। হলুদ মাখনের মতো উক্কর বেশ অনেকটা করে দেখা যাচ্ছে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রানা, প্রতিটি চীনা যুবতীর সাথে একজন করে ট্যুরিস্ট আছে। সেই একই নিয়মে চলছে ছুনিয়াটা।

সিগারেট ধরিয়ে ফেরীর এক কোণের একটা সীটে বসল রানা। নিকট অতীতে ফিরে গেল ও।

নির্দিষ্ট তারিখের ক'দিন পর ঢাকা ছাড়তে হয়েছে ওকে। সেই ছোবরা অতিথিই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু ইমপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে সব কথা জানাননি ও ওর ঘরে কেন এসেছিল ছেলেটা এই প্রশ্নের উত্তরও বলেছে, আমি জানি না। কথানি বিশ্বাস করেনি ইমপেক্টর, কিন্তু ডিউক মিথ্যে কথা বলছে এই দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত ওর হৃদয়ও আসাঠেপাঠে পারেনি সে।

সেই রহস্যময় আতিকুল্লাহ খানই যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিল, সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। বুড়ো মীর সাহেব বড় উপকার করেছেন বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে ওর জন্যে স্বল্প আর্থসের একটা বিশেষ লাইসেন্স যোগাড় করে দিয়ে। নিজের টাকায় একটা পুলিশ স্পেশালও কিনে দিয়েছেন তিনি ওকে। আগেই অনুমতি নেয়া ছিল, কাস্টমস খোন ঝামেলা করেনি।

ফেরী থেকে নেমে আরো কয়েকজন ভারতীয় এবং বাংলাদেশী বাঙালী চোখে পড়ল। কিন্তু চারদিকে হাজার হাজার চীনা গিজ গিজ করছে। এত ভিড়, ধাক্কা না দিয়ে পথ চলা অসম্ভব। ওয়ানচাইয়েও সেই এক দৃশ্য। কুলিরা বিরাট বিরাট মোট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক খারে বিভিন্ন তরকারীর উচু পাহাড়, বিক্রেতার সবাই মিলে চেষ্টা-মেচি করছে। তবে সবচেয়ে বিরক্তিকর রিজাওয়ালারা। বিদেশী লোক দখলেই হয়, ছুটে এসে ছেঁকে ধরে।

ফেরীঘাটের ডন্টোদিকে কয়েকটা দোকান, হুটো দোকানের মাঝখানে হোটেল কমমোপলিটানে ঢোকার দরজা। রিজাওয়ালাদের ভিড় থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাস্তা পেরোল রানা সবার একটা প্যাসেঞ্জ পেরিয়ে, সিঁড়ির কঁটা ধাপ টপকে ঢুকে পড়ল হোটেলের লবিতে। রিনেপশন কাউন্টারে বুড়ো এক চীনা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মাথায় পরিচ্ছন্ন সূতী কাপড়ের তৈরি টুপি, গায়ের শার্টটা বোধহয় গত বছরের পর আর সাবান পানির স্পর্শ পায়নি। তার ওপর কাল কোট চাপিয়েছে, অনেক জায়গায় সূতো উঠে গেছে সেটার। শুধু খুতনিতে কিছু দাড়ি আছে, কিন্তু সেগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। বাদামী রঙের চোখ দুটো ঢুকে আছে কোটের, দৃষ্টিতে কোন প্রাণ নেই।

হাতের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। ইংরেজীতে

বলল, 'একটা রুম চাই।'

প্লেন থেকে নেমে পোশাক বদল করার সুযোগ হয়নি রানার, চেহারাটাও তেমন পরিচ্ছন্ন নয়, আর যাই হোক ওকে অসুস্থ ধনী একজন ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে না। রানা অবশ্য সেটা চাইছেও না। বুড়ো চীনা খুঁটিয়ে দেখল ওকে, কিন্তু তার মুখের চেহারায় কোন বিষ্ময় ফুটে উঠল না। রানার সামনে নিঃশব্দে ময়লা একটা খাতা খুলে ধরল সে। নাম, কোথেকে এসেছে ইত্যাদি লিখে দিল রানা। বোর্ড থেকে একটা চাবি নামিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল বুড়ো। যান্ত্রিক পুতুলের মতো হাত পাতল একটা। 'দশ ডলার। কামরা নম্বর সাতাশ।'

দশ ডলার নিয়ে চাবি তুলে নিল রানা। বুড়োর দেখান পথ ধরে একটা সরু প্যাসেজে চলে এল ও। একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন শ্বেতাঙ্গ, পিছনে একটা চীনা কিশোরী। রানাকে দেখে মুখ ভেঙচাল লোকটা, কিন্তু উজ্জল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছবার আগে তিন বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে রানাকে। প্রতিবার মুচকি একটু হাসল। হোটেলটা কি জ্বাভের বুঝতে অসুবিধে হল না রানার।

সাতাশ নম্বর ঘরের দরজা খুলে ভেতর ঢুকল ও। চারকোণা একটা ঘর, দশ ফুট বাই দশ ফুট। বিছানা দুটো। কিন্তু একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। দেয়াল অ'লমিরাও আছে এক কোণে ছোট একটা বেসিন। পাশেই জানালা। জানালার বাইরে পাশের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে, বোধহয় বোন ধোপার বাড়ি ওটা। ছাদে লম্বা করে দড়ি টাঙান, তাতে ব্রেসিয়ার থেকে শুরু করে আঙুরপ্যাঁক পর্যন্ত সব শুকাতো দেয়া হয়েছে। টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে বিছানার ওপর বসল রানা। মনটা খিঁচড়ে উঠতে

চাইছে। এই রকম নাংরা সস্তা হোটেল নোয়েত না ঠেকলে উঠতে চায় না ও, অথচ কর্তব্যের খাতিরে এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। এই হোটেলেরই শফিক তার চীনা স্ত্রী সৃষ্টি কোয়াওকে নিয়ে ছিল।

খানিক বিশ্রাম করে হাত-মুখ ধুয়ে নিল রানা। ব্যাগ খুলে নতুন পোশাক বের করে পরল। খুব বাধহয় ভিড় হয় না হোটেলটায়, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা মহ ট্রাফিকের আওয়াজ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রিস্টোয়ান্ট দেখল ও। পোনে ছটা। রিস্টোয়ান্টের চেইনের তলা থেকে উকি দিচ্ছে সেই বেঁটে সুদর্শন চীনা গাইডের ভিজিটিং কার্ডের কোণ। কার্ডটা বের করল ও, পড়ল। লোকটার নাম ওয়াম পিং হা। নামের নিচে ফোন নম্বর মানিব্যাগের ভেতর কার্ডটা রেখে দিল ও। তারপর বেরিয়ে এল প্যাসেজে।

ঠিক পাশের কামরার দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। চোখ পড়তেই বুঝল রানা, ভারি সুন্দর শরীরের গড়ন। মাথায় একরাশ কাল চুল, বিনুনি করে ফেলে রেখেছে কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর, ডগাটা নাভির নিচে দোল খাচ্ছে। আপন মনে গুন গুন করছিল মেয়েটা, সেই সাথে মেঝেতে পা ঠুকছিল, রানাকে দেখেই ফিক করে হাসল। সারা শরীরে যৌবনের প্রাচুর্য, পরনের খাটো ব্লাউজ আর ছোট নীল স্কার্ট তা ধরে রাখতে পারেনি। কেন যেন মনে হল রানার, মেয়েটা তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে এভাবে।

হাসির উত্তরে রানাও হাসল একটু।

‘হেই, মিস্টার।’ হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। কিন্তু হাসিটায় স্থূল বা কদর্য কিছু নেই, বরং অদ্ভুত এক সারল্যই ফুটে উঠল

তার চেহারায়। ‘আমি ওমপত্ত পিয়া। তুমি ?’

‘ডিউক বলে ডাকে সবাই,’ দরজায় চাবি লাগিয়ে বলল রানা।
‘এখানেই থাক বুঝি ?’

চোরা চোখে দ্রুত আরেকবার রানার বলিষ্ঠ শরীরের গঠনটা দেখে নিল ওমপত্ত পিয়া। ‘ই্যা। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? বিদেশী কেউ তো বড় একটা ওঠে না এখানে।’

‘কতদিন ধরে আছ তুমি ?’

আঙ্গুলের গিট গুণতে শুরু করল মেয়েটা। তারপর বলল, ‘আঠা-রো মাস। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?’

‘এমনি।’ নিগারেট ধরাল রানা। ‘তুমি একাই...’

রানার কথা শেষ হবার আগেই বড় করে মাথা কাত করল ওমপত্ত পিয়া। ‘ই্যা যখন ইচ্ছে ডাকতে পার আমাকে, বিদেশীদের সঙ্গে আমার খুব ভাল লাগে।’

একটু হকচকিয়ে গেল রানা। মেয়েটার চেহারা, পোশাক, শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ ইত্যাদি দেখে ক্ষণাক্ষরেও সন্দেহ হফনি ওর যে একটা কলগার্লের সাথে কথা বলছে ও। ওর মনের কথা মেয়েটাও যেন বুঝতে পারল। ম্লান একটু হাসল সে। কিন্তু কিছুই আর বলল না।

‘ঠিক আছে, মনে থাকবে...’ প্যাসেজ ধরে এগোল রানা।

‘বাইরে যাচ্ছ বুঝি ?’ পিছু নিল মেয়েটা। ‘ও’জনে একসাথে বেরুলে হত না ? আমার ঘরে একটু বসে, তারপর ?’

‘না,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা। ‘এখন নয়।’

‘তবে রাতে ?’

মেয়েটাকে ভদ্র ভেবেছিল বলে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করল রানার। থামল না ও। বলল, ‘দেখা যাবে।’

পিছন থেকে রানার হাত টেনে ধরল ওমপঙ পিয়া। 'দাঁড়াও। দেখা যাবে কথার মানেটা কি? হয় বল আসব, না হয় বল আসব না। ঝুলিয়ে রাখতে চাও কেন?'

'আসব না। বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে প্যাসেজ ধরে লবিতে চলে এল রানা। বুড়ো রিসেপশনিষ্ট চোখ বুঁজে ঝিমাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপ কঁটা বেয়ে নিচে নেমে এল ও, সেখান থেকে প্যাসেজ ধরে রাস্তায়। রিজ্ঞাওয়ালারা ছেকে ধরার আগেই লাফ দিয়ে সামনেরটায় উঠে বসল ও, বলল, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

তিন মিনিট পর বিরাট একটা ফটকের ভেতর ঢুকল রিজ্ঞা। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একজন সেকিউর সাহায্য নিল রানা। সে ওকে একজন সার্জেন্টের কাছে নিয়ে গেল। সার্জেন্ট লোকটা ব্রিটিশ, কাজেই কি কাজে এসেছে বুঝিয়ে বলতে কোন অসুবিধে হল না রানার। সার্জেন্ট ওকে একটা ছোট কিন্তু স্থলর ভাবে সাধান কামরায় নিয়ে এল। চীফ ইন্সপেক্টর স্কটল্যান্ডের লোক, বয়সে বুড়ো হলেও শরীরটা এখনও মজবুত আছে। চুল, দাড়ি, চওড়া মিলিটারী গৌফ সব ধবধবে সাদা। চেহারায় কোন ভাবের প্রকাশ ঘটল না, কিন্তু একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল রানাকে। নিজের পরিচয় দিল রানা। হঠকড়ে আসার উদ্দেশ্য কি তাও বলল। সব শুনে বেশ একটু আশ্চর্য হল চীফ অফিসার। নিজের পরিচয় দিল রানাকে। নাম, স্টুয়ার্ট জ্যাসন।

'মীর শফিকুর রহমান?' চেয়ারে হেলান দিয়ে টোবাকো পাইপটা তুলে নিল জ্যাসন। তাতে তাহাৎ ভরতে ভরতে বলল, 'লোকটা আপনার কে হয় বলুন তো? দিন কয়েক আগে ঢাকা থেকে ওর সম্পর্কে খোজ-খবর চাওয়া হয়েছিল। সেটার উত্তর তো আমি নিজেই দিয়েছি।

তারপরও আপনি হওকঙে ছুটে এলেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো ?’

‘আমি ওর বাবার প্রতিনিধিত্ব করছি,’ বলল রানা। ‘তিনি ছেলের মৃত্যু এবং আত্মঘাতিক কিছু ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা পেতে চান। ছেলের বউটা খুন হওয়ায় তিনি খুব আঘাত পেয়েছেন, এবং তাঁর ধারণা, এই খুনের কিনারা করতে হলে হওকঙে তদন্ত চালাতে হবে। দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারেন ?’

‘ভিজে রাস্তা, আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল,’ কাঁধ ঝাকাল চীফ ইন্সপেক্টর। ‘আমরা যখন দেখতে পেলাম, আর কিছু করার ছিল না। লাশটা গঁথে গিয়েছিল গাড়ির ভেতর। আগুনও ধরে গিয়েছিল গাড়িতে।’

‘আর কেউ ছিল না গাড়িতে ?’

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। ‘বোধহয় ছিল না, তবে জোর করে কিছু বলা মুশকিল। কাউলুন থেকে পাঁচ মাইল দূরে, নিউ টেরিটোরিতে দুর্ঘটনাটা ঘটে—তার মানে, ঠিক কোথায় যাচ্ছিল বলা কঠিন, ওই রাস্তা দিয়ে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়।’

‘লাশ সনাক্ত করেছিল কে ?’

চোখ নামিয়ে খোলা একটা ফাইলের দিকে তাকাল জ্যাসন। কাজের লোক সে, সেটাই বোধহয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাতে চাইল রানাকে। ‘ওর ওয়াইফ।’

‘শফিক এখানে কি করতে বলতে পারেন ?’

‘স্থানীয় লোকদের নিয়েই হিমশিম খেয়ে যাই আমরা, বিদেশীদের ওপর নজর রাখার সময় কোথায় ? চাকরি-বাকরি করতে যারা আসে তাদের মধ্যে কেউ যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করে, আমরা তার ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর রাখি না।’

‘ওর জী সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন ?’

পাইপট। মুখ থেকে নামিয়ে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। ‘কল-গার্ল ছিল। রিকিউজি সব মেয়েই তো এই পথে নেমে পড়ে। ওদের সম্পর্কেও আমরা বড় একটা খোঁজ-খবর রাখি না।’

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘বেশ আরামে আছেন আপনারা। কোন ব্যাপারেই দেখছি কোন খবর রাখতে হয় না।’

‘আহা, আপনি রাগ করছেন কেন।’ রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল চীফ ইন্সপেক্টর। ‘ওহুন, মিঃ ডিউক, স্লীজ।’ কিন্তু রানা পিছন ফিরে তাকাল না একবারও।

বাইরে বেরিয়ে এসে কুইনস রোডে প্রস্তুত ভিড় দেখল রানা। নিরিবিলা কোথাও বস। দরকার, কিভাবে কাজ শুরু করবে ভেবে-চিন্তে পথ বের করতে হবে একটা। একবার মনে হল, কাজীর অফিসে গেলে হয়ত কিছু জানা যাবে। কিন্তু এই সন্ধ্যায় কি আর সেটা খোঁজা আছে। ওয়ানচাইয়ের সাগর-সৈকতটা বিশাল, গোটা এলাকা জুড়ে রঙচঙে নিওন সাইন আর হাজার হাজার দোকান-পাট। এক ধারে কয়েকটা বার অ্যাণ্ড রেস্টোরান্ট দেখে গলাটা শুকনো শুকনো লাগল রানার। বাইরে থেকে প্রায় ফাঁকা দেখে ঢুকে পড়ল একটার ভিতর। ক্যাসেটে মুহূর্মিউজিক বাজছে। এক কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল ও। কামরার আরেক প্রান্তে চার জন মার্কিন খালাসী, ছ’জন শিখ আর ছয় সাত জন চীনা হাসাহাসি করছে। রানার টেবিলের কাছাকাছি বসেছে ছ’জন নাটসনুহস মাদ-বয়েসী চীনা। নিচু গলায় সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করছে তারা। কামরার একেবারে পিছন দিকে ছোট একটা জটলা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা চীনা মেয়ে, নাকি স্ত্রীর কথা বলছে সবাই, কেউ কেউ বিনা নোটিসে

তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠছে। ওয়েটারকে ডেকে স্বয়ং আর কোক দিতে বলল রানা। প্রায় সাথে সাথে টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল লোকটা। সে চলে যেতেই আরেকজন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকাল রানা, দেখল, মাঝ-বয়েসী এক চীনা মহিলা। এক কালে খুব সুন্দরী ছিল, হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পরনে সবুজ রঙের স্কার্ট। চেহারায় বুদ্ধিমত্তা এবং আভিজাত্যের ছাপ।

‘গুড ইভনিং,’ মুক্তোর মত সাদা দাঁত দেখা গেল মহিলার।

কিছু একটা বলি দরকার, তাই বলল রানা, ‘গুড ইভনিং। আপনি...?’

‘বসতে পারি?’ রানার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে অনুমতি চাইল মহিলা, কিন্তু রানার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

একটু কৌতুক বোধ করল রানা। ‘বলুন আপনার জন্যে কি আনাব?’ ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডাকল ও। কিন্তু ওয়েটার একটা হাত তুলে ক্ষান্ত হবার পান্টা ইঙ্গিত করল ওকে। মহিলার জন্যে কি আনতে হবে তা সম্ভবত জানা আছে তার। রানার অনুমানটাই ঠিক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল ওয়েটার।

‘শুধু দুধ? আর কিছু?’

‘না, ধন্যবাদ,’ বলল মহিলা। ‘আমি দুধ ছাড়া আর কিছু খাই না। আপনি কি হিলটনে উঠেছেন?’

‘না,’ এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর আর কি দেবে ভেবেপেলনা রানা।

‘আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকলেই চলবে,’ দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল মহিলা। ‘আমি ট্যুরিস্টদের, বিশেষ করে এশীয় ট্যুরিস্টদের উপকারী বন্ধু। ওদের বান্ধবী দরকার হলে, বা শ্রেয় সঙ্গ

পাবার জন্যে কোন মেয়েকে দরকার হলে আমাকে ধরে, আমিও ওদেরকে সানন্দে সাহায্য করি। আপনার যদি তেমন কিছু দরকার হয়, আমাকে বলবেন, সব ব্যবস্থা করে দেব আমি। এদিকে সব মেয়ে আমার কথা শোনে

স্কচের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।' পরমুহূর্তে অন্য খাতে বইতে শুরু করল রানার চিন্তা। হোটেল কসমোপলিটান এখান থেকে মাত্র কয়েক শো গজ দূরে। এই মেয়েলোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকার কলগার্লদের নিয়ন্ত্রণ করে সে। সুজি কোয়াওকে যদি চেনে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই তাতে। 'আচ্ছা,' জানতে চাইল রানা, 'একটা মেয়ের খোঁজ দিতে পার ? আমার বন্ধু দেশে ফিরে খুব নাম করেছিল মেয়েটার। বলেছিল, যদি কখন হওকও যাও, তো এই মেয়েটার সন্ধান করো—তার সান্নিধ্য নাকি ভুলবার নয়। মেয়েটার নাম সুজি কোয়াও। চেন নাকি ?'

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল বলেই ম্যাডামের মুখে বিস্ময়ের ক্ষীণ ছাপটা দেখতে পেল রানা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ম্যাডাম। মুখ টিপে সুন্দর করে হাসল। 'চিনব না মানে ? আমার হাতে যত মেয়ে আছে তাদের মধ্যে সুজি কোয়াওই তো সবচেয়ে সুন্দরী। হ্যাঁ, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে। টেলিফোন করে ডাকব নাকি ?'

চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাবটা এবার গোপন করার পালা রানার। খুব যেন খুশি হয়েছে এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বলল ও, 'ডাক।'

দুধের গ্লাসে শেষচুমুক দিয়ে ম্যাডাম বলল, 'ধাকে বলে বাজারের মেয়ে, সুজি কোয়াও কিন্তু ঠিক তা নয়। মা-বাবার সাথে থাকে ও,

কসমেটিকস আর সিনেমা থিয়েটারের জন্যে কিছু পয়সা দরকার, তাই এ-পথে নেমেছে। তার মানে, আপনি ওর বাড়িতে যেতে পারবেন না। কোন হোটেলে নিয়ে যেতে হবে ওকে। হোটেলের ভাড়া যা হয় দেবেন, আর ওকে দিতে হবে ত্রিশ ডলার। আর আমাকে মাত্র তিন ডলার মিলেই চলবে।’

‘দেব,’ বলল রানা। ‘কিন্তু এই মেয়েটিই যে সুজি কোয়াও, বুঝব কিভাবে?’

‘সে কি!’ এতখানার আহত এর নিশ্চয়ই দেখাল ম্যাডামকে। ‘আমি আপনার সাথে চিটিংবাজি করতে যাব কেন? মেয়েটা সুজি কোয়াও ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে কেন?’

‘নিচু মনে কর না, আমি রসিকতা করছিলাম

টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ম্যাডাম। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ফোন করল কে'থাও। রানা দেখল, মার্কিন খালাসীরা ঘিরে ধরেছে ম্যাডামকে। একজন তার কাঁধে হাত রেখে মাথা তুলিয়ে গানও জু'ড় দিয়েছে। রানার দিকে ফিরে এক ফাঁকে একটা চ'খ টিপল লোকটা। ঘেন বসতে চায়, আমরা সাইট একই পথের নথিক উত্তরে মুচকি একটু হাসল রানাও। ফোন করা শেষ হাল খালাসীদের সাথে কথা বলল ম্যাডাম। বে'ঝা গেল, ওদের ২.৫০ একটা ব্যবসা হল তার। আরেকটা ফোন করল সে। তারপর ফিরে এল রানার টেবিলে।

বলল, ‘সুজিকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। এখন আসছে ও।’ একটা সিগারেট ধরাল ম্যাডাম, আবার উঠে দাঁড়াল, বলল, ‘সোজা আপনার টেবিলেই আসবে ও। আমাকে আর আপনার দরকার হবে না।’ চলে গেল সে, মার্কিন খালাসীদের টেবিল গিয়ে বসল।

ঠিক দশ মিনিট পর রেস্তোরাঁর ভেতর একটা চীনা মেয়ে ঢুকল। চীনা মেয়েরা সাধারণত বেঁটে হয়, কিন্তু এ মেয়েটা বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য-টাও চমৎকার। পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ, দুটোই কাল ভোরা কাটা। কোনে আগেই টেবিলের নাম্বার জেনে নিয়েছে, সোজা রানার দিকে এগিয়ে এল সে। মুখে মিষ্টি হাসি টেনে রানার সামনের চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল। ‘হেই মিস্টার, আমি সুজি কোয়াও।’ ইংরেজী উচ্চারণটা বেশ ভালই। ‘তুমি?’

‘ডিউক’ বলল রানা। ‘সুজি কোয়াও...তারপর?’

অপ্রতিভ দেখাল মেয়েটাকে। দ্রুত টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে খুলল সেটা, সিগারেট ধরাল, তারপর একমুখ ধোঁয়ার আঁড়ালে মুখ লুকিয়ে বলল, ‘তারপর মানে?’

‘সুজি কোয়াও ওয়াং চিনয়?’

‘বাহ্..’ চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল মেয়েটার। ‘তুমি জানলে কিভাবে?’

‘আমার এক বন্ধু গত বছর এখানে এসেছিল,’ মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু এখুনি সেটা প্রমাণ করতে চাইছে না রানা। ‘সে তোমার খুব প্রশংসা কবেছে আমার কাছে।’

হাত বাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে ঠোঁটের লিপ-লিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিল মেয়েটা, তারপর বলল, ‘বেশি রাত করে ফিগলে বাবা বকাঝকা করবেন। চল, আমরা কোন ভাল হোটেলে গিয়ে উঠি।’ আয়নাটা বাগে ভরে রেখে রানার চোখে সরাসরি তাকাল, বলল, ‘তার আগে বল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?’

‘হয়েছে..’

রানাকে কথাটা শেষ করতে দিল না মেয়েটা, তার আগেই ওর সামনে একটা হাত পাতল। ‘ম্যাডামের পাওনাটা—তিন ডলার।’

মানিব্যাগ বের করার জন্যে পকেটে শুধু হাত ভরেছে রানা, দমকা বাতাসের মতো কাছে চলে এল ম্যাডাম। রানার হাত থেকে ডলার তিনটে নিয়েই হাতব্যাগে ভরে ফেলল, বলল, ‘সুজি আপনাকে খুশি করবে। আবার যখন দরকার হবে, এখানেই খোজ করবেন আমার।’ হন হন করে চলে গেল সে আবার।

রানার হাত ধরে রেস্তোরার^১ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। রিস্তার ওঠার আগে সামান্য একটু মন কষাকষি হল ওদের মধ্যে। ভাল কোন হোটেলে উঠতে চায় মেয়েটা, কিন্তু রানা নিজের কথায় অটল থাকল—রিস্তাওয়ালা সোজা হোটেল কসমোপলিটানে নিয়ে এল ওদেরকে।

হোটেলে ঢুকল ওরা হাত ধরাধরি করে। কাউন্টারে সেই আগের মতোই চোখ বুঁজে ঝিমোচ্ছে বৃড়োলোকটা। পায়ের আওয়াজ শুনে একটা চোখ খুলল সে। রানার সাথে মেয়েটাকে দেখে একটা ভুরু উঠে গেল কপালের মাঝখানে, তারপর চোখটা বন্ধ করল। লবি থেকে প্যাসেজে চলে এল ওরা। রানা দেখল পাশের ঘরের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে নখে নেইল-পালিশ লাগাচ্ছে ওমপঙ পিয়া। চোখাচোখি হতে অবজ্ঞার হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। কিন্তু মিষ্টি চেহারায় হাসিটা ঠিক মানাল না। তালী খুলে নিজের কামরায় ঢুকল রানা, মেয়েটা ভেতরে ঢুকতে কবাট বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বিছানার ওপর পড়ল মেয়েটা। পা দুটো আকাশের দিকে তুলল। স্কাটটা সরে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল হলুদ রঙের উরু। পা নামিয়ে মেঝেতে দাঁড়াল সে। ব্রাউজের চেইন ধরে

টান দিল, ভেতরে দেখা গেল সাদা ত্রেসিয়ার। ‘আমাকে যদি ত্রিশ ডলারের বদলে পঞ্চাশ ডলার দাও, দশজন মেয়ে যে আনন্দ দিতে পারেনা আমি একাই তোমাকে তার চেয়ে বেশি আনন্দ দেব। রাজি?’ পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করল রানা।

এক এক করে পোশাক খুলতে শুরু করল মেয়েটা। রানা পঞ্চাশ ডলার দিতে রাজি হয়েছে ধরে নিয়ে ত্রঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার, আরো বেশি চাইলে তাও পাওয়া যেত ভেবে। মানি ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে সুজি কোয়াও-র ফটোটো বের করে মেয়েটার সামনে ধরল রানা। ‘সুজি কোয়াও-র ফটো এটা।’

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। ক্যাকাশে হয়ে গেছে মুখের চেহারা। কথা বলল না। ধীরে সুস্থে এক এক করে পরে নিল আবার পোশাকগুলো। তারপর বলল, ‘তোমার কাছে ওর ছবি আছে, তা আমি জানব কিভাবে? ম্যাডাম তো বলল, ওকে তুমি কখনও দেখনি, চেন না...’

‘ফটোর এই মেয়েটাকে চেন তুমি?’

‘না। কিন্তু আমি কি ওর চেয়ে সুন্দরী নই?’ অভিমানের সুরে বলল মেয়েটা। ‘আমি কি তোমাকে আনন্দ দিতে পারি না?’ রানা বোঝাবার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ বাধা দিল সে, বলল, ‘আমাকে নিশ্চয়ই খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না?’

মানি ব্যাগ থেকে ত্রিশটা ডলার বের করে মেয়েটার বাড়ান হাতে ধরিয়ে দিল রানা। ‘একটা বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করেছিল সুজি কোয়াও। ছেলেটার নাম ছিল মীর শফিকুর রহমান। কখনও দেখেছ তাকে, কিংবা নামটা শুনেছ?’ শফিকুর ছবিটাও বের করল এবার রানা।

ছুটো কটোই এবার ভাল করে দেখল মেয়েটা। ‘মেয়েটার ছবি এমন কেন ? কেমন যেন মরা মরা লাগছে।’

‘হ্যাঁ, ওটা তার লাশের ছবি।’

আতকে উঠে হাত থেকে ফটোটা ফেল দিল মেয়েটা। ‘ইস। সর্বনাশ হয়ে গেল। মরা মানুষের কটো দেখলে দিনটা খারাপ যায়।’ রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে। ‘না, ওদের কাউকে কখনও দেখিনি আমি।’ দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

সময় এবং টাকা, ছটোই নষ্ট হল, ভাবল রানা। সুজি কোয়াও-র খবর সংগ্রহ করার জন্যে অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হবে ওকে।

আধ ঘণ্টা পর সাশার খাবে বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজার তাল লাগাল রানা। পাশের কামরার দরজা খোলা, কিন্তু প্যাসেজে কোথাও ওমপঙ পিয়াকে দেখল না ও। কিন্তু তার কামরার ভেতর চোখ পড়তেই দেখল, দরজার দিকে পিছন ফিরে অত্যন্ত অস্থিভাবে কাকে খেন কি বোঝাচ্ছে সে। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে, হাত ছুঁড়ছে, কখনও পিছিয়ে আসছে, কখনও সরে যাচ্ছে এক পাশে। ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে ভাল করে তাকাল রানা। চীনা ভাষায় অনর্গল বক বক করছে পিয়া, এত দ্রুত কথা বলছে যে একটা শব্দও ধরতে পারল না ও। এই সময় হঠাৎ অসহায় ভক্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল পিয়া, ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। এতক্ষণে পিয়ার সামনের দিকটা চোখে পড়ল রানার, এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টেবিলের ওপর বড় সড় একটা চীনা পুতুল বসে আছে। কোন বিরতি নেই, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে

সে। এতক্ষণ এর সাথেই ঝগড়া করছিল পিয়া। খুব বেশি বয়স নয় মেয়েটার, তাছাড়া চেহারার অদ্ভুত সারল্যের সাথে এই পুতুল নিয়ে খেলাটা বেশ মানিয়ে যায়, অস্তুত রানার তাই মনে হল। খুক করে কাশল ও।

চমকে ঘাড় ফেরাল ওমপঙ পিয়া। রানাকে দেখে গম্ভীর করে ডুলল চেহারা। ‘কি চাই?’

‘আমার কিছু তথ্য দরকার,’ বলল রানা। ‘চল না, কোথাও থেকে ডিনার খেয়ে যানি?’

কি যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে ধামল রানার সামনে ‘মেয়েটা এসেই চলে গেল কেন? ধরে বনেনি, নাকি অন্য কিছু? তাছাড়া, পাশের কামরায় আমি থাকতে ওকে তুমি আনলে কেন? আমি কি ওর চেয়ে কম স্নন্দরী?’

‘ওর সাথে একটা কাজ ছিল,’ বলল রানা। ‘আমার সাথে বেরবে নাকি?’

ঘাড় ফিরিয়ে পুতুলটার দিকে তাকাল পিয়া। এখন আর পুতুলটা নেতিবাচক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথানাড়ছে না, ওপর নিচে মাথা দোলাচ্ছে। রানার দিকে ফিরে ফিক ফিক করে হেসে ফেলল পিয়া। ‘আমার সখী যখন অসুস্থতি দিচ্ছে, তখন যাওয়া যেতে পারে। দাঁড়াও, আমার তৈরি হতে এক মিনিটও লাগবে না।’

উজ্জল লাল আর সোনালী রঙের শার্ট, নিচে গাঢ় হলুদ রঙের জার্ট পরে প্যাসেঞ্জে বেরিয়ে এল ওমপঙ পিয়া। খোঁপা করে বেঁধেছে চুলগুলো, তাতে আবার একটা কুলের রিঙ গুঁজে নিয়েছে। আশ্চর্য স্নন্দর লাগছে দেখতে। রানার হাত ধরে বলল, ‘তোমাকে খুব ভাল একটা রেস্টোরায় নিয়ে যাব আমি। ওখানের খাবারটা সাংঘাতিক

ভাল, অথচ ভোমার খুব বেশি পরস্রা খরচ হবে না।’

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। পিয়া বলল, ‘ফেরী পার হয়ে কাউলুনে যাব আমরা, রেস্টোরাঁটা ওপারে।’

অনর্গল কথা বলতে পারে পিয়া, মুখ ব্যাখা করে না। কিন্তু রানার সম্পর্কে তার তেমন কোন কৌতূহল দেখা গেল না। সারাক্ষণ শুধু নিজের গল্পই করে গেল। ওর প্রতিটি সমস্যাই খুব হাস্যকর, কিন্তু হাসলে রেগে ওঠে। বেশির ভাগ সমস্যাই স্বামীকে নিয়ে, মানে সেই যান্ত্রিক পুতুলটাকে নিয়ে। খুব জরুরী কোন কাজে হাত বেরুতে যাচ্ছে পিয়া, চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে দেখা গেল, যা আশা করা গিয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা করেছে সে, মানে, এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বাইরে বেরুতে নিষেধ করছে পিয়াকে। তাছাড়া, ছোট ভাইটির সাথে চিঠির মাধ্যমে কিভাবে পুরো দস্তর ঝগড়া-ঝাটি চালিয়ে যাচ্ছে তারও বিস্তারিত বর্ণনা দিল পিয়া। ফেরী থেকে নেমে রানাকে বলল, ‘নাথান রোড ধরে রেস্টোরাঁ পর্যন্ত চল আমরা হেঁটেই যাই।’

নাথান রোডে হাঁটার সুযোগ পেয়ে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল রানার। সংখ্যায় এত বেশি আর এত বিচিত্র ধরনের নিওন সাইন ছনিয়ার আর কোথাও দেখেনি ও। সেই সাথে যানবাহন আর মানুষের ভিড়। আধ মাইল হাঁটতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল ওদের। অবশেষে পিয়ার প্রিয় রেস্টোরাঁয় পৌঁছল ওরা।

ভেতরে ঢুকতেই ভারি একটা গমগমে আওয়াজ ঢুবেল কানে। সেই সাথে প্লেটের সাথে চামচের, গ্রাসের সাথে গ্রাসের টুং টাং শব্দ। অথচ কাউটারে বসে থাকা একজন কেরানী আর একজন রিসেপশনি-স্টকে ছাড়া কাউকে দেখতে পেল না রানা। মাঝখানে সরু পাসেজ, দু’ধারে ছোট ছোট কেবিন। প্রাইভেসির এই ব্যবস্থা দেখে খুশি হল

ও। ওদের সামনে একজন ওয়েটার এসে দাঁড়াল। পথ দেখিয়ে খালি একটা কেবিনের সামনে নিয়ে এল ওদেরকে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

‘কি খাবে?’ জ্ঞানতে চাইল রানা।

‘হ্যাঁ, আমিই অর্ডার দেব, পাড়াও একটু ভেবে নিই...’ কয়েক সেকেন্ড পর ওয়েটারের দিকে তাকাল ও, বলল, ‘প্রথমে ভাজা চিংড়ি দাও। তারপর একটা সুপ। বেগার চিকেনটা খুব ভাল হয় তোমা-দের এখানে। ওটা দাও। আপাতত এই দাও, খেতে খেতে ভাবব আর কি খাওয়া যায়।’

ওয়েটারের দিকে যেতে নড়েচড়ে আরাম করে বসল ওমপত্ত পিয়া। শাটের গলার ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঠিকঠাক করে নিল ব্রেসি-ফারট, রানার সাথে চোখ রেখে হাসল মিষ্টি করে। ‘সেই থেকে অনেক বক বক করোছ। এবার তোমার কথা বল আমাকে। তুমি ইত্তিহান?’

‘বাংলাদেশী,’ বলল রানা। ‘কতদিন ধরে আছ তুমি এখানে—মানে কাউলুনে?’

‘বছর তিনেক তো হবেই। ক্যান্টন থেকে রিফিউজি হয়ে এসেছিলাম আমরা। প্রথমে ম্যাংকাও, তারপর হঙকঙ।’ হঠাৎ প্রশঙ্গ বল করল পিয়া। ‘তুমি বিয়ে করেছ?’

‘না।’

এই সময় চীনা মদ নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। নিজের গ্রাসে চুমুক দিয়ে রানা বুঝল, শুধু উক নয়, মদটা সাংঘাতিক কড়া। আড়চোখে পিয়ার দিকে তাকাল ও। ঢক ঢক করে শেষ করে ফেলল নিজের গ্রাসটা, মুখের কোথাও এফটা রেখাও পড়ল না। মুহূর্তে গলার বলল

রানা, 'সুজি কোয়াও । সে-ও তোমার মতো একজন রিকিউজি ।
চেন ?'

'সুজি কোয়াও ? তার কথা তুমি জানলে কিভাবে ? এর আগে
হঠকণ্ঠে এসেই নাকি ?' অথাক হয়েছে পিয়া । 'চিনি বৈকি । কেন
বল তো ?'

বড় একটা প্লেটে সোনালী রঙের একগাদা বড় সাইজের চিংড়ি
নিয়ে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার । প্লেটের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল
পিয়া । কাঠি নিয়ে গাঁথল একটা চিংড়ি, সেটাকে ভিজিয়ে নিল সসে ।
তারপর গোটাটা পুরে দিল মুখের ভেতর ।

'আমার দেশী এক ছেলের সাথে সুজির বিয়ে হয়েছিল,' বলল
রানা । পিয়ার দেখাদেখি কাঠি দিয়ে চিংড়ি গাঁথতে গিয়ে টেবিল
ক্লেথের ওপর কেলে দিল একটা মাছ । খিল খিল করে হেসে উঠল
পিয়া । অপ্রতিভভাবে একটু হাসল ও । আবার কাঠি দিয়ে মাছটা
তুলতে যাবে, ওর কজ্জি চেপে ধরল পিয়া । তারপর ডান হাতের
ছ'আঙ্গুল দিয়ে মাছটা তুলে নিয়ে রানার মুখের সামনে ধরল । মুখ
খুলল রানা, ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সেটা পিয়া । মাছ চিবাতে চিবাতে
জানতে চাইল রানা, 'ছেলেটার নাম মীর শফিকুর রহমান তাকেও
কি চিনতে ? দেখেছ কখনও ?'

কাঠি দিয়ে টপাটপ মুখে মাছ ভরছে পিয়া । ফোলা গাল নেড়ে
বলল, 'ক্যান্টন থেকে আমি আর সুজি কোয়াও তো এক সাথেই
পালিয়ে আসি । ই্যা,' বড় করে ঘাড় কাত করল সে । 'ওর স্বামীকেও
আমি দেখেছি । কিন্তু সুজির কপালে সুখ নেই । বেচারী এই বয়সে
বিধবা হয়ে গেল ।'

ফ্রায়েড রাইস এল—ভাজা ডিম, গরুর মাংসের হুকরো, ভাজা

টিংড়ি ইত্যাদি মেশান, এমন সুগন্ধ ছুটল যে জ্বিলে পানি এসে গেল রানার। কিন্তু ফ্রায়েড রাইস কাঠি দিয়ে মুখে পুরতে গিয়ে টেবিলের ওপর সেগুলো শুধু ছড়ালই ও, মুখে তুলতে পারল না। আবার হেসে উঠল পিয়া।

বলল, ‘তুমি তো শুধু শুধু কসরৎ করছ। দরকার নেই কাঠি, হাত দিয়ে, না হয় চামচ দিয়ে খাও।’

‘সুজিকে নিয়ে শফিক কি এই হোটেলেরই থাকত?’ অগত্যা চামচ ব্যবহার করছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল পিয়া। ‘হ্যাঁ। আমার ডান পাশের কামরায়। মাস তিনেক ছিল শফিক, তারপর তো সে চলে যায়।’

‘চলে যায়? কোথায়?’

সুপ নিয়ে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার। সে বেরিয়ে যেতে পিয়া বলল, ‘শফিক তো সুজিকে বিয়ে করেছিল অভাবে পড়ে, ওর রোজগারে ভাগ বসাবার জন্যে। নিজে যখন আয়ের ভাল রাস্তা করতে পারল, সুজিকে তখন আর দরকার ছিল না ওর।’

‘ও। সুজি বুঝি ভাল রোজগার করত? কি করত সে?’

‘কি আবার! আমার মতোই পুরুষদের মনোরঞ্জনের স্বাধীন ব্যবসা করত।’ চাপা কোভ প্রকাশ পেল গলার মূরে।

কেবিনের বাইরে, পর্দার ফাঁক দিয়ে, ওয়েটারকে দেখতে পেল রানা, হাতে একটা মাছুর। ভেতরে ঢুকে খুব ঘটা করে টেবিলের পাশে, মেঝের ওপর বিছাল সেটা। এবার কেবিনে ঢুকল কিশোর একটা চীনা ছেলে। হাতে বিরাট একটা পাত্র, তাতে প্রকাণ্ড উটপাখির ডিমের মতো কি যেন রয়েছে।

আনন্দে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওমপঙ পিয়া,

রানাকে জ্ঞানদান শুরু করে দিল, ‘প্রথমে নানা রকম মশলা মাথিরে পদ্মপাতা দিয়ে জুড়ান হয় মুরগীটাকে। তারপর সেটার চারদিকে মাটি লেপা হয়। মাটির মোড়কটাকে একটানা পাঁচ ঘণ্টা ধরে আগুনে পোড়ান হয়। হাত দিয়ে দেখ না, আগুনে পুড়ে কেমন শক্ত পাথর হয়ে গেছে মাটির আবরণ।’

এতক্ষণে বৃকল রানা, ওটা ডিম নয়, মুরগী। হাতুড়ি দিয়ে কয়েকটা বাড়ি দিয়ে শক্ত মাটির আবরণ ভাঙল কিশোর ছেলেটা। ভেতর থেকে এবার যা বেরুল তার যেমন সুগন্ধ তেমনি চোখ জুড়ান রঙ। এ জিনিস যে সুস্বাদু হবে তাতে আর সন্দেহ কি। পদ্ম পাতার আবরণ সরিয়ে ওয়েটারের হাতে ধরা পাত্রে মাংসটা রাখল কিশোর। মুরগীটা চমৎকার তৈরি হয়েছে, পাত্রে রাখা মাত্র হাড় থেকে খসে পড়ল মাংস। অত্যন্ত যত্নের সাথে চামচ দিয়ে ওদের হুঁজনের প্লেটে মাংস তুলে দিল ওয়েটার।

আবার আলোর বলকানির মতো হয়ে উঠল পিয়ার হাতে কাঠি-গুলো, কোন বিরতি ছাড়া গোত্রাসে খাচ্ছে সে। তারপর রানাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়ে হাসল একটু। বলল, ‘এর নাম বেগার চিকেন। কেমন লাগছে বলছ না যে?’

সত্যি কথাটাই বলল রানা, ‘চমৎকার। এত ভাল মাংস আর কোথাও খাইনি।’

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, ‘এবার?’

কজ্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখে পিরা বলল, ‘আই বাপ। দশটা। চল, হোটেলে ফিরে যাই।’ রানার চোখে চোখ রেখে ফিক করে হাসল সে। ‘এই রকম ভাল খাওয়া দাওয়ার পর তোমার সাথে শুভে আমার

ভালই লাগবে।’

‘দশটা আবার রাত নাকি?’ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা।
‘সারাতা রাতই তো পড়ে রয়েছে আমাদের সামনে। তুমি বরং সুজি
আর শফিকের গল্প শোনাও। তুমি তখন বললে, বিয়ের তিন মাস
পর রোজগার শুরু করে শফিক। কি করত সে?’

চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন কুটে উঠলেও শান্ত ভাবে বলল
পিয়া, ‘তা আমাকে কোনদিন বলেনি সুজি।’

‘চলে গেল মানে কি? একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল
ওদের...?’

‘না। মাঝে মাঝে ফিরে আসতেও দেখেছি। রাত কাটিয়ে
আবার চলে যেত।’ মুখের চেহারায় ঘৃণা কুটে উঠল পিয়ার। ‘তোমার
দেশী লোক ছিল শফিক, কিছু মনে কর না, আসলে লোকটা ছিল
একটা চিঠুর পণ্ডা।’

‘কেন?’

‘সুজিকে কোন টাকা-পয়সা দিত না। বিয়ের পরও সুজিকে
পর-পুরুষের কাছে গিয়ে টাকা রেজগার করতে হত।’

‘সুজিকে ছেড়ে কোথায় উঠেছিল শফিক?’

‘সত্যি মিথ্যে জানি না, সুজিই একদিন আমাকে বলেছিল,
রিপালস উপদ্বীপের তীরে কোন এক চীনা জুয়াড়ীর একটা বাড়ি
ভাড়া করেছিল শফিক। বাড়িটা আমি চিনি—খুব সুন্দর, হৃদয়ের
মতো সাদা। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ সাগরে নেমে গেছে। সুন্দর একটা
শান বাধান ঘাট, ঘাটে ঝকঝকে একটা বোটও দেখেছিলাম...’

‘ওখানে কখনও গিয়েছিল সুজি?’

‘না। শফিক তাকে নিয়ে যায়নি, বা যেতেও বলেনি।’

বিল নিয়ে এল ওয়েটার। খাবারের মান এবং পরিমাণের তুল-
নার অন্য রেস্টোরার'র চেয়ে দাম এখানে খুব কম। বিল মিটিয়ে দিল
রানা।

‘টাকা খরচ হল বলে মন খারাপ করনি তো?’ হঠাৎ উদ্বেগের
সাথে জ্ঞানতে চাইল পিয়া।

‘আরে না।’

খুশি হয়ে উঠল পিয়া। ‘চল তাহলে, হোটেলে ফিরে তুমি এবার
আদর করবে আমাকে, কেমন?’

মনে মনে ভাবল রানা, হঠকাত্তর নিয়মই দেখছি এই। কিছু
চাওয়ার আগেই মেয়েগুলো সব নিয়ে বসে থাকতে চায়। কি ভেবে
সায় দিল ও. পিয়াকে নিয়ে বসিয়ে এল রেস্টোরার'। থেকে।

নাথান রোডে আগের মতোই ভিড়। ওয়া পদস্পর্শের হাত ধরে
আছে, তা না হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ভয়। ফুটপাথের ফাঁকা
মতো এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পিয়া, তাকিয়ে আছে একটা
জুয়েলারীর দোকানের দিকে। শো-কেসে ঝগমল করছে হারক রক-
মের অলংকার। চাপা গলায় বলল সে, ‘আমাকে একটা উপহার কিনে
দেবে, ডিউক?’

ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রানা দোকানের ভেতর। ‘বল,
কি উপহার চাও তুমি।’

বঁটে সেলসম্যান বিদেশী খদ্দের দেখে একগাল হেসে এগিয়ে
এল। ‘তোমাকে মনে রাখার জন্যে আমি একটা আঙুটি চাইব,’
বলল পিয়া। নকল জেড পাথর বসান একটা আঙুটি পছন্দ করল
সে। এমন কিছু দাম নয়, কিন্তু জিনিসটা দেখতে খুব সুন্দর। সেলস-
ম্যান দাম হাঁকল, চল্লিশ ডলার। কিন্তু দর কষাকাষ করে সেটাকে

নামিয়ে পঁচিশ ডলারে রকা করল পিয়া ।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল সে, ‘সব সময় পরে থাকব তো, কাজেই প্রায়ই তোমাকে মনে পড়বে ।’

ফেরী পার হল ওরা । ট্যাক্সির জন্যে একটা হাত তুলেছে রানা, ঘটনাটা ঠিক সেই সময় ঘটল । কোথেকে কি হয়ে গেল, বুঝতেই পারল না ও । হাত তুলতেই সামনে চলে এল ট্যাক্সিটা । সেই সাথে বহিষ্ঠ গড়নের তিনজন চীনা ঘিরে ধরল ওকে । তাদের একজন খুঁকে পড়ে কথা বলল ড্রাইভারের সাথে, যেন ট্যাক্সি ভাড়া করাই তাদের উদ্দেশ্য । ড্রাইভার ওদেরকে নিরাশ করায়, তুল ইংরেজীতে রানার কাছে কথা চাইল তিনজনই । ট্যাক্সিটা রানা ডেকেছে তা নাকি বুঝতে পারেনি ওরা । কথা চেয়ে চলে গেল ওরা আরেকটা দাঁড়ান ট্যাক্সির দিকে ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে তাকাল রানা, কি যেন বলতেও গেল পিয়াকে, কিন্তু কোথায় পিয়া । ঝট ঝট করে দ্রুত নিজের চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা । নেই তো নেই-ই । যেন ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে-প্রাণ করেছে মেয়েটাকে ।

চারদিকে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখল না রানা । কিন্তু পিয়ার ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও । শুধু যে অস্বস্তি বোধ করছে ও তা নয়, সেই সাথে মেয়েটার অমঙ্গল আশংকা করে ভয় হতে লাগল ওর । ফেরীঘাটে ফিরে এল ও । এখানেও কোথাও খুঁজতে বাকি রাখল না । অবশেষে বার্ষ হয়ে ফিরে এল হোটেলে ।

বরাবরের মতো কাউন্টারে বসে ঝিমুচ্ছে বুড়ো লোকটা ।

‘ওমপঙ পিয়া ফিরে এসেছে ?’ রানার গন্তীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল, চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল বুড়ো । কিন্তু সামনে

মান্নাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীরস গলায় বলল, 'নো স্পীক ইং-
লিশ।' ধীরে ধীরে বসে পড়ল আবার, বন্ধ করল চোখের পাতা।

লবি থেকে প্যাসেঞ্জে চলে এল রানা। পিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ।
হাতল ধরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল কবাট। ভেতরে অন্ধকার।
দেয়াল হাতড়ে সুইচ অন করল। পরিপাটি করে সাজান ছোট
ঘর। টেবিলের ওপর স্থির হয়ে আছে বড় সড়চীনা পুতুলটা। তাকিয়ে
আছে ওর দিকে। চাবি ঘুরিয়ে দম দিতেই এদিক ওদিক মাথা নাড়তে
শুরু করল। ঘরে কোথাও নেই পিয়া। বিছানায় বসল ও। সিগারেট
ধরাল। কয়েকটা সিগারেট শেষ করার পর রিস্টওয়াচ দেখল। সাড়ে
এগারোটো। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল ও। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে
ঘটনাটার কথা স্মরণ করল বারবার। কিন্তু চোখের নিমেষে পিয়ার
গায়েব হয়ে যাওয়ার রহস্যটা বোধগম্য হল না। তারপর কখন
ঘুমিয়ে পড়েছে রানা নিজেও বলতে পারবে না।

মুখে রোদ লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। ধড়মড় করে উঠে
বসল বিছানায়। রিস্টওয়াচ দেখল, আটটা। ঘরের চারদিকে ভাল করে
চোখ বুলাল। ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও পিয়া
ফেরেনি। ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল। মন
বলছে, পিয়ার সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। ওর পাশ থেকে সরিয়ে
নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে। কেন, তাও অনুমান করা কঠিন নয়।
কেউ জানতে পেরেছে, পিয়া অনেক গোপন তথ্য জানে, এবং শুধু
যে জানে তাই নয়, অনেক তথ্য ওকে জানিয়েও দিচ্ছিল সে।

নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। দাঁড়ি কামিয়ে শাওয়ার সারল।
পোশাক পরে বেরিয়ে এল লবিতে। বুড়োর জায়গায় বসে আছে
একটা চীনা ছেলে। বুড়োর সাথে চেহারার মিল দেখে ভাবল, বোধ-

হয় নাতি। হাফা সুরে তাকে বলল ও, ‘গত রাতে ঘরে ফেরেনি পিয়া।’

অপ্রতিভ দেখাল ছেলেটাকে। বোধহয় ইংরেজী বোঝে না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে রিক্সায় চড়ল রানা। ‘পুলিশ হেড-কোয়ার্টার।’

রানাকে দেখেই চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন নিজের চেয়ার ছেড়ে খানিকটা উঠে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। ‘আসুন। আসুন, মিঃ ডিউক। সেদিন আমার ওপর রাগ করেছিলেন আপনি, তাই না? কি জানেন, সাত ঝামেলার মানুষ, সব সময় সবার প্রতি সূবিচার করতে পারি না আমরা...’

করমর্দন সেরে বসল রানা। গত রাতের পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে শোনাচ চীফ ইন্সপেক্টরকে।

ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল জ্যাসন। বলল, ‘আপনি হঠাৎও নতুন কিনা, তাই এই রকম সাধারণ একটা ব্যাপারে উদ্ভিগ্ন হচ্ছেন। এখানে এসব ভাল ভাব। একটা মেয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে—গত পনের বছর ধরে এই দেখে আসছি। আপনাকে ফেলে পালিয়েছে পিয়া, তার কারণ আপনার চেয়ে মাল-প নি ওয়ালা বন্দেদর ছুটে গিয়েছিল। আপনার পকেট খালি করে আরেকজনের পকেট খালি করতে গেছে, এর মধ্যে আর কিছু নেই।’

প্রচণ্ড রাগ হল রানার। ইচ্ছে হল পেপারওয়ায়েট হুক লোকটার মাথা ফাটিয়ে দেবে ভেতরে কতটা কি আছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শাস্তভাবে বলল, ‘আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমি একটা ধূনের তদন্ত করছি। আমাকে কিছু তথ্য দিচ্ছিল পিয়া। এই সময় অদৃশ্য হয়ে যায় সে।’

‘আপনি আমাকে হাসালেন দেখছি।’ সহাস্যেই বলল জ্যাসন।
‘খুনটা হয়েছে ঢাকায়, এখানকার পিয়া আপনাকে সে ব্যাপারে কি
খবর দিতে পারে?’

‘বলছি। িয়ের তিনমাস পর হঠাৎ করে ভাল রোজগারের একটা
পথ পেয়ে যায় শফিক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বোঙ্গার গুরু
করেই স্বত্বিক ফল রেখে চলে যায় সে। রিপালস উপদ্বীপের ধারে
বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল...’

‘আপনি া সাহেব আছব মানুষ।’ বিরক্ত দখাল চীফ ইন্স-
পেক্টরকে। ‘একটা কলগার্ল কি বলল না বলল আপন সব বিশ্বাস
করে বসে আছেন?’

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল রানা। ‘রিপালস উপদ্বীপে
বসবাস করে এমন কোন বাঙালীকে জানেন আপনি?’

‘বেশ কিছু বাঙালী আছে ওদিকে। তাতে কি?’

‘শফিক ওখানে ছিল কিনা খবর নেবেন?’

‘শফিক ওখানে ছিল বল মনে হয় না,’ বলল জ্যাসন। ‘থাকলে
আমি খবর পতাম। তাছাড়া, ওদিকে বাড়ি ভাড়া নেয়া সহজ কথা
নয়। মেলা ভাড়া। অত টাকা পাবে কোথায় সে?’

‘তাহলে আপনি বলতে চান, মেয়েটা আমাকে মিথ্যে তথ্য
দিয়েছে?’

‘তা অব বলতে। ওদের কাজই তো এই—একগাদা মিথ্যে কথা
বলে আপনাদের মতো খন্দেবন্দে পকেট খালি করা।’

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল
রানা। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে এল হোটেল। লবিতে চুকে দেখল,
কাউন্টারে বসে আছে ছেলেটা নয়, বুড়োটা। কয়েকটা কথা বলল

দরকার ওর সাথে , কিন্তু ইংরেজী বোঝে না সে , তাই একজন দোভাষীর কথা মনে হলো রানার। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই যে গাইড লোকটার সাথে পরিচয় হয়েছিল ওয়াম পিং হো , তার কথা মনে পড়ে গেল। সবে সকাল, আরেকটু পর তার সাথে যোগাযোগ করবে ভেবে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। পোশাক পরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘণ্টাখানেক পর টোকা পড়ল দরজায়।

হোটেলের একজন বয়, ইঙ্গিতে জানাল , ফোনে কেউ ডাকছে রানাকে। তাড়াতাড়ি লবিতে চলে এল রানা। কাউন্টারে বসে লম্বা একটা অঙ্ক কষছে বুড়ো লোকটা। চোখাচোখি হতে একটু হাসল রানা , রিসিভার তুলে বলল , 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসনের গলা পাওয়া গেল। 'একটু আগে যে মেয়েটার কথা বলে গেলেন কি যেন নাম তার?'

অমঙ্গল আশঙ্কা করে বুকটা কেঁপে গেল রানার। 'ওমপঙ পিয়া। কেন?'

'জেড পাথরের একটা আংটি কিনে দিয়েছিলেন তাকে, তখন সে কথাই তো বলে গেলেন , তাই না?'

সারা শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল রানার। 'হ্যাঁ। নকল জেড বসানো আংটি। ওর কোন খবর পেয়েছেন?'

'ট্যাক্সি নিয়ে এখনি চ্যাথাম রোডের পুলিশ স্টেশনে চলে যান, মি. ডিউক।'

'ও...? ও কি...?'

'হ্যা , মি. ডিউক। একটা মেয়ের লাশ পেয়েছি আমরা। তাড়াতাড়ি চলে যান, দেখুন, যদি সনাক্ত করতে পারেন। ওখানে সার্জেন্ট কট আছে , তার সাথে দেখা করবেন।'

পাশের কামরা

চল্লিশ মিনিট পর চ্যাথাম রোডের পুলিশ স্টেশনে দেখা গেল রানাকে । সার্জেন্ট কট বেশ খাতির করে বসাল ওকে । বলল, 'লাশ দেখে সনাক্ত করার কিছু নেই, আপনাকে শুধু একটা হাত দেখাতে পারব আমরা । রাত দুটোয় প্রণালী থেকে পাওয়া গেছে লাশটা । ওখান থেকে রোজই দু'একটা লাশ উদ্ধার করতে হয় আমাদের । এই চীনাদের নিয়ে ভারি মুশকিল, বুঝলেন! আত্মহত্যা আর খুন করতে এদের জুড়ি নেই।

মর্গে নিয়ে আসা হলো রানাকে । সারি সারি টেবিলের উপর চাদর ঢাকা লাশ পড়ে আছে। একটা চাদরের কোণ একটু সরিয়ে সার্জেন্ট কট ভেতর থেকে লাশের বাঁ হাতটা বের করল । আনামিকায় রয়েছে জেড পাথরের আঙটিটা, দেখেই চিনল রানা । সাথে সাথে রাগ, ক্ষোভ আর দুঃখ মিশ্রিত অনুভূতিতে স্তম্ভ পাথর হয়ে গেল ও । ঝাড়া এক মিনিট কথা বলতে পারল না । ইতোমধ্যে দু'বার জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে সার্জেন্টের, 'আঙটিটা চিনতে পেরেছেন কি?'

সামনের দিকে ঝুঁকে চাদরটা ধরল রানা, সামান্য একটু তুলে ভেতরের লাশটা ভাল করে দেখল । অনুশোচনা হলো পর মুহূর্তেই । না দেখলেই ছিল ভাল । ওমপঙ পিয়ার শরীরের এক ইঞ্চি জায়গাও অক্ষত নেই । 'হ্যাঁ ।' ফিস ফিস করে বলল ও, 'এই আঙটিই কিনে দিয়েছিলাম পিয়াকে ।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সার্জেন্ট । 'আপনি আমাকে বাঁচালেন, মি. ডিউক । সকালে শুধু ডিম আর বেকন খেয়েছি। আপনি সনাক্ত করতে পেরেছেন, তার মানে ফালতু ছুটোছুটির হাত থেকে বেঁচে গেলাম । মোটা নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে বউ, চলুন যাবার পথে আপনাকে ফেরী পর্যন্ত পৌছে দিই ।

‘না, তার দরকার হবে না,’ বলল রানা। ‘আমি নিজেই কিরব।
 ওর মাথায় তখন ওমপণ্ড পিয়ার স্মৃতি বকবকে ছবির মতো কুটে
 উঠছে। মাত্র দু দিনের পরিচয়, অথচ মনে হচ্ছে প্রিয় এবং প্রয়ো-
 জনীয় একজনকে হারিয়েছে সে। বিষয় মনে পুলিশ স্টেশন থেকে
 বেরিয়ে এল ও।

ফেরীঘাটে পৌছে দেখল, আরেকজন সার্জেন্ট জীপ নিয়ে ওর
 জন্যে অপেক্ষা করছে। নাম বলল নিকলসন। জীপ হাঁকিয়ে সোজা
 হোটেল কসমোপলিটানে নিয়ে এল রানাকে। কান্ট্রীজ ভাষায়
 কিছু বলতেই কাউন্টারে বসা বুড়ো পিয়ার কামরার চাবি তুলে দিল
 সার্জেন্টের হাতে। দুর্বোধ্য ভাষায় আরো কিছু কথা বলল সার্জেন্ট,
 উত্তরে বুড়ো শুধু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

রানাকে নিয়ে পিয়ার ঘরে চলে এল সার্জেন্ট নিকলসন। লোকটা
 যে কি খুঁজছে, বুঝতেই পারল না রানা। দেয়াল আলমিরা, বাস,
 স্মুটকেস সবগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল সে। কিন্তু পেল না কিছুই।
 তবু দমল না। বিছানার তোষক খাট থেকে নামিয়ে ফেলল মেঝেতে।
 যা খুঁজছিল এবার পেয়ে গেল সেটা। তোষকের নিচেই ছিল, খাটের
 গায়ে অনেক দিনের পুরনো একটা খোপের ভেতর। কাগজের
 তিনটে ছোট মোড়ক। মোড়ক খুলে নাকের সামনে ধরল সার্জেন্ট।
 জ্ঞান নিল। তারপর সবজাস্তার মতো মাথা নেড়ে বলল, ‘যা ভেবে-
 ছিলাম।’

‘কি ওগুলো?’

‘হেরোইন। ওমপণ্ড পিরা হেরোইন অ্যাডিক্ট ছিল।’

‘আমার বিশ্বাস হয় না,’ বলল রানা। ‘জানি, হেরোইন পাওয়ার
 আপনারা নিজেদের মনগড়া ষিওরি আরো জোরে আঁকড়ে ধরে

বলবেন, পিরা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি, মেয়েটা আত্ম-
হত্যা করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে। এই হেরোইন একটা বড়-
বস্ত্রের অংশ, অ'পনাদের ভুল পথে সরিয়ে নেবার জন্যে কেউ রেখে
গেছে এখানে...'

'চীফ ইন্সপেক্টর বলছিলেন বটে, আপনি নাকি একজন প্রাই-
ভেট ইনভেস্টিগেটর।' চোখমুখে রাজ্যের কোতুক ফুটিয়ে বলল
সার্জেট নিকলসন। 'কি জানেন, মিঃ ডিউক, শার্লক হোমসের সাথে
আমারও এক-আধটু পরিচয় আছে। কিন্তু সে তো কল্প-কাহিনী।
আমরা বাস্তব ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাই, এখানে বইয়ে পড়া বিদ্যে
দিয়ে স্মৃতিধে করা যাবে না।'

রেগে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বুল রানা, এ-লোকের সাথে তর্ক
করতে যাওয়া বোকামি। বলল, 'তা ঠিক।'

'তবু, কোতুক থেকে জানতে ইচ্ছে করছে, কেন মনে করছেন,
খুন হয়েছে মেয়েটা?'

'আমি আপনার প্রাইভেট টিউটর নই,' শাস্ত গলায় বলল রানা।
'আরো কিছু দিন হুকুমে আছি আমি। দরকার হলে দেখা কর-
বেন।' বলে আর দাঁড়াল না ও, প্যাসেজে বেরিয়ে এসে নিজের
ঘরে ঢুকল, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

সাঙ

সার্জেন্ট নিকলসন হোটেল ছেড়ে চলে গেছে বুঝতে পেরেই নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। লবিতে একা বসে আছে বুড়ো। চোখে উদাস দৃষ্টি। তাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে ফোনের সামনে দাঁড়াল ও। গাইড ওয়াম পিং হো-র নাম্বারে ডায়াল করল। পাওয়া গেল তাকে। একজন দোভাষী আর একটা গাড়ি দরকার ওর—হো বলল, সব ব্যবস্থা করে দেবে সে। লোকটার আগ্রহ আর উৎসাহ লক্ষ্য করে রানার মনে হল, পরিচয় হবার পর থেকে ওর টেলিফোন পাবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল সে।

রিজা নিয়ে সাংহাই অ্যাণ্ড হঙকঙ ব্যাংকের সামনে চলে এল রানা। পারভিনের দেয়া ট্রাভেলার্স চেকগুলো ভাঙিয়ে ট্রাউজারের ছুই পকেট ভরে নিল হঙকঙ ডলারে। বাইরে বেরুতেই দেখল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওয়াম পিং হো। ধোপহরস্ত পোশাকে উজ্জল লাগছে তাকে। মুখে সবিনয় হাসি। দেখেই মনে হয়, মাই ডিয়ার ম্যান। পাশেই দাঁড় করান রয়েছে বকবকে একটা প্যাকার্ড গাড়ি, সেটা দেখিয়ে বলল, ‘এর চেয়ে ভাল গাড়ি আর পেলাম না।’

‘এতেই চলবে,’ বলল রানা। ওয়ামকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল ও। স্টার্ট দিল। বলল, ‘আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমার হোটেলের রিসেপশন ক্লার্কের কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করতে

চাই। সেজন্যেই দোভাবীর প্রয়োজন।’

উত্তেজিত হয়ে উঠল ওয়াম। সোনালী দাঁত বের করে বলল, ‘অনেক ডিটেকটিভ গল্প পড়া আছে আমার, স্যার। কিন্তু নিজের চোখে এই প্রথম একজন ডিটেকটিভকে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। আপনার কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাব, স্যার। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধনের কেস নিয়ে এসেছেন...?’

‘না,’ হাসি চেপে বলল রানা। ‘আমি একটা মার্ডার কেসের তদন্ত করছি।’ গাড়ি ছেড়ে দিল ও। ‘প্রথমে হোটেল ফিরব আমরা।’ পকেট থেকে একশো হুগবু ডলার বের করে ওয়ামের হাতে ধরিয়ে দিল ও। ‘আপনার আজকের ফি। চলবে তো?’

‘খুব চলবে,’ আনন্দে চিক চিক করে উঠল ওয়ামের চোখ। ‘তবে গাড়ির জন্যে আরো বিশ ডলার দিতে হবে, স্যার।’

হোটেলের সামনে গাড়ি থামতেই চেহারায় গাভীর ফুটিয়ে বলল ওয়াম, ‘এটা স্যার, নিতান্তই একটা বাজে হোটেল। এখানে আপনাদের কোনমতেই থাকা উচিত নয়। আপনার আপত্তি না থাকলে ভাল একটা হোটেলের ব্যবস্থা...’

‘পরে।’

হোটেলের লবিতে ঢুকে বুড়োর দিকে ওয়ামের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। ‘ওকে বলুন, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, উত্তর দিলে টাকা পাবে। কিন্তু এমন ভাবে বলুন যাতে অপমান বোধ না করে।’ পকেট থেকে একগাদা হুগবু ডলার বের করল ও, তা থেকে মাত্র কয়েকটা হাতে রেখে বাকিগুলো আবার পকেটে ভরল।

বুড়োর দৃষ্টি রানার হাতের ওই টাকাগুলোর দিকে আটকে গেল। টাকার দিকে তাকিয়ে থেকেই ওয়ামের কথাগুলো শুনল সে। উত্তর

দেবার সময়ও তার দৃষ্টি একচুল নড়ল না ।

ওয়ার্ড জ্ঞানাল, 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছে
ও, স্যার ।'

সুজি কাফাও-র ফটোটা বের করল রানা । বুড়ো ডুক কুঁচকে
দেখল ছবিটা । তারপর ওয়ামকে কিছু বলল । ওয়াম রানাকে জ্ঞানাল,
'মেয়েটাকে চেনে ও । একজন বাঙালী লোককে বিয়ে করেছিল ।
দিন পনের আগে কাউকে কিছু না বলে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে
মেয়েটা । মিঃ ডিউক কি তার বকেয়া হোটেল বিল মিটিয়ে দেবেন ?'

মাথা নেড়ে জ্ঞানাল রানা, না ।

বুড়ো আরো বলল, সুজি কাফাও-র স্বামীর নাম ছিল মীর শফি-
কুর রহমান । মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে । শফিকুরের ফটোটা
তাকে দেখাল রানা । বুড়ো একবার চোখ বুলিয়েই জ্ঞানাল ইয়া,
এই লোকটাই শফিকুর রহমান, সুজির স্বামী । কতদিন ছিল শফিক
হোটলে ? বুড়ো বলল, অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার আগে পর্যন্ত ছিল
এখানে ।

বুড়ো মিথ্যে কথা বলছে, বুঝতে পারল রানা । পিয়ার কথা
অমুঘায়ী মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই হোটেল কমমোপলিটান ছেড়ে
চলে গিয়েছিল শফিক । ওয়ামকে বলল রানা, ওর ধারণা বুড়ো
মিথ্যে কথা বলছে ।

অভিযোগটা শুনে বুড়োর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল ।
ঘন ঘন মাথা ঝাকিয়ে জ্ঞানাল সে, সে-ই সত্যি কথা বলছে । পিয়া যদি
বলে থাকে যে শফিকুর রহমান কয়েক মাস আগে হোটেল থেকে
চলে গিয়েছিল তাহলে মনে করতে হবে, ভুল বলেছে সে । শফিক
প্রতিদিন খুব ভোরে বেরিয়ে যেত, তাই হয়ত তাকে দেখতে পেত না

পিয়া ।

তাহলে সুজি কেন পিয়াকে বলেছিল যে শফিক তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে ? এর উত্তর বুড়োর জানা নেই । পবিত্রী প্রশ্ন করা হল, শফিকের ব্রাহ্মগারের উৎস কি ছিল । বুড়ো জানে না । কোন বাঙালী কি শফিকের সাথে দেখা করার জন্যে হাটেনে আসত ? বুড়ো জানে না । সুজির কোন বন্ধু বা বান্ধবী কি সুজির সাথে দেখা করতে আসত ? সব একই উত্তর—জানে না । সুজি হাটেল ছেড়ে চলে যাবার সময় জিনিস পত্র কিছু রেখে গেছে ।

রানার ফাঁদে সহজেই ধরা দিল বুড়ো । বলল, না ।

তাহলে জিনিস পত্র সব নিয়েই গেছে ? জিনিস-পত্র নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল কিভাবে, বিল না শোধ করে ?

ওয়ার্ডের চোটপাট দেখে ঘাবড়ে গেল বুড়ো । শেষ পর্যন্ত স্বীকার গেল সে, একটা স্যুটকেস রেখে গেছে সুজি । কোথায় সেটা ? পিয়ার ডান পাশের ঘরে থাকত সুজি, সেখানেই আছে । তখন পিয়ার পাণের কামরায় চলে এল ওরা । খাটের তলায় ঢুকে সস্তা দরের একটা লদার স্যুটকেস বের করে আনল বুড়ো ।

ওদের দু'জনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা । কম দামী তাল, সেটা ভেঙে স্যুটকেস খুলতে কোন অসুবিধেই হল না । ভেতরে দেখা গেল কিছু কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি জিনিস । স্যুটকেসের একেবারে নিচে, একটা কাগজের তলা থেকে বেরুল সাদা রঙের বড় একটা এনভেলোপ । ভেতরে একটা কটোগ্রাফ দেখা গেল । বের করল ও । মীর শফিকুর রহমানের ফটো । পারভিন শফিকের যে ছবিটা দিয়েছিল ওকে, সেটারই আরেকটা কপি এটা । ফটোর নিচে আকাবাঁকা হরফে লেখা,

‘আমার স্ত্রী সৃষ্টি কোরাওকে’ । চোয়াল ভাঙা কদৰ্ঘ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা । চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কপালে । একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপর বসল ও । পারভিন এবং সৃষ্টি কোরাও, হু’জনেই শফিকের একই ফটো পেল কিভাবে ? আশ্চর্য একটা ব্যাপার, তাই না ? শফিক হু’জনকে একই ফটো দিয়েছিল ? হয়ত তাই । কিন্তু পরমুহূর্তে একটা প্রশ্ন দেখা দিল মনে...

প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে পিরা আর বুড়ো রিসেপশন ক্লার্কের কথাগুলো স্মরণ করল রানা । হু’জন হু’রকম কথা বলছে । তার মানে, এদের মধ্যে একজন মিথ্যেবাদী । কিন্তু মিথ্যে কথা বলে পিয়ার লাভ কি ?

আরো খানিক চিন্তা-ভাবনা করে উপলব্ধি করল রানা, হোটেল কমমোপালটানে থাকার আর কোন মানে হয় না ওর, সূত্রের সন্ধানে অন্য কোথাও যাবার সময় হয়েছে । ফটোটা এনভেলোপে ভরে আগের জায়গায় রেখে দিল ও । তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্যাসেজে । দেখল, বুড়ো কাউন্টারে ফিরে গেছে, প্যাসেজে একা দাঁড়িয়ে আছে ওয়াম পিং হো ।

‘রিপালস উপসাগরের কাছে কোন হোটেল উঠতে চাই আমি,’ ওয়ামকে বলল রানা । ‘ব্যবস্থা করতে পারবেন ?’

‘নিশ্চয় পারব,’ উৎসাহের সাথে জানাল ওয়াম ।

‘তাহলে এই মুহূর্তে সেখানে উঠতে চাই আমি ।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওয়াম । ‘লোকটাকে আর কোন প্রশ্ন... ?’

‘না ।’

‘বেশ । রিপালস বে চমৎকার হোটেল, যদিও চালু রাস্তাগুলোর

ওপর নয়...

‘ওখানেই আমার জন্যে একটা কামরার ব্যবস্থা করুন।’ হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে প্যাকার্ড গাড়িতে চড়ল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসল ওয়াম। গাড়ি ছুটে চলল রিপালস বে-র দিকে।

রিপালস বে মুক্ক করল রানাকে। বে হোটেলে যে ঘরটা পেল ও সেটার জানালা থেকে সামনে সাগর দেখা যায়। ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ালে ছ’পাশে দেখা যায় পাহাড়শ্রেণী, কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে শৃঙ্গগুলো। নীল সাগরের বিশাল সব ঢেউ অনবরত আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাথুরে পাদদেশে, ঢেউ ভাঙার একটানা গর্জন শুনে রক্তে জ্বাगे রোমাঞ্চকর আলোড়ন।

প্যাকার্ড গাড়িটা রেখে গেছে ওয়াম। বলে গেছে, দরকার হলে ফোন করে ঘেন রানা, সাথে সাথে চলে আসবে সে।

ওয়াম চলে যেতেই টেলিফোন বুকটা টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। শফিক হুতকঙের এই এলাকায় বেশ কিছুদিন ছিল বলে মনে হয়, কাজেই ফোন বুকে তার টেলিফোন নাম্বার থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেও নামটা পাওয়া গেল না। হোটেলের রিসেপশনিস্টকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, মীর শফিকুর রহমান নামটা তার পরিচিত কিনা। রিসেপশনিস্ট দুঃখ প্রকাশ করে জানাল, এ-ধরনের নাম এই প্রথম শুনেছে সে। হঠাৎ একটা প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল রানার—হোটেল বয়ের কাছ থেকে সব খবরই পাওয়া যায়। ফোনের রিসিভার তুলে রুম বয়কে চা দিতে বলল ও। তিন মিনিট পরই চা নিয়ে কামরায় ঢুকল তরুণ রুম

বয়।

‘প্রশ্নটা আগে মন দিয়ে শোন,’ বলল রানা। ‘উপসাগরের কিনারায় বড় একটা বাড়ি। সিঁড়ির ধাপগুলো নেমে গেছে সাগরে। বাড়িটার সাথে ছোট একটা শান বাঁধানো ঘাট, ঘাটে সুন্দর একটা বোটও আছে। মনে করে দেখ, এই রকম কোন বাড়ি দেখেছ ঘাশপাশে কোথাও?’

খানিক চিন্তা করল রুম বয়। তারপরই উজ্জল হয়ে উঠল তার মুখের হে হাটা। ‘ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি লনফিনের বাড়ি-টার কথা বলছেন কিনা। ওখানে এখন থাকেন মিঃ সুধীর নন্দী আর তাঁর বোন। এঁরাও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু ভারতীয়।’

‘ওখানে মীর শফিকুর রহমান নামে কেউ থাকত কিনা জান?’

ভুরু কুঁচকে শ্রবণ করার চেষ্টা করল রুম বয়। তারপর এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, না, স্যার। নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না।’

বিকলে সীতাহের পোশাক পরে সৈকতে চলে এল রানা। সীতার কাটার জন্যে যারা এসেছে তাদের মধ্যে চীনার সংখ্যা খুব কম, বেশিরভাগই ইউরোপীয়ান। একটা পেডালো ভাড়া করল ও। বৈঠা চালিয়ে বেরিয়ে এল বে থেকে। প্রায় মাঝ ঘন্টা পর যথেষ্ট দূরে সরে এল, গোটা উপকূল রেখা দেখতে পাচ্ছে এখন লনফিনের ভিলাটা জিনতে মোটেও অসুবিধে হল না। সাগরের মাঝখানে উঁচু একখণ্ড জমি, তার ওপর সুন্দর একটা বাড়ি। বাড়ির পাশেই চমৎকার বাগান। গোটা জমিটা ধাপে ধাপে নেমে এসে সাগরের সাথে মিশেছে। শান বাঁধান নির্জন ঘাট। ছোট একটা স্পীডবোট নোঙর ফেলে রয়েছে। বৈঠা চালিয়ে মন্থর গতিতে বাড়িটার দিকে

এগোল ও ।

সত্যিই কি এই বাড়িটা ভাড়া করেছিল শফিক ? পিয়া ভুল করেনি তো ? দেখেই বোঝা যায়, অনেক ভাড়া এ-বাড়ির । তার মানে, হঠাৎ অনেক টাকা পড়েছিল শফিকের হাতে । হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে সতর্ক, সাবধান হয়ে গেল রানা । বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ঘরের জানালার ফুঁদে চুটো বিন্দু রয়েছে, তার একটার ভেতর অকস্মৎ কি যেন ঝিক্ করে উঠল । সরাসরি সমীকে আর তাকালই না ও । সন্দেহ নেই, বাহনোকুলার দিয়ে কেউ লক্ষ্য করছে । সূর্যের আলো লেগেছে শক্তিশালী লেন্সে, ঝিক্ করে উঠেছে তারই প্রতিফলন । কাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে ? ওকেই কি ?

পেডালো ঘুরিয়ে নিল রানা । বাড়িটার পাশ ঘেঁষে চলে আসার সময় ক্ষুদ্র এখবার চোখ বুলিয়ে বেঁধে নিল । কাল বিন্দু চুটো এখনও রয়েছে । আর কোন সন্দেহ নেই, ওকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে । সৈকতে পৌঁছতে সক্ষম হয়ে গেল । তাড়াতাড়ি হোটেল ফিরে এল ও ।

পাঁচদিন সকালেও পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে পারল না রানা । দশটার দিকে আবার ফিরে এল সৈকতে । উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ, তারপর খানিক সীতার কেটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বালির ওপর । আফিকুল্লাহ খান, মুজিব কোচাও, মীর শফিকুর রহমান, পারভীন, বুড়ো মীর মোখলেসুর রহমান, তার নাতি মীর সাদেকুর রহমান এবং সরল মেয়ে হতভাগী ওয়সুত পিয়াকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ও । পারের কাছে আছড়ে পড়ছে সাগর, মাথার ওপর অসীম নীল আকাশ-চোখ বুঁজে প্রকৃতির কাছে নিজের সমগ্র অস্তিত্বসহ আত্মসমর্পণ করল রানা ।

প্রায় ষট্টিখানেক রোদ পোহাল ও । এই সময় খুব কাছে পারের

আওয়াজ হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুলল ও। দেখল, ওর পাশে
বেঁচে হেঁটে গেল একটা মেয়ে।

বেশ লম্বা মেয়েটা, মেদহীন একহারা গড়ন। ভাল করে তাকাতে
বুঝল, গায়ের রঙটা যদিও ফর্সা, মেয়েটা খেতাজিনী নয়। পরনে টু-
পীস বিকিনি, শরীরের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণগুলো তাতে পুরো-
পুরি ঢাকা পড়েনি। হাতে বড় একটা সান হ্যাট, হাঁটার তালে তালে
দোলাচ্ছে সেটা। সৈকতে শুয়ে আছে যারা, সবাই ঘাড় ফিরিয়ে
তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দেখার
মতোই ফিগার বটে মেয়েটার। কোমরের নিচে পর্যন্ত ঘন কাল এক-
রাশ চুল তার অতিরিক্ত আকর্ষণ। হাঁটার ছন্দময় ভঙ্গিতে যৌবন
যেন উথলে পড়ছে।

সাগড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। এদিক ওদিক কোন
দিকে না তাকিয়ে অবহেলা ভরে পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সান
হ্যাট, তারপর নিখুঁত ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক সেকেন্ড
পরই বুঝল রানা, দক্ষ একজন সাঁতারু মেয়েটা। শ'খানেক গজ
দূরে বিশাল একটা পাথর পানির ওপর মাথা তুলে আছে, সেটার
ওপর উঠে বসল মেয়েটা। পানিতে পা ডুবিয়ে দিয়ে পাথরের গায়ে
হেলান দিল সে। নির্জন পাথরের ওপর সাগরের রাণী বলে মনে
হল তাকে। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। মেয়েটার
সঙ্গ পাবার লোভ অদম্য হয়ে উঠল ওর ভেতর। কখন যে বালির
ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে ও, খেয়ালই নেই খানিক এগিয়ে
নামল সাগরে। ধীর গতিতে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে বিশাল
পাথরটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে পানির নিচে ডুব দিল ও।

মেয়েটার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে, পাথরের একেবারে কিনা-

রায় মাথা তুলল রানা। একদিকে কাত হয়ে বসে আছে মেয়েটা, কলে উন্নত স্তনদ্বুগল বিকিনির আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। পানির নিচে ডুব দেবার সময়ই দেখে ফেলেছিল রানাকে, জানত একেবারে কাছেই কোথাও মাথা তুলবে ও, কিন্তু ওর দিকে এতক্ষণে এই প্রথম সরাসরি তাকাল সে। মুখে হাসি নেই, তবে চোখের দৃষ্টিতে রাগের ও কোন লক্ষণ দেখল না রানা।

‘অদ্ভুত নির্জন জায়গাটা, তাই না?’ বাংলায় বলল রানা। ‘আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো? বলুন, তাহলে আমি পাথরের ওপারে গিয়ে বসি।’

শাস্তভাবে, চোখে কৌতুহল আর কৌতুক নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। তার এই সপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে পরিষ্কার বুঝল রানা, বহু পুরুষের সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা রয়েছে এ-মেয়ের। চোখ ছটো শুধু যে অনুরক্তিংসু তাই নয়, দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণ ভাষাও আছে।

‘নিঃসঙ্গতাই বরং বিরক্ত করছিল আমাকে, বলে হাসল মেয়েটা। আশ্চর্য কামোত্তেজক কণ্ঠস্বর। খুব কম মেয়ের গলায় এই দুর্লভ গুণটি থাকে। ‘আপনি... আপনাকে আগে তো কখনও দেখিনি? হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লেন মনে হল?’ রানার স্মৃচাম শরীরটা দেখে নিল আড়চোখে। প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল দৃষ্টিতে।

‘ডিউক, বাংলাদেশী,’ মুছ হেসে বলল রানা।

পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটা। ভাঁজ করল একটা হাঁটু। রানার বলার ভঙ্গি অনুকরণ করে বলল, ‘কণিকা নন্দী, ভারতীয়। এখানেই থাকি।’ চোখ বুঁজল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, তারপর চোখ মেলে রানার মুখে তাকাল। ‘নতুন চেহারা দেখতে পেলেন

খুশি লাগে। বেশ কিছুদিন আছেন, নাকি ...?’

নিভেকে ভাগ্যবান বলে মনে হল রানার। লনফিনের বাড়ির ভাড়াটে সুন্দর সন্দির বোনের সাথে এ ভাবে পরিচয় হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি ও। কিন্তু সাথে সাথে শক্তিশালী লেন্সে রোদ লগ্নে ঝিক করে ওঠা আলোর প্রতিফলনটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বাড়িটার সংকেতে উঁচু ঘরের জানালা থেকে ওর ওপর সন্দির রেখে-ছিল কেউ। ওঠাং করে এই পরিচয়, এ কি সৌভাগ্য বলে এনেছে, নাকি ভয়ংকর কোন বিষয় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে ?

ওয়াটার প্রফ পণ্ট থেকে সিগারেটের প্যাশেট দ্বার লাইটার বের করল রানা। ‘বেশ কিছু দিন নয়, এই হস্তাশ্রয় অনেক আছি আরো। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও। ‘আপনি ভাগ্যবানী

‘কেন ?’ বৌতুল ঝিলিক দিয়ে উঠল কণিকার চোখে।

‘এই রকম সুন্দর জায়গায় বাস করেন।’

‘ও’ হেসে উঠল মেয়েটা। ‘লনফিন নামে একজন বিখ্যাত জুয়াদী আছে আমরা তার বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। একটু ধমে বলল, ‘হুগুঙ শহরকে নিয়ে একটা এই বড় বই তিথছে আমার দাদা। ওর দরাসোনা করতে হয় আমাকে।’

কপাল কুঁচক তাকাল রানা। ‘বিক্র আমার দাদা ছিল, লনফিনের বাড়িট মীর শফিকুর রহমান ভাড়া নিয়েছিল।’

একটা ভুরু সামান্য একটু তুলে রানার দিকে তাকাল কণিকা। বিস্মিত হয়েছে, বোঝা গেল। ‘মীর শফিকুর রহমান ? আপনি তাকে চিনতেন ?’

‘চিনব না কেন, আমিও তো চাকর ছেলে।’

‘নিশ্চয়ই জানেন. শফিক মারা গেছে ?’

‘তুনেছি। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট। আপনার সাথে পরিচয় ছিল ?’

‘আপনি শফিককে চিনতেন তুনেলে সুখীরদ’ সাংঘাতিক খুশি হবে,’ বলল কণিকা। ‘ওর সাথে শফিকের ভাল পরিচয় ছিল। আমিও হুঁ একবার দেখেছি তাকে, এক আধটু আগামও হয়েছিল, কিন্তু তেমন বনিষ্ঠ হবার সুযোগ হ’জনের কেউই পাইনি। এভাবে হঠাৎ মারা গেল...চীনা বউটার তনো এটা একটা মারাত্মক আঘাত...’

‘শফিকের স্ত্রীকেও চেনেন আপনি ?’

‘চিনি ঠিক বলা চলে না, দেখেছি আর কি।’ এতটুকু তাক্সিলোর সাথেই বলল কণিকা। ‘খুব সুন্দরী ছিল। আর সুন্দরী মেয়েদের মুঠোয় চলে গেলে যা হয়, শফিকেরও তাই হয়েছিল—সাংঘাতিক নিচে নেমে গিয়েছিল সে। শফিকের লাশ নিয়ে ঢায়ায় গড়ে সুজি, আর বোধহয় ফিরবে না। তুনেছি শফিকের বাবা নাকি কোটিপতি, কাজেই মনে হয় সুজিকে একেবারে পার্নিতে পড়তে হবে না।’

সুজি কোয়াও যে মারা গেছে সে-কথাটা আর বলল না রানা। সিগারেটে টান দিয়ে একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে বলল, ‘তুনেছিলাম শফিক নাকি হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে সুজিকে এক-রকম ত্যাগ করেই চলে আসে এদিকে। লনফিনের বাড়িটাও নাকি ভাড়া নিয়েছিল সে।’

‘দূর। গাঁজাখুরী গর। এসব কথা কে বলেছে আপনাকে ?’

‘ব্যাপারটা তাহলে সত্যি নয় ?’

‘শ্রমই ওঠে না,’ উঠে বসল কণিকা। ‘সুজির বোজগারে চলত শফিক, লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেবার মত টাকা পাবে কোথায় ? মরা লোক সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু তিন্তু সত্যি হল,

মানুষ হিসেবে মোটেও ভাল ছিল না সে। এই সব আজগুबी কথা কে বলেছে আপনাকে বলুন তো ?’

হঠাৎ মোটর বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ, হু’জনেই সচকিত হয়ে উঠল। ঘাড় ফাটাতেই রানা দেখল, সাদা ফেনার V রচনা করে ক্ষুণ্ণ গতিতে একটা বোট ছুটে আসছে ওদেরই দিকে।

‘সুখীর, আমার দাদা—দাদা বটে, কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার ছোট বড় আমরা। একটু এদিক ওদিক হলে দিদি হয়ে যেতাম আমিই।’ একটা হাত তুলে দাদার উদ্দেশ্যে নাড়ুল কণিকা।

আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বোটের ইঞ্জিন, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিশাল পাথরটার গায়ে ভিড়ল সেটা। প্রায় ছয় ফিট লম্বা সুখীর নন্দী, পরনে সাদা শার্টস, সবুজ ডোরা কাটা সাদা শার্ট। বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল মুহূ। তারপর চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল রানার দিকে। মুখটা ভরাট কিন্তু নাক-নকশা ভাল, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। তবে চামড়ার নিচে নীল শিরা বাইরে থেকেও দেখা যায়—হাতা সম্মুখান করল মদের নেশা একটু বেশিই করে লোকটা।

দাদার দৃষ্টির অর্থ ধরতে পেরে তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল কণিকা, ‘সুখীর, ইনি ডিউক, বাংলাদেশী।’ রানার দিকে ফিরে বলল, ‘আমার ঘণ্টাদা এক ঘণ্টার বড় কিনা, তাই ঘণ্টাদা বলে ডাকি—যদিও ওর নাম সুখীর নন্দী। জান সুখীর, শকিককে এই জঙ্গলোকে চিনতেন।’

করমর্দন করল ওরা।

‘শকিকের সাথে পরিচয় ছিল বুঝি ? শুনে খুশি হলাম।’ বোনের দিকে ফিরল সুখীর। ‘ডিউক সাহেবকে বাড়িতে ডেকেহিস ? আজ রাতে আমরা এক সাথে বসে খেতে পারি, কি বলিস ?’ রানার দিকে

কিরল সে। ‘আপনার কোন অসুবিধে নেই তো? আমাদের বাবাও বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন, দেশ বিভাগের পরে ভারতে চলে আসেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল আছে আমার। চুটিয়ে গল্প করা যাও, কি বলেন?’

এমন একটা ভাব দেখাল রানা, যেন এত করে যখন বলছেন, ঠিক আছে যাব।

‘তাহলে ঠিক আটটার সময় বীচে চলে আসুন আপনি,’ খুশি হয়ে উঠল সুবীর। ‘বোট নিয়ে অপেক্ষা করব আমি। ডিনার শেষ করে আপনাকে নিয়ে একটু বেড়ানোও যাবে সাগরে। দেখবেন, খুব মজা লাগবে।’ বোনের দিকে তাকাল সুবীর নন্দী। ‘তোমার ফিরতে দেয়ি আছে নাকি? আমার কিন্তু সাংঘাতিক কিদে পেয়েছে।’

রানার দিকে ফিরে এক সেকেন্ডেই ততস্তত করল কণিকা। তারপর সুবীরের দিকে ফিরে বলল, ‘হ্যাঁ, ফিরব। কিন্তু টুপিটা ফেল এসেছি, আগে তুমি মামাকে তীরে নিয়ে চল।’ বিকিনি পরা শরীরে চেউ হুলে বোটে চড়ল সে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল। চেঁখের দৃষ্টিতে পরিকার আমন্ত্রণ। ঠোঁটের দুই কোণ সামান্য একটু প্রসারিত করে সাড়া দিল রানা। গর্জে উঠল বোটের ইঞ্জিন। চলে গেল ওরা।

রাত ঠিক আটটায় সৈকতে পৌঁছল রানা। সুবীরের বোট নিয়ে ওর অন্যে অপেক্ষা করছিল এক চীনা যুবক, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে অনেক কষ্টে রানাকে বোঝাল সে, মিঃ নন্দী নিজে আসতে পারেননি বলে কমা প্রার্থনা করেছেন।

লনকিনের বাড়ির শান বাঁধান ঘাটে পৌঁছতে মাত্র পাঁচ মিনিট

লাগল ওদের। কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঁচু জমিতে উঠে এল রানা। সবুজ ঘাসের ওপর চেয়ার টেবিল সাজান হয়েছে। আরো কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এল টেরেসে। সাদা রঙের ইভনিং ড্রেস পরেছে কণিকা। লোকাট ব্রক, বুকের অনেকটাই অনাবৃত। বাঁশের তৈরি আরাম কেদারায় বসে ছইন্ডির গ্রাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে, বাঁ হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে লুপে সিগারেট। ওর পাশে, একটু পিছিয়ে, অন্ধকারের ভেতর হলুদ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এক চীনা পরিচারক, হুকুমের অপেক্ষায়। আশপাশে কোথাও সুধীরকে দেখতে পেল না রানা।

হাতের গ্রাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সিঁধে হয়ে বসল কণিকা। ‘আমুন। বলুন, কি দেব আপনাকে?’

সামনের একটা আরাম কেদারায় বসল রানা। স্বচ আর সোডা চাইল। সাথে সাথে পরিবেশন করল চীনা পরিচারক।

‘এখনি এসে পড়বে সুধীর। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন, আপনার চোখ ছটো ভারি সুন্দর।’

‘ধন্যবাদ।’ চাইনীজ স্টাইলে সাজান হয়েছে টেরেসটা। কানিচারগুলো সবই খুব দামী। ছ দিকের দেয়ালে লাল সিঁকের পর্দা। মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডাইনিং টেবিল ফেলা হয়েছে। ডিনারের জন্যে টেবিল সাজান হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ‘খুব সুন্দর জায়গায় আছেন আপনারা,’ কণিকার দিকে ফিরে বলল রানা।

‘এই তো মাত্র কয়েক হপ্তা আগে এসেছি,’ বলল কণিকা। ‘এর আগে কাউলুনের একটা বাড়িতে ছিলাম। সেটাও মন্দ ছিল না, তবে এটার মতো নয়।’

‘মাত্র কিছুদিন আগে এখানে এসেছেন? তার আগে কে ছিল

এখানে ?’

‘কেউ ছিল বলে মনে হয় না। বাড়ির মালিক হঠাৎ এই সেদিন ঠিক করল, ভাড়া দেবে এটা। লোকটা এখানে থাকে না, ম্যাকাওয়ে তার ব্যবসা আছে।’

বাড়ির ভেতর থেকে এই সময় বেরিয়ে এল সুধীর নন্দী। হাসি মুখে করমর্দন করল ওরা। রানার সামনের আরেকটা চেয়ারে বসল সুধীর। চীনা পরিচারক তাকেও স্বচ্ছ আর সোডা নিয়ে এসে দিল। মামুলি কুশলাদি বিনিময়ের পর জ্ঞানতে চাইল সে, ‘আপনি কি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে হঠকতে বেড়াতে এসেছেন, মিঃ ডিউক ?’

‘হুগাখানেকের ছুটি পেয়ে গেলাম, এই সুযোগে চলে এসেছি...’

‘হঠকত বলতে আমিও এককালে পাগল ছিলাম,’ হেসে উঠে বলল সুধীর। ‘তা, শক্তিকে নিশ্চয়ই খুব ভাল ভাবে চিনতেন ?’

‘মীর মোখলেসুর রহমানকে ভালভাবে চিনি। আসার সময় তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম, ভদ্রলোক বললেন, ছেলেটা কিভাবে অ্যান্ড্রিডেন্ট করল, ওখানে কিভাবে চলাফেরা করত, ইত্যাদি ব্যাপারে যদি সম্ভব হয় তো একটু যেন খোঁজ-খবর করি।’

‘আচ্ছা ?’ বেশ অবাক দেখাল সুধীরকে। ‘ঠিক কি কারণে এই ধরনের একটা অনুসন্ধান করলেন শক্তির বাবা ?’

‘ছেলের সাথে তাঁর একটা ভুল বোঝাবুঝি প্রথম থেকেই ছিল,’ বলল রানা। ‘পাঁচ-ছয় বছর ছিল এখানে, চিঠি প্রায় লেখেনি বললেই চলে। ছেলে এখানে কি করত, কিভাবে চলত, সে-সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোন ধারণাই নেই। তবে, বিয়ের খবরটা শক্তিক জানিয়েছিল। বুড়ো ভদ্রলোক খুব আঘাত পেয়েছিলেন। সম্ভবত যেহেতু চীনা বলেই।’

গভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল সুধীর। বোনের দিকে একবার তাকাল। বলল, ‘আঘাত তো পাবারই কথা।’

‘এখানে কি করতে শক্তিক তা বোধহয় বলতে পারবেন আপনারা?’ অসহায় একটা ভঙ্গি করে সামান্য একটু হাসল সুধীর। ‘ওর ব্যাপারে আমরা কেন, কেউই বিশেষ কিছু জানে না। বোধহয় বেকার থাকতেই ভালবাসত শক্তিক। ওকে আমি পছন্দ করতাম, ঠিক, কিন্তু আমার কাছে একটা রহস্য ছিল ও। নিজের সব কথা গোপন করে যাবার একটা প্রবণতা ছিল ওর মধ্যে। সেজন্যেই আমরা যারা বাঙালী আছি এখানে, তারা অনেকই ভুল বুঝত ওকে।’ ইঙ্গিতে কণিকাকে দেখাল সে। ‘ও তো দেখতেই পারত না শক্তিককে।’

‘দেখতে পারব না কেন?’ গভীর সুরে বলল কণিকা। ‘...ওর ধারণা ছিল, দেখা মাত্র সব মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে যায়। এই ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমার একদম সহ্য হয় না।’

হো হো করে হেসে উঠল সুধীর নন্দী। ‘ঠিক হ্যাঁ, মেনে নিলাম—তুই ওর প্রেমে পড়িসনি। কিন্তু যাই বলিস, শক্তিককে আমার ভালই লাগত।’

‘কেউ তোমাকে আনন্দ দিলেই তাকে তোমার ভাল লেগে যায়...’

চীনা পরিচারক কাছে এসে জানাল, ডিনার তৈরি। উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল ওরা। চীনা স্টাইলে পরিবেশিত হলেও সমস্তই বাংলাদেশী খাবার। সুধীর ভাল বলিয়ে, নানা প্রসঙ্গে আলাপ করল রানার সাথে, কিন্তু কেন যেন অনামনস্ক হয়ে পড়েছে কণিকা। ডিনারের শেষ দিকে হঠাৎ মুখ তুলে জানতে চাইল সে, ‘আচ্ছা, কথাটা আপনাকে কে বলেছিল বলুন তো?’

‘কি কথা?’ অবাক হয়ে তাকাল রানা।

‘শক্ষিক যে এই বাড়ি ভাড়া করেছিল...

‘কি বললি ?’ অবাক হয়ে জ্ঞানতে চাইল সুধীর । পরমুহূর্তে রানার দিকে তাকাল সে । ‘কোথেকে শুনেছেন আপনি ?’

‘একজন চীনা মেয়ের কাছ থেকে,’ বলল রানা । ‘মেয়েটার সাথে হোটেল কসমোপলিটানে পরিচয় হয় আমার । ওই হোটেলেরই তো বউকে নিয়ে কিছুদিন ছিল শক্ষিক ।’

‘এই রকম একটা ভিত্তিহীন কথা বলার কি মানে হতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না ।’ বিরক্তিতে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কণিকার ।

কাঁধ ঝাকাল রানা । ‘এ ধরনের একটা কথা কেন যে বলল আমিও বুঝতে পারছি না ।’ আরো কি বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কে যেন লক্ষ্য করেছে ওকে । অলস ভঙ্গিতে টেরেসের চারদিকে তাকাল ও । ওর সামনেই বড় একটা আংনা, তাতে ওর পিছন দিকটাও দেখা যাচ্ছে । উঁচু জমির খানিকটা অংশ ধরা পড়েছে আয়নার, সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা । শরীরটা শক্ত-সমর্থ । পরনে স্যুট । আয়নার দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা, কলে চোখাচোখি হল । উঁচু জমির অন্ধকার অংশে সরে গেল সে ।

‘আপনি তো নতুন এখানে, তাই জ্ঞানেন না—হঙকঙের চীনারা সাংবাদিক মিথ্যাবাদী ।’ জ্ঞানদানের সুরে বলল কণিকা । ‘বিশেষ করে চীনা মেয়েরা ।’ উঠে দাঁড়াল সে । রানার দিকে ফিরে বলল, ‘চলুন, আমরা লনে গিয়ে বসি ।’

সুধীরও উঠল । ‘আমাকে কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে ।’

টেরেস থেকে উঁচু ফাঁকা জমিতে নেমে এল কণিকা আর রানা । ঘাসের ওপর আগেই চেয়ার পাতি ছিল, সেখানে বসল দু’জন ।

মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। সাগরের পানিতে চিক চিক করছে চাঁদের আলো। ওদের চারদিকে আবছা অন্ধকার, দূরের গাছ-গুলোকে ভুহুড় লাগছে। আশপাশে কোথাও কিছু নড়তে দেখল না রানা। লোকটা কি তাহলে চলে গেছে? কোথায় যেতে পারে? পিছন দিক দিয়ে বাড়ির ভেতর?

‘নির্ন।’ সম্ভিত ফিরল রানার। ঘাড় কিরিয়ে দেখল, ছইকির গ্রাস ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করছে কণিকা।

হাতে গ্রাস নিয়ে শান বাঁধান ঘাটের ওপর এসে দাঁড়াল ওরা। চাঁদের আলোর সাগরের দিকে তাকিয়ে ছ’জনেই চুপ করে আছে। অনেকক্ষণ পর নিঃশব্দতা ভাঙল কণিকা। ‘কতদিন হয় দেশের মুখ দেখিনি।’

‘ফিরলেই পারেন,’ বলল রানা।

‘দেশে আছেই বা কে যে ফিরব।’ উদাস গলায় বলল কণিকা ‘তাছাড়া, আমরা ভাই-বোন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকিনি কখনও। আমি চলে গেলে সুদীরের অসুবিধে হবে।’ খানিক পর প্রসঙ্গ বদলে দূর পাহাড়ের দিকে একটা হাত তুলল সে। ‘দেখুন, চাঁদের আলোর কেমন হুন্দর দেখাচ্ছে ওদিকটা।’

এই রক্তম হঠাৎ হঠাৎ আরো কয়েকবার প্রসঙ্গ বদল করল কণিকা। কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও, রানা বুঝল, যে-কোনো কারণেই হোক মনটা অস্থির হয়ে আছে কণিকার।

একটু পরই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুধীর। অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা চেয়ে বোটে চড়ে সাগরে বেড়াবার প্রস্তাব দিল সে। ভাব দেখে মনে হল রানাকে নিয়ে সময়টা কাটাবার ইচ্ছে ছিল কণিকার, কিন্তু ভাইকে নিরাশ করা হবে বলেই সম্ভবত

মুখ কুটে কিছু বলল না।

ডাইভারের সীটে বসল সুধীর। পিছনে পাশাপাশি বসল রানা আর কণিকা। ইঞ্জিনটা বড় বেশি আওয়াজ করে, তাই কথা বলার চেষ্টা করল না ওরা। দূর সাগরের দিকে চোখ রেখে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল কণিকা। রানাও নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। পিয়া মিথ্যে কথা বলেছে, এখনও তা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। ওর ধারণা, ঠিক খবরটা জানা নেই নন্দীদেব, কিংবা এরাও হয়ত হোটেল কসমোপলিটানের সেই বুড়ো রিসেপশনিষ্ট ক্লার্কের মতো মিথ্যে কথা বলেছে। মিথ্যে কথা বলেছে... কিন্তু কেন?

অদ্ভুত সুন্দর একটা গ্রাম এবারডীন। ঘাটের মুখে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা আর মোটর বোটে গিজগিজ করছে, কাছে বেঁধা সম্ভবই নয়। চীনারা সপরিবারে বেড়াতে এসেছে। ঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর ফেলল সুধীর। তেরো বছরের একটা চীনা কিশোরী তার সাম্পান নিয়ে ক্ষুণ্ণ চলে এল বোটের কাছে। সাম্পানে চড়ে তীরে পৌঁছল ওরা। টাঁদের আলোর আঁকা ছবির মতো লাগল গ্রামটাকে। মেঠো পথ ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। ক্লাস্তির অজুহাত তুলে ফেরার প্রস্তাব দিল কণিকা। আবার তীরে কিরে এসে সাম্পানে চড়ল ওরা।

সাম্পানেও রানার পাশে বসল কণিকা। অনেকক্ষণ পর কথা বলল সে, 'এদিককার দ্বীপগুলোয় গেছেন কখনও?'

'না।'

'তাহলে বলুন, কাল আপনি সময় করতে পারবেন কিনা?' অস্ত-ম্লান হয়ে বলল কণিকা। 'কাল আমি সিলভার-মাইন-বে-র এক-

জনের সাথে দেখা করতে যাব, ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারেন। ওখানকার জলপ্রপাতটা ভারি সুন্দর, দেখলে ভুলতে পারবেন না। যাবেন নাকি? ইচ্ছে করলে আপনি আমার সাথেই ফিরতে পারেন।’

‘আমার হাতে অটেল সময়...’

‘সিলভার-মাইন-বে-তে কার সাথে দেখা করতে যাবে কণিকা, জানেন, মিঃ ডিউক?’ সকৌতুকে বলল সুধীর। ‘সে এক ইতিহাস। আমার বোনের মনটা না সাংঘাতিক কোমল। শুধু তাহলে। প্রথম যখন এখানে আসি আমরা, সে-সময় এক মহিলা আমাদের ঘর-দোর পরিষ্কারের কাজ করে দিত। এখন তার বয়স হয়েছে, সেই বুড়িকে মাসে একবার করে দেখতে যায় কণিকা, এটা সেটা দিয়েও আসে।’

বোটে চড়ল ওরা। ইঞ্জিনের আবার সেই বিকট আওয়াজ। আবার ওরা কথা বলার সুযোগ পেল নন্দীদের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে। উষ্ণ আতিথেয়তা আর ডিনারের জন্যে ওদেরকে ধন্যবাদ জানাল রানা। নন্দীরাও জানাল, ডিউকের সঙ্গে লাভ করে তারা আনন্দ পেয়েছে। বিদায় নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল কণিকা। ঘাট থেকে আবার বোটে চড়ল ওরা। সুধীর পৌঁছে দেবে রানাকে সৈকতে।

সৈকত থেকে পায়ে হেঁটে রিপালস বে হোটেলে ফিরল রানা। সেই চীনা লোকটার মুখ এখনও ভুলতে পারেনি ও। বিশেষ সতর্কতার সাথে পিছনটা লক্ষ্য করল ও। কিন্তু ওকে কেউ অহুসরণ করছে বলে মনে হল না।

হোটেলে ফিরে এসে সরাসরি নিজের কামরায় গেল না রানা। দরজার দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল বারে। কিন্তু আরনার

আসার পর থেকে বরাবর ওই হোটেলেই ছিলেন। একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেন....’

‘কি করত সে ?’

কাইলটা আবার একবার দেখে নিয়ে তেং ফান জানাল, ‘হওকও এসেছিলেন এক্সপোর্টার হিসেবে, কিন্তু আমার ধারণা কোন কাজই আসলে করতেন না তিনি। অন্তত আমার এই কাইলে কোন তথ্য নেই। চাকরি বা ব্যবসা করলে এখানে সেটার উল্লেখ থাকার কথা। বোব হয় সাথে কিছু টাকা-পয়সা ছিল, তাই দিয়ে চলতেন। অথবা দেশ থেকে টাকা আসত।’

‘কিন্তু আমি শুনেছি,’ বলল রানা, ‘হোটেল কসমোপলিটান ছেড়ে দিয়ে রিপালস উপসাগরের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল শফিক। লনফিনের বাড়িটা চেনেন আপনি ?’

ভুরু কুঁচকে বাড়ি পাঁচ সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তেং ফান। তারপর বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। ‘মিঃ শফিক লনফিনের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ? অসম্ভব। মাসে কম করেও ষোল শো পাউণ্ড ভাড়া ওটার, অত টাকা কোথায় পাবেন তিনি। বাড়িটার এখন মিঃ নন্দী আছেন, তাঁর আগে ছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক....’

‘ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন ?’ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল রানার। ‘ঠিক জানেন আপনি ? কিন্তু আমি শুনেছি মিঃ নন্দী বাড়িটা ভাড়া নেবার আগে ওটা নাকি খালিই পড়ে ছিল ?’

‘আরে না। ওই ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকেই তো বাড়িটা নিয়েছেন মিঃ নন্দী। ভদ্রলোকের নামটা এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। তাকে অবশ্য আমি কখনও দেখিনি।’

‘আরেকটা প্রশ্ন,’ বলল রানা। ‘চীনা মেয়েটাকে, মানে সুজি কোয়াওকে শফিক কি সত্যি বিয়ে করেছিল?’

‘সেটা বলতে পারবে এখানকার কাজী অফিস,’ তেং ফান ফাইলটা বন্ধ করে বলল। ‘আপনাকে আমি কাজী অফিসের ঠিকানাটা জানিয়ে দিচ্ছি...’

কাজী অফিসে চলে এল রানা। এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বিশাল বপু নিয়ে মস্ত এক চেয়ারে বসে আছেন, মাথার সিকের কাপড়ের ওপর রঙচঙে রেশমী সূতোর নকশা করা টুপি। খুব কম কথা বলেন। রানার আগমনের হেতু জানান পর নিঃশব্দে একটা ফাইল বের করলেন। সেটা থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা বের করে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

সার্টিফিকেট দেখে কয়েকটা তথ্য জানতে পারল রানা। বছর খানেক আগে সুজি কোয়াওকে বিয়ে করেছিল শফিক। ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিল একজন বাঙালী লোক, এবং একজন চীনা মেয়ে। বাঙালী লোকটার নাম শহীদ আশরাফ। চীনা মেয়েটার নাম ইসি তাহি।

রানার প্রশ্নের উত্তরে কাজী সাহেব বললেন, ‘এই বাঙালী ভদ্রলোক শহীদ আশরাফ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। সম্ভবত মিঃ শফিকের কোন বন্ধু হবেন। ভদ্রলোককে আগে বা পরে কখনও দেখিনি আর।’

‘ইসি তাহি?’

‘এর সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না, মিঃ ডিউক। হুঃখিত। সাধারণত পরে আর সাক্ষীদের কোন দরকার হয় না, তাই ওদের ঠিকানা রাখার নিয়ম নেই।’

আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল ও। সাকী হৃৎকনকে খুঁজে বের করতে হবে। ইসি তাহি আর শহীদ আশরাফের সাথে কথা বলা দরকার। গাড়ি নিয়ে পুলিশ স্টেশনে চলে এল ও।

‘শহীদ আশরাফ ?’ টোবাকো পাইপে কষে এক টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন। ‘এই লোকটাকে আপনি খুঁজছেন ? কেন বলুন তো ?’

‘মীর শফিকুর রহমানের বিয়েতে একজন সাকী ছিল সে। আপনি লোকটাকে চেনেন ?’

‘ওধু চিনি তাই নয়, ওকে আমরা গুরু খোঁজা করছি,’ গম্ভীর স্বরে বলল জ্যাসন। ‘ও তা কুখ্যাত ড্রাগস স্মাগলার। ফাঁদ পেতে ধরার সব ব্যবস্থা শেষ করে এনেছি, এই সময় পালিয়ে গেল ব্যাটা। সম্ভবত ম্যাকাও বা ক্যান্টনে চলে গেছে সে

‘ওসব জায়গায় খোঁজ করেননি ?’

‘ম্যাকাওতে খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আর সুযোগ সুবিধের অভাবে ক্যান্টনে আমরা তার কোন খোঁজই নিতে পারিনি।’

‘শহীদ আশরাফ সত্যিই কি স্মাগলার ? মানে, তার বিরুদ্ধে স্প্রিন্টিং অভিযোগ আছে ?’

‘বড় একটা চোরাচালানী দলের হয়ে কাজ করেছে ও, এ-বাপারে কোন সন্দেহ নেই,’ দৃঢ়তার সাথে বলল চীফ ইন্সপেক্টর। ‘ক্যান্টন থেকে প্রচুর হিরোইন পাচার করা হয় হঙকঙে। বড় একটা চালানের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা।’ নিভে যাওয়া পাইপটা আবার

ধরাল সে। 'ইনকর্মার জানাল, চলতি মাসের পরলা তারিখে চালান আসছে। কাদ পাতলাম আমরা, কিন্তু কিভাবে যেন আগেই টের পেয়ে গেল আশরাফ, পালিয়ে চলে গেল সে।'

'এ-মাসের এক তারিখে --তার মানে, শফিকের মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগের ঘটনা।'

'হ্যাঁ...কিন্তু ছোটো ঘটনার সাথে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।'

'তা আছে কিনা জানি না,' বলল রানা। 'আমি শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করছি।' সিগারেট ধরাল ও। 'আচ্ছা, ইসি তাহি নামে কোন মেয়েকে চেনেন? এই মেয়েটাও শফিকের বিষয়ে সাক্ষী হয়েছিল।'

'ইসি তাহি?' অরণ করার চেষ্টা করল জ্যাসন। 'না।'

'আগলারদের সাথে শফিকের কোন রকম সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল কিনা বলতে পারেন?'

'ওর সম্পর্কে এ-লাইনে কখনও চিন্তা করিনি আমরা,' কাধ ঝাকাল জ্যাসন। 'সম্পর্ক থাকে বিচিত্র নয়। বিশেষ করে আশরাফের সাথে যখন বন্ধুত্ব ছিল।'

'হুঁ।' বিদায় নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ি নিয়ে চলে এল ওয়ানচাই সৈকত এলাকায়। এখানেই একটা গার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে মাদামের সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর।

বারে চুকে ভেতরটা আজ একেবারে খালি দেখল রানা। স্বচ আর সোডা নিয়ে বসল ও। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও যখন দেখল মাদামের কোন চিহ্ন নেই, মনে মনে ঠিক করল অন্য আরেক সময় আসবে তার খোঁজে। ঠিক এই সময় দরজার দেখা গেল মাদাম-

কে। রানাকে দেখে উজ্জল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা।
সোজা এগিয়ে এসে ওর টেবিলেই বসল সে। ‘আপনি আবার
এসেছেন, সেজন্যে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি সেদিন
মেয়েটার সঙ্গে পেয়েছিলেন—’

বাধা দিখে রানা বলল, ‘আপনি আমাকে ঠকিয়েছিলেন। ওর
নাম স্মৃতি তোয়াও ছিল না—’

‘সেজন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থী,’ সবিনয়ে বলল মাদাম। ‘কিন্তু স্মৃতি
কোয়াও না হোক, মেয়েটা দেখতে খারাপ ছিল তা আপনি বলতে
পারবেন না।’

‘যাক সেদিনের কথা আমি ভুলে গেছি,’ বলল রানা। সিগারেট
ধরাল ও। ‘আজ অন্য আরেকটা মেয়ের খবর চাই আমি। লক্ষ্য
করুন আমি সঙ্গ চাইছি না, খবর চাইছি। মেয়েটার নাম ইসি-
তাহি। চেনেন? না চিনলে তাও বলুন—ওধু উত্তর দেবার জন্যে
আপনাকে আমি পঞ্চাশ ডলার দেব।’

‘আর যদি পঞ্চাশ মারের ইসি তাহিকে আপনার সামনে হাজির
করতে পারি?’ লাভে চক চক করে উঠল মাদামের চোখ দুটো।

‘তাহলেও ওহ পঞ্চাশ ডলার।’

রাসের গুহুগুহু শেষ করে উঠে দাঁড়াল মাদাম। ‘ঠিক আছে।
ইসি তাহিকে পাবেন আপনি। আজ রাত আটটায়।’

‘তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ইসি তাহি।’

‘করবে,’ দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলে চলে গেল মাদাম।

কেরি-বোট। ফাস্ট ক্লাস ডেক। রেইলিঙের ওপর বুকো নিচে

বার্ড ক্লাসের আরোহীদের বিশৃংখল ঠেলাঠেলি দেখছে রানা।
 লোয়ার ডেকে ওঠার জন্যে মারামারি ছড়োছড়ি শুরু করে দিয়েছে
 চীনারা। দেখার মতো একটা দৃশ্য বটে আরোহীদের বাস্তবতা আর
 ছুটোছুটি দেখে মনে হয়, বোট বোধহয় এই ছেড়ে দিল আসলে
 বোট ছাড়তে এখনও পনের মিনিট বাকি। মিস্ত্রি আর কুলিরা
 কাঁধে, মাথায় বস্তা নিয়ে সার্কাস দেখাবার ভঙ্গিতে যেভাবে রেইলিং
 টপকাবার চেষ্টা চালাচ্ছে, দেখে মনে হয় ডেকে উঠতে না পারলে
 তাদের জীবনই বৃষ্টি বৃথা হয়ে যাবে। গ্রাম্য প্রায় সব চীনা মেয়ের
 পিঠেই একটা করে বাচ্চা বাঁধা, ধাক্কাধাক্কির প্রতিযোগিতায় তারাও
 কারো চেয়ে কম যায় না। এক জোড়া সুন্দরী চীনা যুবতীকে দেখল
 রানা, হুঁজনের কাঁধের মাঝখানে একটা বেতের ঝুঁড়ি ঝুলছে। তাতে
 বসে আছে একটা নাহুসনুহুস খাদী শুয়োর। তাদের সামনে রয়েছে
 একজন চীনা মা তার ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছে পাঁচ-ছয়
 বছরের একটা ছেলে, পিঠে তো আরেকটা আছেই গোটা পাঁচেক
 প্রায় একই বয়সের শিশুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রেলিংয়ের দিকে।
 ভিড়ের একধারে দাঁড়িয়ে আছে হুঁজন চীনা পুলিশ। নোমরে বাঁধা
 হোলস্টারে হাত, প্রতিপালকমূলভ সহনশীলতার সাথে এই দৃশ্য
 অবলোকন করছে।

ঘাড় কিরিয়ে ফাস্ট ক্লাসের সহযাত্রীদের দিকে তাকাল রানা।
 সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে একজন হুঁজন করে। বিড় তাদের মধ্যে কণি-
 কাকে দেখা গেল না। হঠাৎ জেটির দিকে নজর পড়তেই ছাঁগ করে
 উঠল রানার বুক। হাতে একটা ত্রীফ কেস নিয়ে জেটির কিনারায়
 দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পরনে কাল স্মাট, ফাস্ট ক্লাস ডেকেই উঠতে
 যাচ্ছে। এই লোকটাকেই কি আয়নায় দেখেছিল ও, নন্দীদের বাড়ির
 রানা-২৮

অন্ধকার লনে দাঁড়িয়ে ছিল । তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা । বছর চল্লিশেক বয়স হবে, বলিষ্ঠ শরীর । হাঁটার ভঙ্গিতে অ্যাথলেটের মতো স্বচ্ছন্দ একটা ভাব ফুটে আছে । আবছা অন্ধকারে দেখা চেহারাটা এখন আর পরিষ্কার স্মরণ নেই রানার, এই লোকটাই সেই লোকটা কিনা নিশ্চিত হতে পারল না ও । ওর পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল লোকটা । একটা সীটে বসে তাড়াতাড়ি মুখের সামনে থবরের কাগজ মেলে ধরে আড়াল করল নিজেকে ।

বোট ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হাজির হল কণিকা । পরনে লাল পাড়ের হলুদ তাঁতের শাড়ি । হাতে একটা বেতের ঝুড়ি । পাশাপাশি সীটে বসল ওরা । শুরুতেই ভারত আর বাংলাদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গ তুলল কণিকা, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নই তুলল না । অনেকক্ষণ আলাপ হল, কিন্তু শফিকের নামটা পর্যন্ত মুখে আনল না সে ।

‘পৌছে গেছি আমরা,’ সিলভার-মাইন ছেটিতে বোট ভিড়তেই সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কণিকা । ইশারায় হাতের ঝুড়িটা দেখিয়ে বলল, ‘ঝুড়ির হাতে দিয়ে আসতে হবে এটা । এখানে ফিরব ঠিক দেড় ঘণ্টা পর । এই ফাঁকে জলপ্রপাতটা দেখে ফিরে আসতে পারবেন আপনি । তার মানে, এখানেই আবার দেখা হবে আমাদের ।’

বোট থেকে নেমে পড়ল ওরা । জলপ্রপাতের পথটা দেখিয়ে দিল কণিকা । ‘এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, পথে বাটারফ্লাই লাহাড় পড়বে । তারপর একটা ব্রিজ । ব্রিজের ওপারেই ওয়াটার-ফল । সত্যি অদ্ভুত সুন্দর, দেখে মুগ্ধ হবেন ।’

‘এত সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হয়ে গেছে যে আমাকে মুগ্ধ করা সত্যি কঠিন,’ হালকা সুরে বলল রানা । ‘তবু আপনি যখন এত করে বলছেন, চেষ্টা করে দেখা যাক একবার ।’

মুখে একটু জোর করা হাসি টেনে বিদায় দিল কণিকা। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কিন্তু বেশি কণ নয়। সেই চীনা লোকটার সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাল ও। কিন্তু লোকটা কখন যে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় চলে গেছে, বুঝতে পারল না।

বিশেষ কোন ভাড়া নেই ওর, রোদের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে বাটারফ্লাই পাহাড়ের দিকে এগোল ও। মিনিট দশেক হেঁটে সাগর এলাকা ছাড়িয়ে এল। এদিকে পথটা একেবারে নির্জন, নিঝুম একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সামনের দিকে চলে গেছে। গ্রামটা পেরিয়ে এসেই হঠাৎ ওর ডান দিকে দেখল বাটারফ্লাই পাহাড়। সামনে ধূ ধূ মাঠ পড়ে আছে।

জায়গাটা একেবারে নির্জন দেখে অবাকই হল রানা। জল-প্রপাতের আওয়াজ পাচ্ছে ও, অথচ পথে কোন লোক নেই। চীনারা না বিশেষী ট্যুরিস্টরা এদিকে খুব কম আসে নাকি? জলপ্রপাতের কাছে চলে এল ও। কোথাও কোন লোকজন নেই। প্রপাতটা কিন্তু গতি সুন্দর। বেশ কিছুকণ তাকিয়ে দেখল রানা। ঠিক করল, আরো কিছুটা সময় এখানে থাকা যেতে পারে। রাস্তার ওপর গাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। ঠিক এই সময় এল আক্রমণ।

প্রথমে মোমাছির মতো একটা গুঞ্জন, বাতাসে শিস কেটে বিদ্যুৎ গতিতে কি যেন বেরিয়ে গেল কানের পাশ বেঁধে, পরমুহূর্তে কড়াৎ

রাইফেলের আওয়াজ। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল রানা, দ্রুত গড়ান দিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল মাটিতে। সাথে সাথে আবার গায়ে উঠল রাইফেল, ওর হ'গজ দূরে একরাশ ধুলো উড়ল। সেই ধুলোর ওপর দিয়েই গড়িয়ে রাস্তার ধারের উঁচু ঘাসের ভেতর চলে এল রানা।

কিন্তু আবার শব্দ হল রাইফেলের। এবার অস্ত্রের জন্যে বেঁচে গল

রানা, মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

বিপদের প্রকৃতিটা ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি করছে লোকটা? সাথে আর কেউ আছে? যদি থাকে, কোথায়? পাশে, নাকি উন্টো দিকে? এটা যে একটা সুপরিকল্পিত হামলা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে এখানে আসবে জেনে অপেক্ষা করছে রাইফেলধারী।

সারা শরীর ঘেমে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ঘাসের ভেতর দিয়ে ফ্রল করে এগোচ্ছে ও। মাথা নামিয়ে রেখেছে, মাটি ছুঁই ছুঁই করছে কপাল। বড় একটা পাথর পড়ল সামনে। সেটার আড়ালে চলে এসে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। অপেক্ষা করে দেখা যাক এরপর কি ঘটে।

আরো একটা গুলি হল। মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। লোকটা যেই হোক, পাহাড় থেকে গুলি করছে সে। রাইফেলের সাথে নিশ্চয়ই টেলিস্কোপিক সাইট ফিট করা আছে। গুলির আওয়াজ শুনে অনুমান করা যায়, অন্তত দিকি মাইল দূর থেকে ফায়ার করছে সে।

পয়েন্ট ব্লি-এইটটা সাথে করে নিয়ে আসেনি বলে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। হাফ-শাট আর স্ন্যাকস পরেছে বলে ওটা আর সাথে করে নিয়ে আসা হয়নি। এখন আর ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে না ও। দ্রুত চিন্তা করছে। কোথায় রয়েছে ও, লোকটা জানে। করার মধ্যে এইটুকু করতে হবে তার, ও দেখা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। পিছু হটে পালাবার কোন পথ আছে কিনা দেখার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাথাটা একটু তুলল ও, তাকাল পিছন দিকে। কড়াং করে গর্জে উঠল রাইফেল। মাথা নিচু করে নিল রানা।

বা সন্দেহ করেছিল, তাই। রাইফেলধারী একজন নয়, দু'জন। কমপক্ষে দু'জন। শেষ গুলিটা এল রানার পিছনে বাম দিক থেকে। বেশ কাছেই রয়েছে দ্বিতীয় লোকটা।

পোশাক দেখেই ধরে নিতে পেরেছে তারা, ওর কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। দূরের গুলিগুলো ব্যর্থ হওয়ায় এখন তারা সামনে এসে গুলি করবে। এতক্ষণ বোধহয় রওনাও হয়ে গেছে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট। ছেটিতে একে দেখতে না পেয়ে কণিকা কি ওর খোঁজে এদিকে আসবে? ধরা থাক, আসবে। সে যদি এদের সামনে পড়ে যায়, ওর মতো তাকেও কি খুন করার চেষ্টা করবে তারা?

সম্পূর্ণে জ্বল করে পাথরের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রানা। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপের মতো নিঃশব্দে নেমে আসছে পাহাড়ের নিচের দিকে। এভাবে পাঁচ মিনিট পিছিয়ে এল ও। আগের জায়গা থেকে প্রায় একশো ফিট সরে এসেছে। একটু একটু করে মাথা তুলে আগের জায়গাটা দেখার চেষ্টা করল ও। লাখে লাখে বাতাসে শিস কেটে, মুখের পাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট, সেই সাথে শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ। আবার মাটিতে কপাল ঠেকাল রানা। এই প্রথম একটা শিরশিরে অমুভূতি জাগল শির-দাঁড়ার কাছে। ধীরে ধীরে একটা গড়ান দিতে শুরু করল ও। জাগ্রাস শুরু করেছিল, তা না হলে লাশ হয়ে যেত ও। পুরো এক গড়ান দেয়া শেষ হইনি, আগের জায়গায় একটা বুলেট এসে লাগল। আন্দাজ করে ছোঁড়া গুলি, কিন্তু ঠিক লক্ষ্যেই ভেদ করেছে—সরে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেল রানা।

আরো খানিক ডান দিকে সরে এল ও। লম্বা ঘাসের শেষ সীমা-

নার চলে এসেছে বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আর মাত্র চারকিট সামনে উন্মুক্ত পাথুরে জমি, খানিক দূর সমতল বটে, কিন্তু তারপর হঠাৎ ডেবে গিয়ে একটা ঢালের সাথে মিশেছে। ঢালটা প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে, সম্ভবত পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে নিচের উপত্যকায়।

নিঃসাড় পড়ে আছে রানা। কান দুটো সজাগ। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। কি ঘটছে দেখারও কোন উপায় নেই। মাথা না তুলে দেখবে কিভাবে ?

একটা কান মাটির সাথে সঁটে রাখল ও। কয়েক মিনিট কিছুই শুনতে পেল না, কিন্তু তারপরই পরিষ্কার আওয়াজ পেল। আন্দাজ পনের কি বিশ গজ দূরে, ওর বাম দিকে রয়েছে লোকটা। লম্বা ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এখন আর নিঃসাড় পড়ে থাকার উপায় নেই। কিছু একটা করা দরকার ওর। তা না হলে সোজা ওর ঘাড়ে এসে পড়বে লোকটা।

ঠিক কাথায় আছে লোকটা, বুঝতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু সঠিকভাবে তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে অন্তত এইটুকু জানে ও, কোন্ দিক থেকে আসছে সে। ইতি কৰ্তব্য স্থির করতে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সময় নিল ও। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সটান, দ্রুত লাফ দিল প্রথমে ডান দিকে তারপর বাঁ দিকে। প্রথম লাফটা শুধু দিয়েছে রানা, খেয়াল করল, গুলির শব্দ হল দূরে। কয়েক গজ দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। দ্বিতীয় লাফটা দেয়ার আগেই, মাত্র ছয় ফিট দূরে, ঘাসের ভেতর ক্ষীণ একটা নড়াচড়া দেখতে পেল ও। দ্বিতীয় লাফের সাথেই ছুটল সেদিকে।

রু রঙের কোট আর ট্রাউজার পরা একজন চীনা, মাথায় সুতী কাপড়ের টুপি, ঘাসের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রানার মুখের

ওপর হাসল। লোকটা বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, শক্ত-পোক্ত শরীর। তার হাতে ধরা ছুরির ফলাটা ঝিক্ করে উঠল রোদ লেগে। উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু তাকে স্থির হবার কোন সুযোগই দিল না রানা। ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, একটা হাত বাড়াল তার গলার দিকে, অপরটা ছুরি ধরা হাতের কজির দিকে।

লোকটাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, শক্ত মাটির উপর দড়াম করে পড়ে গেল ছ'জনে। লোকটার কজি আর গলা আগেই ধরে ফেলেছে রানা। ওর চোখের ভেতর আগুল ঢোকাবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু তার নাকের ওপর হাতুড়ির বাড়ির মতো বার কয়েক কপাল ঠুকতেই কান্ড হল সে। ছুরিটা হাত থেকে কেড়ে নিল রানা। দমাদম কয়েকটা ঘুঁসি চালাল তার পেটে। গোঙাতে শুরু করল লোকটা। শক্ত কিছুটা কাবু হতেই ছ'হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরল রানা। শরীরটা রানার নিচে মোচড় খেতে শুরু করল, কিন্তু বেশি কণ স্থায়ী হল না সেটা। বিস্ফারিত গোধ জোড়া একটু পরই স্থির হয়ে গেল। গড়িয়ে তার ওপর থেকে নেমে পড়ল রানা। একটু একটু হাঁপাচ্ছে ও। মাথা তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। প্রথম লোকটা বোধহয় পাহাড় থেকে নেমে আসতে শুরু করেছে। কিছুটা ফাঁকা মত জায়গায় সরে গেল রানা, অজ্ঞান লোকটাকে মাটিতে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল সাথে।

জ্ঞান ফিরে আসছে চীনাম্যানের। একটু নড়ে উঠতেই রানা ওর দিকে মনোযোগ দিতে যাবে, এমনি সময় এক লাফে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ধস্তাধস্তির সময় মাথার টুপিটা পড়ে গেছে। সেই জন্যেই চিনতে পারল না ওকে প্রথম জন। একটা রাইফেলের আও-রাজ হল। সাথে সাথে চীনাম্যানের মুখটা রক্তের একটা লাল মুখোশ

হয়ে গেল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল লাশটা ঘাসের ওপর। ক্রল করে পনের ফিট পিছিয়ে এল রানা।

এখন শুধু অপেক্ষা। মাঝে মধ্যে মাটিতে কান পাতছে সে। কোন শব্দ নেই। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হল। ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেল। এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল রাইপার।

ষষ্ঠেই আত্মবিশ্বাস আর বেপরোয়া ভাব নিয়ে নেমে এল লোকটা। ধরেই নিচ্ছে প্রতিপক্ষ মারা গেছে, অথবা, অস্বস্তি করার সাধ্য তার নেই। সামনের ঘাস সামান্য একটু ফাঁক করে পাহাড়ের বেশ স্থানিকটা বংশ দেখতে পেল রানা, ওদিক থেকেই শেষ গুলিটা এসেছিল। দ্রুত, হন হন করে নেমে আসছে লোকটা। রাইফেলটা বগলে। আরো কাছে চলে এল সে। মনের সন্দেহটাই সত্যি হল। বছর চল্লিশেক বয়স হবে, বলিষ্ঠ গড়ন, লোহার মতো শক্ত শরীর। এই লোকটাকেই নন্দীদের বাড়ির আয়নায় দেখেছিল রানা। আজ রানার সাথেই এসেছে বোটের করে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্রুত কয়েকটা কথা ভেবে নিল রানা। এই নির্জন দ্বীপে আসার প্রস্তাবটা এসেছিল কণিকার তরফ থেকে। নন্দীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ওকে। এই লোকটা সেখানে ছিল ওকে দেখে চিনে নেবার জন্যে। তার মানে এটা একটা সুপরিকল্পিত ফাঁদ। ওকে জীবিত ফিরতে দেবার কোন ইচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীদের নেই।

যে গতিতে এগিয়ে আসছে লোকটা, পৌছতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না তার। গড়ান দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। ছুরিটা তুলে নিল লাশের পাশ থেকে। লম্বা ঘাসের ভেতর কোথায় পড়ে আছে

রাইফেলটা, দ্রুত মাত্র একবার খোজার সময় পেল রানা, কিন্তু পাওয়া গেল না সেটা। রাইফেলের বদলে বড় আকারের একটা পাথর পেল ও। সেটাও তুলে নিল হাতে। তারপর সরে গেল বেশ কিছুটা ডাইনে।

মেরঠো পথের ওপর চলে এসেছে লোকটা। হাঁটার গতি আগের চেয়ে অনেক মন্থর। তার আর রানার মাঝখানে গজ বিশেক উচু ঘাসের ব্যবধান। রানার কাছে আসার আগে নিজের সঙ্গীর লাশের কাছে আসতে হবে তাকে।

মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে আছে রানা। ডান হাতে পাথর, বাঁ হাতে ছুরি।

আতকে ওঠার মূহু আওয়াজ পেল রানা। সাবধানে মাথাটা একটু তুলল ও। সঙ্গীর লাশ দেখতে পেয়েছে লোকটা। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে, তারপর ঝট্ করে মাথা তুলল সে। পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা। বগল থেকে পিছলে নেমে এল রাইফেল লোকটার হাতে। রানাও পাথর ছুঁড়ল, সে-ও টিগার টিপে দিল। ছুটে গিয়ে লাগল বটে পাথরটা, কিন্তু তাতে পুরোপুরি লক্ষ্যচ্যুত হল না বুলেট। রানার কাঁধের খানিকটা চামড়া ছিলে নিয়ে গেল। পাথরের ছুঁচালো দিকটা লোকটার ডান হাতের কোথাও গিয়ে বিঁধেছে, ব্যাথায় কুঁচকে উঠেছে ওর মুখ, হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেল। ঝুঁকে পড়ে আবার সেটা তুলতে যাচ্ছে সে, এই সময় চিত্তা বাঘের গতিতে তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা।

রানাকে উড়ে আসতে দেখে শরীরের একটা পাশ দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। নিরেট পাথরের একটা দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল যেন রানা। পা ছটো ফাঁক করে নিয়েছিল লোকটা, থাকাটা যাতে

সামলাতে পারে। বিদ্যুৎ গতিতে উঠে এল একটা হাত, লোহার মতো শক্ত আঙ্গুল দিয়ে রানার কজি ধরে ইঁচকা টান দিল সে। শূন্যে এক পাক ডিগবাজী খেয়ে লোকটার মাথার ওপর দিয়ে ওপারে গিয়ে দড়াম করে শক্ত মাটিতে পড়ল রানা। মাটির সাথে সংঘর্ষে দম আটকে এল ওর। অনুভব করল, ছুরিটা খসে গেছে হাত থেকে। সেই সাথে বুঝল, পাহাড়ের সাইডে পড়েছে ও, ঢালের ওপর। হাত পা টিল করে দিয়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল, সাথে সাথে দ্রুত গতিতে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। কিন্তু একই সময়ে শক্ত শুনে বুঝল, লোকটাও ওর গড়িয়ে পড়া শরীরটাকে ধাক্কা করে ছুটে নেমে আসছে। প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো নেমে এসে নরম মাটির স্পর্শ অনুভব করল রানা। পায়ের আঙ্গুল মাটিতে গেঁথে শরীরটাকে ধামাল ও। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মাথা ঘুরছে, ইঁপাচ্ছে ঘন ঘন। মাথা একটু তুলতেই লোকটাকে দেখতে পেল। বড়সড় মুখে শঙ্ক-হীন নির্ভর এক টুকরো হাসি ফুটে রয়েছে। কিন্তু হাতে রাইফেল নেই।

ঢালের নিচের দিকে রয়েছে রানা, ওর জন্যে এটা একটা মস্ত বেকায়দা অবস্থা। তবে, রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই পৌঁছে যাবে মনে করে লোকটা ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে, এখন আর গতি রুদ্ধ বা মন্থর করার কোন উপায় নেই তার। ঠিক এক সেকেন্ড আগে উঠে দাঁড়াল রানা, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সীং করে সরে গেল এক পাশে। পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার আগে রানাকে ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার বাঁকা আঙ্গুলগুলো রানার কনুইয়ের ওপর থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে পিছন ফিরল রানা, ঝেড়ে একটা লাথি বসল লোকটার চওড়া পিঠের ঠিক মাঝখানে, শির-

দাঁড়ার ওপর। ছোট্ট গতি তিন গুণ বেড়ে গেল লোকটার, তাল হারিয়ে ফেলল, মুখ খুবড়ে পড়ল মাটির ওপর। সে তিনেক ওজনের আরেকটা পাখর দেখতে পেয়ে তুলে নিল রানা, প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। ঘাড়ের ওপর মাথার পিছন দিকটার লাগল সেটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল সাথে সাথে। ঢাল বেয়ে ক্রান্ত নেমে যাচ্ছে শরীরটা, হাত-পা ছুঁড়ছে এলোপাখাড়ি।

একটু দম নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। জানে, লোকটা আর কখনও ওকে বিরক্ত করবে না। সিলভার-মাইন ছেটির দিকে এগোল ও।

বয়

ওয়ারান চাই সৈকতের বারে ঠিক আটটার পৌঁছল রানা। নানা দেশের খালানীদের ভিড়ে গিজ গিজ করছে ভেতরটা। প্রায় সবার সাথেই একটা করে চীনা ললনা রয়েছে। নাচেছে তা ঠিক বলা যায় না, দল বেঁধে হুল্লোড় করছে বলাই ভাল। হৈ চৈ আর ছুটোছুটির সাথে তাল দিয়ে বাজছে ইংরেজী মিউজিক। এই ভিড়ের মধ্যে মাদামকে কিভাবে খুঁজে বের করা যায় ভাবছে রানা, এই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল একটা হাসি মুখ। রানাকে পথ দেখিয়ে একটা খালি কেবিনে নিয়ে এল মাদাম। সে-ই অর্ডার দিল—রানার জন্যে স্কচ হুইস্কি, নিজের জন্যে দুধ।

‘একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,’ ওয়েটার চলে যেতে চিন্তিতভাবে বলল মাদাম। ‘আপনাকে সঙ্গ দিতে ইসি তাহির কোন আপত্তি।’

হিন্দি, কিন্তু সে আপনার সাথে তার ক্র্যাটে দেখা করবে।’

আরেকটা কাদ ১ মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। বিকেলের ঘটনাটা ওকে শুধু যে সতর্ক করে দিয়েছে তাই নয়, একটু ভয়ও পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে, কাঁধে ব্যাগেজ বেঁধে নিজের হোটেল রুম থেকে বেরবার আগে পয়েন্ট থ্রি-এইটটা সাথে নিতে ভুল করেনি ও। আলতো ভাবে চাপ দিয়ে সেটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল ও। ‘কোথায় যেতে হবে আমাকে?’

‘কাছেই। আমি ট্যাক্সি ডেকে বলে দেব ড্রাইভারকে।’

‘কিন্তু জানব কিভাবে মেয়েটা ইসি তাহি কিনা?’

‘ওর সাথে পরিচয় পত্র আছে।’

খানিক চিন্তা করে রাফি হয়ে গেল রানা। ‘ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে টাকা দেবার আগে আমাকে বুঝতে হবে মেয়েটা ইসি তাহি কিনা।’

‘বেশ,’ শর্তটা মেনে নিল মাদাম। ‘চলুন তাহলে, আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিই। টপ ফ্লোরের থাকে ইসি তাহি, দরজায় নেম-প্লেট আছে।’

বাইরে বেশ গরম। স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রানাকে পিছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল মাদাম। একজন ড্রাইভারের সাথে চাপা গলায় কথা বলল। সম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল ড্রাইভার। রানার দিকে ফিরল মাদাম। ‘উঠে পড়ুন, ড্রাইভার আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।’

রানার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুচকি একটু হাসল ড্রাইভার। হাসি মুখে রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অভয় দিল মাদাম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল বারের ভেতর। গম্ভীর চেহারা নিয়ে

ট্যান্ড্রিতে চড়ল রানা। ডাইভার ওর গান্ধীর্ষের তাৎপর্য বুঝতে পেরেই সম্ভবত কোন রকম আলাপ জমাবার চেষ্টা করল না।

মাত্র ছয় মিনিটের পথ। একটা ছুয়েলারী দোকানের সামনে থামল ট্যান্ড্রি। রানাকে দোকানের পাশের একটা গেট দেখিয়ে দিল ডাইভার। নিচে নেমে ভাড়ার সাথে মোটা টিন্স দিল রানা। ডাইভারের চেহারায় বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠতে দেখেও গান্ধীর্ষের মুখোশটা একটু বদলাল না রানার মুখে। ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল ও, গেটের দিকে এগোবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না ওর মধ্যে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার স্টাট দিল ডাইভার; ট্যান্ড্রি নিয়ে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল সেটাকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। রাস্তায় এবং ফুটপাথে প্রচুর মানুষ আর যানবাহনের ভিড়। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। কেউ রানার ওপর নজর রেখেছে কিনা বলা কঠিন। তবু চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকল সে। সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে এলিভেটর। এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লারে উঠে এল ও।

ল্যান্ডিংয়ের দু দিকে দুটো দরজা। একটার মাধ্যম ছোট ছোট লাল রঙের হরফে লেখা নাম-ফলক—ইসি ভাণ্ডি। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল রানা।

প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে বাইরে উকি দিল একটা সুন্দরী চীনা মেয়ে। বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। পরনে ক্রীম কালারের সিল্কের ব্লাউজ, ধূসর রঙের গাউন, পায়ে হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডেল। একরাশ কালো চুল খোঁপা করে বাঁধা, পিছন দিকে তাক্সা ছোটো গোলাপ গুঁজেছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

‘মাদাম পাঠিয়েছে আমাকে, আমি ডিউক,’ বলল রানা।

মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল মেয়েটার। হাসিটা আরো সুন্দর। ‘আমুন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।’

বসার ঘরটা মাঝারী আকারের। হাঙ্গা, কিন্তু আধুনিক কাণিচার দিয়ে সাজানো। জানালার বাইরে সাগর দেখা যাচ্ছে, টিম টিম জ্বলছে সাম্পানের আলো। দরজা বন্ধ করে ঘুরল মেয়েটা। ধীর পায়ে এগিয়ে এল রানার দিকে। হাঁটার মধ্যে কোনরকম জড়তা নেই। মুখের হাবভাবও বেশ সপ্রতিভ।

‘তুমি কে?’ জানতে চাইল রানা। ‘তোমার নাম কি?’

‘ইসি তাহি।’ রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা, হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল বুকের ওপর।

‘প্রমাণ?’

ভুরু ছোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠলেও প্রশ্নটা শুনে খুব যে অবাক হয়েছে তা মনে হল না রানার। মানাম বোধহয় আগেই সাবধান করে বলে দিয়েছে, এ-ধরনের প্রশ্ন হতে পারে।

ইঙ্গিতে টেবিলের দেরাজটা দেখাল মেয়েটা। ‘ওখানে আমার পরিচয়-পত্র আছে। কিন্তু ওগুলো বের করার দরকার আছে কি? আমার মুখের কথাই কি যথেষ্ট নয়?’

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেরাজটা খুলল রানা। ভেতরে একটা এনভেলোপ রয়েছে। এনভেলোপের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে পরীক্ষা করল ও। ইসি তাহি হওকঙে এসেছে বছর পাঁচেক আগে। বয়স চব্বিশ। পেশা—নর্তকী। কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে মেয়েটার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল রানা। সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, ‘আমি তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে আসিনি। এসেছি কিছু ওখা জানার জন্যে। অবশ্য তোমার যা পাওনা তার

চেয়ে কিছু বেশিই দেব আমি, কিন্তু তথ্যগুলো নির্ভুল হওয়া চাই।’

এবার নির্ভেজাল বিস্ময় স্কুটে উঠল মেয়েটার চেহারায়। ‘তথ্য ?’

‘তুমি মীর শফিকুর রহমান নামে কাউকে চেন ?’

‘এই নামের একজন মারা গেছে, আপনি তার কথা জানতে চাইছেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘চিন্তাম। কেন ?’

‘ওর স্ত্রী, সুজি কোয়াণ্ডকে ?’

‘অবশ্যই। সুজি আমার একমাত্র বান্ধবী। ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম আমি। কিন্তু এ সব প্রশ্ন...’

‘বলতে পার, হঠকণ্ডে কি কাজ করত শফিক ? তার চলতো কিভাবে ?’

মান হয়ে গেল ইসি তাহির চেহারা। তারপর মুখ তুলে মূহ গলায় বলল, ‘বেচারী সুজির কপালটাই মন্দ। দেখে শুনে এমন একটা বিদেশী লোককে বিয়ে করল, যে স্ত্রীর রোজগারে খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। সুজি বলত বটে শফিক নাকি বিরাট ধনী লোকের একমাত্র ছেলে, কিন্তু আমি কথাটা কোন দিন বিশ্বাস করিনি। ভিথিরী ছাড়া কিছুই মনে হত না ওকে আমার।’

‘আচ্ছা, আমি শুনেছি, শফিক নাকি ড্রাগস অ্যাগলিঙের ব্যাপারে জড়িত ছিল,’ মূহ গলায়, হাফা সুরে বলল রানা। ‘তুমি কিছু শুনেছ ?’

শিউরে উঠল মেয়েটা। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকাল রানার দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল, ‘অ্যাগলার, অ্যাগলিঙ এসব ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এসব ব্যাপারে আমি কোন খবর রাখি না।’

‘আমাকে ভুল বুঝছ তুমি,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা। ‘তুমি এসবের সাথে জড়িত, তা আমি বলছি না। আচ্ছা, তুমি জান, ক্যান্টন থেকে প্রচুর গিরোইন চালান দেয়া হয় হঙকঙে ?’

‘না।’ জোর গলায়, প্রতিবাদের সুরে বলল ইসি তাহি। ‘জানি না।’

‘শহীদ আশরাফকে চেন তুমি, তাই না ?’ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল রানার। ‘সে কিন্তু এই চোরাচালানের সাথে জড়িত, জান নিশ্চয়ই ?’

‘না।’ পরমুহুর্তে রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন খুঁজল ইসি তাহি। ‘শহীদ আশরাফ ? ইয়া, চিনি। কিন্তু তাকে আমি একবার মাত্র দেখেছি সুজির বিয়েতে।’

‘শফিকের বন্ধু ছিল, নাকি সুজির ?’

‘সুজির বন্ধু ? মনে হয় না। শফিকের সাথে কি সম্পর্ক ছিল তাও আমি জানি না।’

‘রিপালস্ উপসাগরের কাছে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল শফিক, জান ?’

‘রিপালস্ উপসাগরের কাছে বড় বাড়ি ?’

‘ইয়া। লনফিনের বাড়িটা। ওমপঙ পিয়ার কাছ থেকে শুনেছি আমি।’

হঠাৎ তাজিলোর সাথে হাসল ইসি তাহি। ‘হাসালেন। আগেই তো বললাম শফিক একটা ভিথিরী ছিল, লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেবে কোথেকে। বিয়ের পর হোটেল কমমোপলিটানে ছিল সে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিল।’

লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেয়নি শফিক, সবাই এই একই কথা।

বলছে, শুধু ওমপঙ পিরা ছাড়া। তবে কি সবাই সত্যি কথা বলছে, শুধু মিথ্যে কথা বলেছে পিরা? ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না রানা।

জানতে চাইল, ‘সুজি কোয়াও তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, ওর সম্পর্কে বা জান সব বল আমাকে।’

‘ও তো ঢাকায় চলে গেছে। বলে গেছে চিঠি দেবে...’

‘তার মানে, খবরটা পাওনি তুমি?’

ভুরু কুঁচকে উঠল ইসি তাহির। ‘কি বলল?’

‘সুজি কোয়াও বেঁচে নেই। তাকে খুন করা হয়েছে।’

রক্তশূন্য ক্যাকাশে হয়ে গেল ইসি তাহির চেহারা। ‘অসম্ভব আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। খুন... অসম্ভব। কেন

‘কেন, তা জানি না। তবে জানার কোনোই হুকুমে এসেছি।’

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকা ইসি তাহির বাহুবীর মৃত্যু সংবাদ শুনে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে যে। মুখটা কুলে পড়ল। এখন আর মেয়েটাকে সুন্দরী লাগে না। প্রিয়জন হারাবার শোক সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে তার ভেতর থেকে উঠে আসছে একটা অদম্য কান্না। হৃদহাসে মুখ ঢেকে হঠাৎ কুঁপিয়ে উঠল সে।

‘তুমি চাও না সুজির খুঁজি ধরা পড়ুক?’ মগলায় জানতে চাইল রানা।

‘আপনি চলে যান।’ অজব্বাক কণ্ঠে বলল মেয়ে। ‘আমাকে একটু একা থাকতে দিন, প্লীজ।’

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ‘শান্ত হও। একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার। সুজি সম্পর্কে বা জান সব বল আমাকে...’

ইঠাং লাফ দিয়ে উঠল মেয়েটা, ছুটে চলে গেল পাশের কাম-
রায়। দ্রুত এগোল রানা, কিন্তু তার আগেই দড়াম করে ভেতর
থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

বন্ধ দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কয়েক-
বার অহুরোধ করল, কিন্তু ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর
কোন শব্দ এল না।

অগত্যা ক্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। একটু শব্দ করেই
সামনের দরজাটা বন্ধ করল ও। এলিভেটরে চড়ল। নেমে এল
নিচের তালায়। তারপর কয়েক পা হেঁটে সিঁড়ির গোড়ায় এসে
দাঁড়াল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা আওয়াজ পেল রানা।
ইসি তাহির ক্ল্যাটের সামনের দরজা খুলল কেউ, একটু পর আবার
সেটা বন্ধ হল। কয়েক সেকেন্ড আর কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দ পায়ে
দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা। ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ইসি তাহির
দরজার কান পাতল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবার আওয়াজ পেল
ও। তারপর শোনা গেল চাপা গলা। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে
ইসি তাহি। কি বলছে বুঝতে পারল না রানা।

এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে এল রানা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে
লোকারণ্যে মিশে গিয়ে রাস্তা পেরোল ও। রাস্তার এপারে সার সার
দোকান, শো-কেসের ভেতর সাজান রয়েছে অলংকার থেকে শুরু
করে সব রকম মণিহারী জিনিস। এই রকম একটা শো-কেসের সামনে
দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে রাস্তার উন্টোদিকের বাড়িটার ওপর
নজর রাখল ও। আন্দাজের ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করছে। ওর
সন্দেহ সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু মিনিট দশেক পর বাড়ির

গেটে ইসি তাহিকে দেখে সন্দেহের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল ওর।

গেট থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় লাফ দিয়ে একটা রিক্সা চড়ল ইসি তাহি। রাস্তার এপার থেকে রানাও একটা রিক্সা নিল। নানা রাস্তা ঘুরে সামনের রিক্সা একটা ট্যান্ডি স্ট্যাণ্ডে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যান্ডিতে চড়ল ইসি তাহি। একটু পিছনে থেকে রানাও ঠিক তাই করল।

স্টার ফেরী স্টেশনে এসে থামল সামনের ট্যান্ডি। নিজের ট্যান্ডিতে বসেই রানা দেখল, ফেরীর তৃতীয় শ্রেণীতে উঠল ইসি তাহি। ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ট্যান্ডি থেকে নেমে ঘাটে চলে এল রানা, প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে উঠে পড়ল ফেরীতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাউলুন সিটি জেটিতে পৌঁছল ফেরী বোট। জায়গাটা কাই তাক এয়ারপোর্টের কাছেই।

ফেরী থেকে নেমে রিক্সা নিল ইসি তাহি। রানার দুর্ভাগ্য, স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে একটাও খালি রিক্সা পেল না ও। সব মাত্র ঘাটে ভিড়েছে ফেরী বোট, ঠিক এই সময়টায় কোন রিক্সা খালি থাকার কথাও নয়। অগত্যা ছুটতে শুরু করল রানা। এরই মধ্যে চোখের প্রায় আড়ালে চলে গেছে ইসি তাহির রিক্সা।

ফুটপাথে ভিল বারনের জায়গা নেই, তার মধ্যে একজন লোক যদি কোথায় পা ফেলছে সেদিকে কোন খেয়াল না রেখে ছুটতে শুরু করে, তাহলে কি ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমের। রানার কাঁধের থাকা খেয়ে পথচারীরা অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ খেঁতলান পা ধরে কাতরাতে শুরু করল, কেউ পাঁজরে কনুইয়ের ওঁতো খেয়ে ককিয়ে উঠল। কিন্তু রেগেমেগে কেউই ধাওয়া করল না রানাকে। একজন বিদেশী লোক ছুটছে, ব্যাপারটা কৌতুক-

কর এবং কোডুহলোদীপক বলেই মনে হল তাদের কাছে। কেউ কেউ যে ওকে উন্মাদ বলে মনে করল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

একটা রাস্তার মুখে এসে থামল ইসি তাহির রিস্তা। রাস্তা ধরে হন হন করে এগোল ইসি তাহি। তারপর স্যাং করে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলির ভেতর। অনেকটা পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে রানা। মনে মনে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ল ও। ওদিকে কো-থায় যাচ্ছে তাহি? মাপ দেখে এবং লোক মুখে শুনে হতকণ্ঠের এই এলাকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোণ ধারণা না থাকলেও, যত্ন কু.জনেছে, ওর জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট।

এক গলি থেকে আরেক গলিতে ঢুকছে ইসি তাহি। প্রতিটি গলিতেই গিঞ্জ গিঞ্জ করছে মানুষ। রাস্তার দু'ধারে নোংরা ড্রেন, হুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। ড্রেনের ওপারে বড় বড় দোকান, হাজার রকম মাল-পত্রের ঠাসা। আরেকটা গলিতে ঢুকল ইসি তাহি। এখন আর কোন সন্দেহ নেই রানার মনে। এই গলি দিয়েই প্রাচীর ঘেরা কাউলুন শহরে ঢুকতে হয়।

হতকণ্ঠের এই এলাকাটা ক্রিমিন্যালদের একটা শক্ত ঘাঁটি। এ ঘাঁটি আজকের নয়, পুরোন আমলের। ব্রিটিশ পুলিশ এর ভেতর ঢুকতে পারত না। শাস্তি এবং আইন রক্ষক সংস্থাগুলো আজও এদিকে খুঁ একটা সুবিধে করতে পারে না। খুনী, ছিনতাইকারী, স্বাগলার আর নেশাখোরদের স্বাধীন রাজ্য এটা। তবে ইদানিং পুলিশের টহল এখানে জোরদার করা হয়েছে। কোন বিদেশী লোক-কে এই এলাকার বড় একটা দেখা যায় না।

ইসি তাহির পঁচিশ গজ পিছনে থেকে এগোচ্ছে রানা। এর মধ্যে একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি ইসি তাহি। অবশ্য প্রয়োজন

বলে এক নিমেষে গা ঢাকা দেবার অনেক উপায় জানা আছে রানার।
অন্যতঃ এই গলির ভেতর আত্মগোপন করা মোটেও কঠিন কিছু নয়।

রাস্তার লোকজন লক্ষ্য করছে রানাকে, কিন্তু কেউই তার পথ
রোধ করে দাড়াল না। এদিকের চীনারা প্রায় সবাই রুক্ষ চেহারার—
গুণ্ডা সুলিয়ে মুখে বেপরোয়া ভাব নিয়ে হাঁটে। কেউ কেউ ভাচ্ছিলোর
সাথে হাসল ওকে দেখে। কেউ কেউ ধোঃ ধোঃ করে ধু ধু ছিটাল ড্রেনের
ওপর। হু একজন আফিমখোর মাতাল হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর গারে।

গলিটা ধরে প্রায় সিকি মাইল এগোল মেয়েটা। তারপর একটা
দরজার সামনে থামল সে। ভিড়ান কব্যাট খুলে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য
হয়ে গেল, পিছন ফিরে একবারও তাকাল না। রাস্তার উল্টো দিকে
থামল রানা। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রাস্তার ওপারের দরজা-
টার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল, কয়েকজন বিশাল-
মেহী চীনা আশপাশ থেকে লক্ষ্য করছে ওকে। একটা সিগারেট
ধরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল ও। দেয়াল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে
কেউ, কেউ ড্রেনের পাশে বসে রিমাচ্ছে। সহজেই বোঝা যায়, এরা
সবাই নেশাগ্রস্ত। যারা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাদের চোখে
পলক নেই, তার মানে শুধু তাকিয়েই আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে
বলে মনে হয় না।

দীর্ঘে দীর্ঘে, চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে রাস্তা পেরোল রানা।
বিশদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, কাজেই একটু ভয় ভয় লাগা স্বাভা-
বিক। বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দ্রুত আরেকবার
চোখ বুলিয়ে নিল হু'পাশে। যারা তাকিয়ে আছে ওর দিকে তাদের
একজনকেও পুরোপুরি সচেতন বা সূহ বলে মনে হল না। ভিড়ান
দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। সামনেই একটা সর সিঁড়ি।

দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও। কয়েক-টা ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটা মেয়েলি গলা ভেসে আসছে ওপর থেকে। নিজের অজান্তেই রিভলভারটা একবার স্পর্শ করল রানা। তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

বারান্দায় কেউ নেই। সিঁড়ির মাথার ঠিক উল্টো দিকে একটা দরজা, আরেকটা দরজা ওর ডান দিকে। আড়াআড়ি ভাবে বারান্দা পরিষ্কার সামনের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল ও। ভেতর থেকে কর্কশ, চাপা গলায় কথা বলে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ। ‘চোপ, কুত্তী মাগী? মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাওনি, শা-আ-লী। যদি...’

‘মিছে কথা বললে সাপে কাটবে আমাকে।’ তীক্ষ্ণ গলায় চোঁচিয়ে উঠল ইসি তাহি। ‘লোকটা বলল, ঢাকায় পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুন হয়েছে সুজি।’

কোমল একটা মাজিত কণ্ঠস্বর রানার ঠিক পেছন থেকে বলল, ‘নড়বেন না, মি: ডিউক।’ পরিচিত কণ্ঠস্বর। কথাটা ইংরেজীতে বললেও লোকটা যে চীনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। গলাটা শান্ত হলেও, নির্দেশের ভেতর ছমকিটুকু স্পষ্ট। একচুল নড়ল না রানা। ‘ধীরে ধীরে হাত তুলে দরজা খুলুন। তারপর ভেতরে ঢুকুন। কোন রকম চালাকী নয়, প্লীজ।’

এক পা এগোল রানা। হাতল ঘুরিয়ে কবাট দুটো উন্মুক্ত করল। প্রায় খালি একটা কামরা। আসবাব বলতে মশা একটা কাঠের বেঞ্চ, তাতে কাঠেরই একটা হেডরেষ্ট দেখে বোঝা গেল বিছানা হিসেবেও ব্যবহার করা হয় এটাতে। ঘরের একধারে একটা প্যাকিং বাক্স, তার ওপর কেটলী, চায়ের কাপ ইত্যাদি। ঘরের আরেক কোণে একটা নোংরা রশি টাঙান হয়েছে, তাতে ভরোষিক নোংরা আটার

ওয়ার, গেঞ্জি, তোয়ালে ইত্যাদি ঝুলছে। রশিটার নিচে একটা বেসিন। বেসিনের ওপর একটা টিনের গ্রাস।

মেরুতে বসে আছে ছ'জন, রানাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল তারা। ইসি তাহি লাক দিয়ে উঠতে গেল, কিন্তু রানার পিছনে দৃষ্টি পড়তেই কান্ড হল সে। তার মুখোমুখি বসে আছে একজন লোক। পরনে চীনা পোশাক। কাঁধ হুটো সরু, রোগাটে চেহারা। মাথায় কাল টুপি, তুরু পর্যন্ত নামান। প্রথম দর্শনে রানার মনে হল, লোকটা চীনা। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই ভুলটা ধরতে পারল ও। চীনা নয়, বাঙালী।

‘এই লোকই।’ টেচিয়ে উঠল ইসি তাহি। ‘এর কথাই...

সামনে বসা লোকটা ঠাস করে একটা চড় কষাল ইসি তাহির গালে। ‘চোপ শালী। ট্যা-কো করবি তো জ্যান্ত পুতে ফেলব।’ উঠে দাঁড়াল লোকটা। পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করে হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে বেড়ে একটা লাথি মারল ইসি তাহির কোমরে। ‘বেশ্যা মাগী। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিস হারামজাদাকে, কেমন?’ দাঁতে দাঁত ঘষল সে। ‘বেরো। বেরো এখান থেকে। গেলি।’

রানার শিরদাঁড়ার ওপর শক্ত কি যেন ঠেকল। পিছন থেকে লোকটা বলল, ‘আগে বাড়ুন, মিঃ ডিউক।’

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়াল ইসি তাহি, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। সামনে এগোল রানা। হিংস্র খুনীর চেহারা নিয়ে রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে সামনের লোকটা।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা। কেউ কিছু বলার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। ওয়াম পিঙ হো, সেই

ওয়েজী বলিয়ে গাইড, ওর চোখে চোখ রেখে কমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল একটু। তার হাতে একটা পয়েন্ট কোর-ফাইন্ড রয়েছে, রানার শিরদাঁড়ার ওপর তাক করা। দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে।

সামনে দাঁড়ান লোকটাকে ভাল করে দেখল রানা। অসুস্থ, কুখ্যাত মন হল তাকে। দাড়ি কামায়নি বেশ কয়েক দিন, গায়ে নোংরা পোশাক। ‘ওর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা দেখ,’ ভারি গলায় বলল সে।

রানার শিরদাঁড়ার ওপর শিক্তল চেপে ধরল ওয়াম পিঙ হো। বাঁ হাত দিয়ে ওর শরীরটা চেক করল সে। রিক্তলভারটা বের করে নিল কোটের ভেতরের পকেট থেকে। পিছিয়ে গেল আবার।

সামনে দাঁড়ান লোকটা শহীদ আশরাফ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, ভাবল রানা। এ লোক শহীদ আশরাফ না হলে ওর সমস্ত সন্দেহের তাহলে আব কোন ভিত্তি থাকে না। ‘তুমি শহীদ আশরাফ, তাই না? তোমাকেই তো খুঁজছি আমি’

‘কিন্তু যা পেতেও কোন লাভ হবে না তোমার।’ সাথে সাথে জবাব দিল লোকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াম পিঙ হো-র দিকে তাকাল রানা। সেই কমা প্রার্থনার হাঙ্গিট! এবাবও লেগে আছে তার মুখে। রানা বলল, ‘তোমার ফাঁদটা বেশ ভালই ছিল। সেই এয়ারপোর্ট থেকে আমার ওপর নজর রেখেছ তুমি তোমাকে সন্দেহ করিনি, সেটা আমার বোকামি। আমি আসছি, খবরটা তোমাকে জানাল কে?’

থক থক করে হাসল ওয়াম, বেন খুব আমোদ অনুভব করেছে। ‘এসব খবর পেতে আমাদের অনুবিধে হয় না। বড় বেশি নাক

গলিয়ে কেলেছেন আপনি, মিঃ ডিউক। হঠকণ্ঠে আসা উচিত হয়নি আপনার।’

ঠোট বাঁকা করে এই প্রথম একটু হাসল রানা। ‘জান না বুঝি ? নাক গলানোই তো আখার পেশা।’

‘কি চাও তুমি ?’ তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল শহীদ আশরাফ।

‘কিছু ওখা। সুজি কোয়াণ্ড খুন হল কেন ?’

আশরাফের চেহারায় ধূর্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। ‘ঠিক বলছ, খুন হয়েছে সুজি ?’

‘হ্যাঁ।’

মাথার টুপিটা খুলে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিল আশরাফ। লম্বা চুলে কাঁধ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। ‘ঠিক কি ঘটেছে খুলে বল আমাকে।’ মাথার চুলে বাববার আঙ্গুল চালাতে শুরু করল সে। রানা লক্ষ্য করল, লোকটার ডান হাতের বড়ে আঙ্গুলটা বাঁকা হয়ে আছে।

আতিকুল হা খানের সেই রহস্যময় টেলিফোন কলের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করল রানা। শেষ করল মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাব দিয়ে। ‘...পূত্রধূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু জানতে চান তিনি। ছেলের প্রতি এটা তাঁর একটা দায়িত্ব বলে মনে করছেন...’

‘কিন্তু পুলিশ থাকতে তোমাকে কেন বেছে নিল বুড়ো ?’

‘পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছে না। এখানে এসে আমিও কোন সুবিধে করতে পারছি না। সেজন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম।’

‘আমাকে খুঁজছিলে ? কেন ? আমি সাহায্য করতে পারব একথা তোমার মনে হল কেন ?’ অদ্ভুত একটা অস্থিরতা প্রকাশপেল শহীদ আশরাফের লালচে চোখে। জুলফি বেয়ে বামের দ্বারা নেমে আসতে দেখল রানা। ওর মনে হল, যে কোন কারণেই হোক, তার

পেয়েছে লোকটা। সেজন্যই বোধহয় চেহারায় হিংস্র, বন্য একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

‘তুমি আমাকে শক্ষিক সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পার,’ বলল রানা। ‘তোমার মতো সে-ও কি ড্রাগ-মাগলিঙের সাথে জড়িত ছিল?’

‘জানি না। শক্ষিক সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। এসব ব্যাপারে নাক গলিয়ে না। মরতে চাও নাকি? যাও, ভাগো এবার। শক্ষিক মারা গেছে। মরেই থাকতে দাও তাকে। বেরোও, ভাগো।’

আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল রানার। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর পেছনে দাঁড়ান ওয়ামের দিকে তাকাল আশরাফ। সাথে সাথে বিদ্যায় গতিতে ঘুরল রানা। পিস্তল দিয়ে ওর পেটে গুলো দিল ওয়াম। তাল হারিয়ে ফেলল রানা, কুঁকে পড়ল সামনের দিকে। খটাশ করে ওর মাথার মাঝখানে বাড়ি মারল ওয়াম পিস্তলের বাঁট দিয়ে। তারপর কি ঘটল বলতে পারবে না রানা।

দশ

মাথায় ভীষ ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরে পেল রানা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল, কিন্তু দেখতে পেল না কিছু। ভাবল, কোথায় রয়েছি? অন্ধকার কোন টানেলে? তারপর পরিচিত একটা গন্ধ পেল ও, বুঝল,

সেই ঘরেই রয়েছে ও। ধীরে ধীরে উঠে বসল, দাঁড়াল, অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে স্পর্শ করল ভিড়ান দরজাটা। কবাক্স খুলতেই ল্যাণ্ডিংয়ের আলো দেখতে পেল সামনে। সেই সাথে নিচের রাস্তা থেকে লোকজনের গলার আওয়াজ ভেসে এল। চৌকাঠ ধরে কিছুক্ষণ দম নিল ও। তারপর আঘাতটা অনুভব করার জন্যে একটা হাত তুলল মাথায়। কোলা জায়গাটা স্পর্শ করতেই ইলেকট্রিক শকের মতো তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। কাপসা হয়ে এল দৃষ্টি।

এই সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। পিছিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকতে যাবে রানা, ল্যাণ্ডিংয়ে দেখা গেল সার্জেন্ট নিকলসনকে। ‘এই যে।’ ওকে দেখেই হাঁক ছাড়ল সার্জেন্ট। ‘এখানে কি করছেন আপনি?’

‘খাবি খাচ্ছি,’ তিস্ত গলায় বলল রানা। ‘আপনি?’

পিছনে একজন চীনা পুলিশ অফিসারকে নিয়ে দোতালায় উঠে এল সার্জেন্ট। ‘এই ডেপুটারাস এলাকায় দেখা গেছে আপনাকে, খবরটা পেয়েই চলে এসেছি। আপনার মতলবখানা কি জানার ইচ্ছে ছিল।’

‘দেখি করে কেলেছেন,’ বলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল ও। প্রায় এক ঘণ্টা জ্ঞান ছিল না ওর। ‘ঘণ্টাখানেক আগে এলে শহীদ আশরাফকে ধরতে পারতেন।’

‘শহীদ আশরাফ।’ উত্তেজিত হয়ে উঠল সার্জেন্ট। ‘বলেন কি?’

‘ওয়াম পিঙ হো নামে একজন লোক আছে তার সাথে ...’

রানাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল সার্জেন্ট। ভেতরে কেউ নেই দেখে বেরিয়ে এল তখুনি। ‘চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন আপনার

সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছেন, চলুন ।’

‘চীফ ইন্সপেক্টর ইসি তাহি নামে একটা মেয়ের সাথেও কথা বলতে চাইবেন,’ বলল রানা। সার্জেন্টকে ইসি তাহির ঠিকানাটা জানিয়ে দিল ও। ‘যত তাড়াতাড়ি পারেন খোঁজ নিন মেয়েটার।’

‘এসবের সাথে তার সম্পর্ক?’

‘তার পিছু নিয়েই তো শহীদ আশরাফের এই আস্তানায় পৌঁচেছি আমি। তাড়াতাড়ি করুন, সার্জেন্ট। দেরি করলে পাখি উড়াল দেবে।’

চীনা অফিসারকে দ্রুত ক্যান্টনীজ ভাষায় কি যেন বলল সার্জেন্ট। অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

আধ ঘণ্টা পর। চীফ ইন্সপেক্টর স্টুয়ার্ট জ্যাসনের অফিসে বসে আছে রানা। সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। এই মাত্র ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে পুলিশ সার্জেন্ট।

টেলিফোন করে ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে চীফ ইন্সপেক্টরকে। রেগে বোম হয়ে আছে সে। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাগটাকে সামলে রাখতে হয়েছে তাকে। চোখ তটো সতর্ক, গভীর মনোযোগের সাথে রানার কথা শুনছে। সিলভার মাইন বে-তে বা ঘটেছে সেটা চেপে গেল রানা। কেন এবং কিভাবে যোগাযোগ করল ইসি তাহির সাথে, সেটা বলল। সূজি খুন হয়েছে শুনে ইসি তাহির অতিক্রমারও বর্ণনা দিল। ‘সূজির মৃত্যু সংবাদ পাচার করবেও, এই রকম একটা সন্দেহ ছিল বলেই ওকে আমি অনুসরণ করি,’ বলল ও। তারপর, কিভাবে হঠাৎ পিছনে হাজির হল ওরাম পিওহো, কিভাবে ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল সে,

তাও জানাল।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর চীফ ইন্সপেক্টর বলল, 'নিজের ঘাড়ে বিপদ টেনে নিলে কার কি করার থাকতে পারে। এতসব না করে প্রথমেই আমার কাছে আসা উচিত ছিল আপনার।'

উত্তরে রানা কিছু বলার অগেই বন বন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অপর প্রান্তের বক্তব্য শুনল জ্যাসন। তারপর কঠিন সুরে বলল, 'খুঁজতে থাক। ওকে আমি চাই।'

রিসিভার রেখে দিয়ে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। 'নিজের ক্লাটে ফেরেনি ইসি তাহি। ওখানে হু'জুন লোককে পাহারায় রাখা হয়েছে। সম্ভাব্য অন্যান্য জায়গাতেও খোঁজ করা হচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত হঠাত ওমপঙ পিয়ার মতো ইসি তাহিকেও প্রশালী থেকে উদ্ধার করবে পুলিশ, ভাবল রানা।

'কি ভাবছেন?'

'আপনার কাছে শহীদ আশরাফের কোন কটো আছে? জানতে চাইল রানা। 'এই লোকটা শহীদ আশরাফ কিনা যে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

একজন কনস্টেবলকে ডেকে শহীদ আশরাফের ফাইল চেয়ে পাঠাল জ্যাসন। একটু পরই ফাইল থেকে একটা ফটো বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

কটোটার দিকে তাকাতেই রানার শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হল। পারভিন ওকে যে কটোটা দিয়েছিল, এটা সেটারই আরেকটা কপি। রোগাটে একটা মুখ। নীচ, স্থূল চেহারা। চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। পারভিন বলেছিল, এটা মীর শকিরুর রহমানের কটো।

‘শহীদ আশরাফের কটো এটা ? আপনি ঠিক জানেন ?’

‘নিশ্চয়ই ।’ অবাক দেখাল চীফ ইন্সপেক্টরকে । ‘কেন বলুন তো ?’

‘কিন্তু আজ রাতে যার সাথে কথা হল আমার এই কটো তো সে-লোকের নয় । অথচ লোকটা স্বীকার করল সে-ই শহীদ আশরাফ ।’

‘তাহলে কার সাথে কথা বলেছেন আপনি ?’

‘আচ্ছা, শফিককে কখনও দেখেছেন আপনি ?’

‘দেখেছি । কেন ?’

‘তার কোন কটো আছে আপনার কাছে ?’ দ্রুত জানতে চাইল রানা ।

‘না, তা নেই ।’

‘তার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন আমাকে ?’

‘রোগা, চোখ দুটো সতর্ক, চোয়াল ভাঙা, মোট কথা খুব বাজে একটা চেহারা...’

‘মনে হচ্ছে এই লোকের সাথেই কথা বলেছি আমি ।’

অনেকক্ষণ কথা বলল না ওরা । তারপর ভারি গলায় চীফ ইন্সপেক্টর বলল, ‘শফিক মারা গেছে । মোটর অ্যাক্সিডেন্টে । তার লাশও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ঢাকায় ।’

‘শফিক বেঁচে আছে...অসম্ভব ঘটনা দেড়েক আগেও তাকে জীবিত দেখেছি,’ বলল রানা । ‘আপনার বর্ণনার সাথে তার চেহারা মিলে যাচ্ছে ।’

‘কিন্তু এ অসম্ভব । গাড়িতে যে লাশটা পাওয়া গিয়েছিল তার সাথে শফিকের আকার, আকৃতি এবং গড়ন মিলে গিয়েছিল, লাশটা শফিকের ছাড়া আর কার হতে পারে ?’ ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকেই যেন বিশ্বাস করাতে চাইছে চীফ ইন্সপেক্টর । ‘শরীরটা এমন ভয়ংকর

ভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর ত্রী আঙটি আর সিগারেট কেস দেখে লাশ সনাক্ত করেছিল। 'উহ', এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'ওটা শফিকের লাশ না হয়েই যায় না।'

'ওটা শফিকের লাশ ছিল না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি ভাবছি, লাশটা তাহলে কার? কার লাশ আপনারা ঢাকার পাঠালেন?'

'দেখুন, মিঃ ডিউক, আপনি শুধু শুধু পানি ঘোলা করছেন।' চটে উঠে বলল জ্যাসন। 'শফিক বেঁচে আছে তা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করার কোন কারণও নেই।'

'লম্বা একজন লোক, ঠোঁট জোড়া পাতলা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল,' বলল রানা, চুপ করে থেকে কি যেন স্মরণ করল, তারপর আবার বলল, 'ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা বাঁকা, মনে পড়ছে, বোধহয় অনেক দিন আগে ভেঙে গিয়েছিল, তারপর আর ঠিক ভাবে সেট হয়নি...'

'কড়ে আঙ্গুল বাঁকা? তাহলে আর কোন সন্দেহই নেই। এই লোকই শফিক।' এই প্রথম কথা বলল সার্জেন্ট নিকলসন।

চোখ দুটো বিক্ষারিত হয়ে উঠেছে চীফ ইন্সপেক্টরের। 'তাহলে ঢাকার পাঠিয়ে কবর দেয়া হল কাকে?'

'আমার ধারণা,' শাস্ত্র ভাবে বলল রানা, 'ঢাকার পাঠানো হয়েছে নতীদ আশরাফের লাশ। যে-কোন কারণেই হোক, শফিক আমার কাছে মিলেছে শহীদ আশরাফ বলে চালাবার চেষ্টা করেছে।'

'কারণ?'

'জানি না,' বলল রানা। 'এবার আমি উঠব। আমার ঘুম পেচেছে।'

‘এক মিনিট, মিঃ ডিউক,’ তাড়াতাড়ি বলল চীফ ইন্সপেক্টর।
‘ওয়াম পিও হো দেখতে কেমন সেটা বলে যান। দেখি ব্যাটাকে ধরা
যায় কিনা।’

ওয়ামের চেহারার বর্ণনা দিল রানা।

সার্জেন্ট নিবলসনকে বলল জ্যাসন, ‘যত লোক লাগে সাথে নাও।
কাউলুনের প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশী চালাতে হবে। ওয়াম আর
শকিক, দু’জনকেই চাই আমি।’

রানার সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গন্তীঃ গলায় বলল
সার্জেন্ট, ‘দেয়াল ঘেরা কাউলুন থেকে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব
একটা ব্যাপার। ওখানে পুলিশের সাথে কেউ সহযোগিতা করে না।
তাড়াড়া ভাবেননই তো, সব চীনাই এক রকম দেখতে। ওয়াম আমার
পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও টের পাব না আমি। অচচ চীফ ঢালাও
অর্ডার দিয়ে বসলেন, দু’জনকেই চাই তার। বলুন তো এখন কি
করি।’

‘ফেঁটা চালিয়ে যান,’ বলল রানা। ‘দেখুন কি আছে ভাগ্যে।’
সার্জেন্টকে বারান্দায় দেখে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

একটা ট্যাক্স নিয়ে রিপালস বে হোটেলে ফিরে এল ও। ভীষণ
ক্লান্তি বোধ করছে। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতালায়। এলি-
ভেটর থেকে নামতেই সামনে পড়ে গেল হোটেলের নাইট বয়।
সতের কি আঠারো বছর বয়েস, পরনে সাদা ড্রিল জ্যাকেট, কাল
ট্রাউজার। রানাকে দেখে একগাল হাসল। মাথা নত করে অভিবাদন
জানিয়ে বাড়িয়ে দিল ঘরের চাবি। ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কামরার
সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তালা খুলে সিটিংরুমে ঢুকল। বেড-
রুম আর সিটিং রুমের মাঝখানে কোন দেয়াল নেই, শুধু একটা মোটা

কাপড়ের পর্দা। আলো খেলে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল রানা। শাও-
য়ারের ঠাণ্ডা পানির নিচে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে এখন ও।
ট্রাউজারের বাতাম খুলতে খুলতে পর্দা সরিয়ে বেডরুমের ঢুকল ও।
খমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছে।

বিছানার ওপর শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনে কাল আর
সোনালী রঙের ককটেল ড্রেস। কণিকা নন্দী। পায়ের জুতো খুলে
রেখেছে খাটের নিচে।

কণিকাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় বোধ করল রানা। প্রথমে
ধরেই নিল, মারা গেছে সে। কিন্তু বুকের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে
তুলটা ভাঙল। তারপরই প্রশ্ন জাগল, ঘরে ঢুকল কিভাবে? সেই
সাথে মনে পড়ে গেল নাইট বয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। ছোকরাকে
ঘুষ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কণিকা। কিন্তু এখানে কি মনে করে?

ধীরে ধীরে চোখ মেলল কণিকা। তারপর মাথা তুলে তাকাল
রানাকে দেখতে পেয়েই কট্ করে বিছানার ওপর উঠে বসল সে।
পা ছোটো কুলিয়ে দিল বিছানার কিনারা থেকে।

‘হঃখিত,’ বলে হাসল সে। ‘আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে
করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানিও না।’ জুতোয় পা গলাচ্ছে সে।

পিছিয়ে এসে একটা আর্মচেয়ারে বসল রানা। ‘কখন এসেছে
তুমি?’ সম্বোধনটা ইচ্ছে করেই পরিবর্তন করল ও। যে তাকে খুন
করার জন্যে ফাঁদ পাতে তাকে সম্মানসূচক সম্বোধন করা ওর পক্ষে
সম্ভব নয়।

সিটিংরুমে ঢুকল কণিকা। ‘সেই দশটা থেকে। আপনার কথা
ভেবে ভীষণ হুশিষ্ণু হচ্ছিল।’ রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে
ঋত বলে চলেছে সে, ‘আপনার ব্যাপারটা কি? কেনী ঘাটে পৌছ-

লেন না যে ? আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে আরেকটু হলে মিসই করতাম বোট। কোথায় ছিলেন আপনি ?

‘আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। ‘দিলভার বে মাইনে তুমি আর আমি যাব, প্রস্তাবটা তোমার মুখ থেকে শুনেছিলাম। ওটা কি তোমারই প্রস্তাব ছিল, না কি আর কেউ তোমাকে দিয়ে প্রস্তাবটা বলিয়েছিল ?’

রানার সামনের আর্মচেয়ারের হাতলে বসল কণিকা। ‘আমার প্রস্তাব ? আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...’

‘জলপ্রপাতটা আমাকে দেখে আসতে বলার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল,’ বলল রানা। ‘জলপ্রপাত দেখতে যাবার পরামর্শ-টা কার ? তোমার ? নাকি অন্য কারো পরামর্শ ছিল ওটা ?’

ভুরু কুঁচকি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কণিকা। তারপর বলল, ‘এ ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন আপনি, বুঝতে পারছি না। তবে, আমার ভাই কথাচ্ছলে বলেছিল, ডিউক সাহেবকে দিলভার বে মাইন-টা দেখিয়ে আনতে পারিস। ওর ধারণা, আপনি খুব একটা বোধ করেন, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে আপনি খুব খুশি হবেন।’

‘ও কি সত্যি তোমার ভাই ?’

চমকে উঠে শক্ত হয়ে গেল কণিকা। ঝটক্ করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

প্রশ্নটা প্যাবার করল রানা।

অন্য দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল কণিকা, ‘আশ্চর্য সব প্রশ্ন করছেন আপনি। এসবের মানে কি ?’

‘তোমার সাথে সুরীন্দের চেহারার কোন মিল নেই,’ বলল রানা। ‘তাছাড়া, তোমার মতো একটা মেয়ে তার ভাইয়ের সেবার আয়োজ-

না করবে, এটা আমার কাছে বিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি।’

খানিকক্ষণ ইতস্তত করতে দেখল রানা কনিকাকে। তারপর কাঁধ ঝাকাল সে। বলল, ‘না, ও আমার কেউ নয়। মাত্র ছ’মাস আগে এর সাথে আমার পরিচয়। এখন বুঝতে পারছি, ওর সাথে পরিচয় হয়নি এটা আমার জন্যে কাল হয়েছে...’

সিগারেট ধরাল রানা। ওর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে প্যা-কেটটা কেড়ে নিয়ে কনিকাও একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বুঁজে খোঁচা টানল সে।

‘কোথায় ওর সাথে দেখা হয় তোমার?’

‘সিঙ্গাপুরে। কলকাতা থেকে একটা ছেলের সাথে পালিয়ে আসি। কিন্তু বিয়ে না করে ও আমাকে ফেলে কেটে পড়ে। দেশে ফেরার কোন উপায় নেই দেখে একটা নাইট ক্লাবে ক্যাবারে নাচের চাকরি নিই। আমার নাচ দেখতে আসতো সুবীর। ছ’হাতে টাকা ভড়াত ও, আমাকে এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইত। এর মধ্যে একদিন পুলিশ হামলা করল নাইট ক্লাবে। অনেকের পালান, কিন্তু আমি বরা পড়ে গলাম। খবর পেয়ে ঘান হাওত থেকে সুবীরই আমাকে উদ্ধার করে। তারপর ওর বাড়িতে গিয়ে উঠি আমি। কিন্তু কয়েকদিন পরই টের পেলাম, আমাকে নয়, আমার শরীরটাকে ভাল-খালি ও। অনেক ভেবে চিন্তে দেশে ফেরার জন্যে কিছু টাকা চাই-লাম মন কাতে। কিন্তু মুন্সের ওপর বলে দিল আর বা চাও পাবে, কিছু টাকা দেন না। তারপর ঠঠাং সিঙ্গাপুরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এল ও। চাকরি নেই, টাকা নেই, অগত্যা আমাকেও আগতে ওল ওর সাথে।’

‘পানপোটা?’

‘কোথেকে জানি না আমার জন্যে একটা জাল পাসপোর্ট যোগাড় করেছিল ও।’ রানার দিকে তাকাল কণিকা। ‘এখানে আমরা ভাই-বোন হিসেবে আসি। আপনি...’ কি যেন বলতে গিয়েও ইতস্তত করে থেমে গেল সে।

‘কি বলবে বল ?’

‘আপনি...আপনি আমাকে কিছু টাকা দেবেন ? আমি দেশে কিরে যেতে চাই।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘দেশে ফেরার ছ’-মাসের মধ্যে টাকাটা আমি ফেরত পাঠাতে পারব।’

‘জাল পাসপোর্ট যোগাড় করল কিস্তাবে ?’

‘তা জানি না। টাকা দেবেন আমাকে ?’

‘টাকা আমি কাউকে ধার হিসেবে দিই না।’

চেহারাটা কাল হয়ে গেল কণিকার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল সে। রানার মনে হল, মেয়েটা ভয় পেয়েছে। ‘ধার হিসেবে দেবেন না ? কিন্তু আমার কাছে কিছুই তো নেই যা আপনাকে কিনতে বলব...আচ্ছা, আমি যদি...মানে, আমি যদি, ধরুন, আপনাকে সঙ্গ দিই, আপনার সেবা করে টাকাটা রোজগারের প্রত্যাশ দিই, আপনি রাজি হবেন ?’

‘গলাটা শুকিয়ে গেছে,’ বলল রানা। ‘নাইট বয়কে ডেকে কিছু আনতে বলি, কেমন ?’

‘না।’ চেয়ারের হাতল থেকে ফ্রুত নেমে পড়ল কণিকা। চেহারায় পরিষ্কার আতংক ফুটে উঠল। ‘আমি এখানে আছি তা কাউকে জানাতে চাই না।’

‘নাইট বয় তো জানেই,’ বলল রানা। ‘সে-ই তোমাকে ভেতরে ঢুকিয়েছে, তাই না ?’

‘না, না। আপনার কামরার নান্নার ভেনে নিয়ে নিচের বোর্ড থেকে চাবি খুলে নিয়ে এসেছি। ছোটো চাবি ছিল বোর্ডে। নাইট বয় জানে না আমি এখানে আছি।’

মাথার আঘাতটা আবার ব্যথা করতে শুরু করেছে রানার।

‘কিসের এত ভয় তোমার?’ জানতে চাইল ও।

‘ভয়? কোথায়? ভয় পাব কেন? আমি শুধু হতকণ্ড ছেড়ে চলে যেতে চাই।’ এগিয়ে এসে রানার একটা হাত চেপে ধরল কনিকা। ‘শ্রীজ। আপনি আমাকে বাঁচান। আমি দেশে ফিরতে চাই।’

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। ‘কিন্তু হঠাৎ করে বেশে ফেরার জন্যে এতখানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ—কারণটা কি?’

‘একের পর এক এত প্রশ্ন না করলেই কি নয়?’ করুণ চোখে তাকাল কনিকা। ‘টাকা দেবেন কিনা বলুন। দেবেন জানলে আপনার সাথে... শুভেও আমার আপত্তি নেই। দেবেন?’

‘না,’ বলল রানা। ‘শুধু এক শর্তে দিতে পারি—সুখীর নন্দী সম্পর্কে যা জান সব আমাকে বলতে হবে।’

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল কনিকা, তারপর বলল, ‘বিশ্বাস করুন, ওর সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি। প্লেবর টাইপের লোক, কুতি করে সময় কাটাচ্ছে...’

বৈধ হারিয়ে ফেলল রানা। ‘ওর সম্পর্কে সবই জান তুমি, কিন্তু বলতে রাজি নও। বেশ। তোমার জেদই বজায় থাক, আমারও টাকা বেঁচে থাক।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেলিফোনের দিকে এগোল। ‘ড্রিন্কেস অর্ডার দিতে যাচ্ছি আমি। গলাটা না ভেজালে খুম আসবে না। ওয়েটার আসার আগেই তুমি বরং কেটে পড়।’

না...দাড়ান ।

রিসিভার তুলে রুম সার্ভিসকে স্বচের একটা বোতল আর বরফ দিতে বলল রানা । ক্ষুণ্ণ ওর সামনে এসে দাঁড়াল কণিকা ।

‘ওর সম্পর্কে যা জানি বললে আপনি আমাকে দেশে ফেরায় টাকা দেবেন ?’

‘দেব,’ রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল রানা ।

বুক ভরে দম নিল কণিকা, যেন সাহস সঞ্চয় করল, তারপর বলল, ‘আমার ধারণা সুধীর ড্রাগ স্মাগলিঙের সাথে জড়িত ।’ হাত দুটো ঘন ঘন কচলাচ্ছে সে ।

‘এর দম ধারণার কারণ ?’

‘গভীর রাতে লোকজন দেখা করতে আসে ওর সাথে । আমরা যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম প্রায়ই ডকে গিয়ে নাবিকদের সাথে কথা বলত ও । সিঙ্গাপুরে আমরা যে বাড়ীলায় ছিলাম সেখানে একবার হানা দিয়েছিল পুলিশ । সুধীর খুব হাকাতাবে নেয় ব্যাপারটাকে । পুলিশ অবশ্য সার্চ করে কিছু পায়নি । এখানেও গভীর রাতে চীনারা ওর সাথে দেখা করতে আসে । ভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে বোট নিয়ে কোথায় যেন চলে যায় ও ।’

‘লনফিনের যে বাড়িটার তোমরা আছ, তোমাদের আগে সেখানে শক্তিক থাকত ?’

টোক গিলল কণিকা । ‘থাকত । কথাটা আপনাকে জানাতে নিষেধ করে সুধীর । শক্তিক মারা যাওয়ার সিঙ্গাপুর থেকে সুধীরকে ডেকে পাঠানো হয় তার জায়গাটা পূরণ করার জন্যে । বাড়িটা তো দেখেছেন, ড্রাগ রিসিভ করার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা ।’

মুহু টোকা পড়ল দরজায় ।

‘ওয়েটার এসে গেছে,’ বলল রানা। ‘দেখা দিতে না চাইলে বাথ-
রুমে লুকাতে পার।’

ক্রম বাথরুমে গিয়ে ঢুকল কণিকা। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল
রানা।

দরজার সামনে ওয়েটার নয়, রানার বুকের দিকে পাংকট খি-
এটট অটোমেটিক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর নন্দী। ‘পিছু
হটো। সাবধান, হাত ছুটো যেন নড়ে না।’ চাপা গলায় বলল সে।

কাঁধ ঝাকাল রানা। পিছিয়ে এল ঘরের ভেতর

‘চেহারা দেখে বুঝতে পারছি কিসের আশায় আছ।’ ঘরে ঢুকে
বরজা বন্ধ করে দিল সুধীর, কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বিস্ময় ওয়ে-
টার আসছে না। মাকপথ থেকে বিদায় করে দিয়েছি তাকে, বলেছি,
মত বদলেছ তুমি, এত রাতে আর ড্রিন্ক বরবে না।

‘বসতে পারি?’ শাস্ত গলায় বলল রানা। ‘একের পর এক
অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার স্নায়ুগুলোকে অবশ করে তুলেছে।’ অনু-
মতির অপেক্ষায় না থেকে এক। চেয়ারে বসে পড়ল। হাত ছুটো
সুধীরের চোখের সামনে, দুই হাঁটুর ওপর রাখল। খেল নিশক
হাসিটা স্থির হয়ে আছে সুধীরের মুখে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক
ঠাণ্ডা ভাব। মনে মনে ভয়ই পেল রানা। অটোমেটিক ধরা হাতটা
একটুল নড়ছে না, লক্ষ্যস্থির হয়ে আছে রানার দুই ভুরুর মাঝ-
খানে।

‘বুদ্ধিমান লোক তুমি,’ বলল সে। ‘কতটা, তা তুমি নিজেও
জান না। গত তিন হপ্তা ধরে চেষ্টা করেও যা পারিনি আমি, তুমি
কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তাই পেরেছ।’

‘কি সেটা?’

‘কুন্ডার বাচ্চা শকিককে খুঁজে পেয়েছ। তোমাকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম, ভাগ্যিস খুন হওনি তুমি।’

‘ঠিক বুঝতে পারছি না কথগুলো,’ বলল রানা। ‘রিভলভারটা আমার নিকে এভাবে তাক করে রাখার কোন দরকার আছে কি? বিশ্বাস কর, আমি নার্ডাস কিল করছি।’

রানার দিকে রিভলভার ধরে রেখেই পা বাড়াল সুবীর। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খানিক আগে কণিকা যে চেয়ারটার বসেছিল সেটার বসল। ‘রিভলভারটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা না করলে এটা থেকে গুলি বেরবে না। পুলিশকে কি বলেছ তুমি?’

‘পুলিশকে কিছু বলেছি তা তুমি ভাবছ কেন?’

‘লনকিনের বাড়ির ব্যাপারে কৌতূহল আছে জানার পর থেকেই তোমার পেছনে লোক লাগিয়েছিলাম আমি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী ছিলে তুমি আমার। পেডালোর তোমাকে দেখার পর থেকে তোমার ওপর থেকে চোখ সরাইনি আমরা।’

‘আমরা? মানে ড্রাগ স্মাগলারদের রিঙ?’

চেহাওয়ার প্রশংসার ভাব কুটিয়ে তুলে সুবীর বলল, ‘তোমার ঘটে যে বুদ্ধি আছে তা আমি আগেই স্বীকার করেছি। হ্যাঁ, ডিউক, আমরা মানে ড্রাগ স্মাগলারদের একটা রিঙ। এই চক্রটা বিরাট—এত বড়, তোমার কল্পনাতেও তার সবটা ধরা পড়বে না। সে যাই হোক, তোমাকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম, কথটা মনে পড়লেই ষেমে উঠছি আমি। ওটা আমারই ভুল হয়েছিল। তোমাকে বঁাটান উচিত হয়নি আমার। কিন্তু একথাও ঠিক যে তখন আমি জানতাম না তুমি শকিকের পেছনে লেগেছ।’

‘তা আমি লাগিনি,’ বলল রানা। ‘আমি জানতাম শফিক মারা গেছে।’

‘প্রথমে আমরাও তো তাই ভেবেছিলাম। আমাদেরকে বোকা বানায় ও। ও মারা গেছে ধরে নিয়ে আমরা তো খুঁজছিলাম শহীদ আশরাফকে। এই সময় তুমি ঢাকা থেকে এসে পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে গেলে শফিকের কাছে।’

‘বুঝলাম, শফিককে পেয়ে খুশি হয়েছ তোমরা। এখন ?’ কণিকা কি করেছে বাধক্রমে, ভাবল রানা।

‘তুখু শফিককেই নয়, তার সাথে ওয়ামকেও আমরা পেয়েছি।’ ফুরুর, হিংস্র একটুকরো হাসি ফুটল সুধীরের ঠোঁটে।

‘ওয়াম আসলে কে ?’

‘আমাদেরই একজন সবস্যা, কিন্তু বোকাটা শফিকের সাথে হাত মিলিয়ে পালিয়ে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে ধোলাই করা হচ্ছে ওদেরকে। ধোলাইয়ের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, সাগরে ফেলে দেয়া হবে।’

‘কি করেছে ওরা তোমাদের ?’

‘বেঙ্গলমানদের শাস্তি দেয়ার এটাই আমাদের রীতি,’ বলল সুধীর। ‘আবার কে কখন বেঙ্গলমানী করে, তাই সুযোগ পেলেই আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকি।’ রিস্টওয়াচ দেখল সে। ‘কি বলেছ তুমি পুলিশকে ?’

‘এমন কিছু বলিনি যা তারা জানে না।’

ঝাড়া দশ সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সুধীর। তারপর উঠে দাঁড়াল। ‘হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠব আমরা, চল।’

‘কোথায়?’

‘সময় হলে জানতে পারবে,’ মুখে হাসি নেই সুধীরের, গলার আওয়াজটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা শোনাল। ‘প্যাসেজেনাইট বর আছে, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা কর না। সে আমাদের দলেই এতজন। বাইরে অপেক্ষা করছে চারজন লোক, প্রত্যেকের কাছে ছুরি আছে। চল্লিশ ফিট দূর থেকে আপেল গাঁথতে পারে ওরা—কাগজের বাকার মতো ফিছু করে বসলে অকালে মারা পড়বে।’

উঠে দাঁড়াল রানা। পিছিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সুধীর, সরে দাঁড়াল এগোলে ‘লবিতেও একজন লোক আছে,’ বলল সে। ‘সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সাবধান!’

প্যাচে ও বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ির দিকে এগোল। পিছনে সুধীর, রিভলভার ধরা হাতটা পকেটে। বাকের কাছে দেখা গেল নাইট বংকে সেই গালভরা হাসিটা এখন আরো উৎসাহে পড়ছে।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল রানা।

‘নামো!’ পিছন থেকে বলল সুধীর।

চার প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে নিচের লবিতে নেমে এল রানা। এক পলক তাকিয়েই লবির পরিবেশটা অস্বাভাবিক লাগল ওর। লবি প্রায় খালি। শুধু ছ’জন লোক বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন সার্জেট নিকলসন। অপরজনের পরনেও সাদা পোশাক, কিন্তু তার চেহারা দেখেই বোকা গেল, সেও একজন পুলিশ।

‘হ্যাণ্ডস আপ!’ সুধীরকে দেখেই হংকার ছাড়ল সার্জেট নিকলসন।

সেই মুহূর্তে বিদ্যায় খেলে গেল রানার শরীরে। ডাইভ দিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। পরমুহূর্তে শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

স্বপ্নীর এবং সার্জেন্ট হু'জনেই গুলি করল, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হল—
একটাই গুলি হয়েছে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা।

‘উঠে পড়ুন, উঠ পড়ুন।’ তাগাদা দিল সার্জেন্ট নিকলসন।
‘বড় বাচ’ বেঁচে গেছেন।’

উঠে দাঁড়াল রানা। দেখল, চিং হয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে
রয়েছে স্বপ্নীর। বুকের একটা ক্ষত থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে
আসছে। তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও।

‘ওকে খুন না করলে কি চলত না?’

‘আমরা নিষেধের প্রাণের ওপর খুঁকি নিতে রাজি আছি,’
গম্ভীর সুরে বলল সার্জেন্ট নিকলসন, ‘কিন্তু ওকে খুন করার জন্যে
গুলি না করলে খুঁকিটা আপনার প্রাণের ওপর নিতে হত—সেটা
আমি নিতে চাইনি।’ রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। ‘ওর
সাজপাঙ্গ এখানে যারা ছিল তাদের কোমরে দড়ি দিয়েছি। মেয়ে-
টা কে, আমাদেরকে ফোন করল?’

‘মেয়ে?’ অবাক হল রানা। ‘ফোন করল? তা জানি না।
তবে ওপর তালার একজন নাইট বয় আছে, সে-ও এদের দলের
লোক।’

সার্জেন্টের সঙ্গী পুলিশ হাতে উদ্যত রিভলভার নিয়ে ক্রত
সিঁড়ির দিকে এগোল।

‘মেয়েটার টেলিফোন পেয়েই তো এখানে এসেছি আমরা। কে
সে?’

‘বললাম তো, জানি না।’

ছয়জন চীনা পুলিশ ঢুকল লবিতে। তাদেরকে কয়েকটা নির্দেশ

‘দিয়ে বট্ করে রানার দিকে ফ্লিরল সার্ভেন্ট । ‘চলুন, মি: ডিউক ।
চীফ ইন্সপেক্টর আপনার সাথে কথা বলবেন ।’

প্ৰগার

চীফ ইন্সপেক্টরের খাস কামরাটা খালি ছিল, ডিভানে শুয়ে সেখানেই
তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল রানা । সাড়ে চারটের সময় ওর ঘুম ভাঙল
সার্ভেন্টে নিকলসন । হাত-মুখ ধুয়ে নিল ও । ইতিমধ্যে পৌঁছে গেল
চীফ ইন্সপেক্টর, হু’জনের সামনে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল একজন কন-
স্টেবল । কামরার দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঝাড়িয়ে আছে সার্ভেন্ট নিকল-
সন, মাঝে মধ্যে মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলছে ।

‘সুখীরের স্পীডবোট নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল একজন
লোক,’ ধুমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল জ্যাসন । ‘মেরিন
পুলিশ তাকে ধ্রেকতার করেছে ।’

‘বাঙালী ?’

‘না । চীন:—ক্যার্টন থেকে এসেছে,’ বলল জ্যাসন । ‘আপনি
সুজি কোয়াও মার্ভার কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কাজেই আমরা
কতদূর এগোলাম সেটা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই ।’

‘ধন্যবাদ,’ সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা । ‘শক্তিকে পাওয়া
গেছে ?’

‘সেছে । আধ ঘণ্টা আগে উপসাগরে একটা লাশ ভাসতে দেখে

পুলিশ সেটাকে ডাঙায় তোলে ।’ চোখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল চীফ ইন্সপেক্টর । ‘বাজি ধরে বলতে পারি, প্রথমবার মরতে পারলেই খুশি হত শফিক । খুন করার আগে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তার ওপর ।’ শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখল সে । ‘কেসটা এখন আমাদের কাছে পানির মতো পরিষ্কার ।’

‘একটা বিশ্লেষণ তাহলে আশা করতে পারি আ’ম ?’

‘অবশ্যই,’ টোবাকো পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল চীফ ইন্সপেক্টর । ‘আমার ব্যাখ্যাটা এই রকম—হতুকও আসার পর থেকেই সুজি কোয়াণ্ড-র ঘাড়ে চেপে দিন কাটাচ্ছিল শফিক । সুজিকে কেন সে বিয়ে করল তা আমার জানা নেই, তবে মুখ বন্ধ করা একটা কারণ হতে পারে । শহীদ আশরাফের সাথে প্রথম পরিচয়ের কয়েক হপ্তা পরই সুজিকে বিয়ে করে সে । ড্রাগ স্মাগলিং ব্যাকেটের একজন উঁচু দরের অপারেটর ছিল শহীদ আশরাফ, একথা আগেই আপনাকে জানিয়েছি আমি । রিপালস বের লনফিনের বাড়িটা ভাড়া করেছিল সে । বাড়িটা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তা লনফিনের জানা ছিল কিনা এখনও জানি না আমরা, তবে জানার চেষ্টা চলছে । ড্রাগস খালাস করার জন্যে বাড়িটা অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল । জায়গাটা একেবারে নির্জন, শান বাঁধানো একটা ঘাট আছে, আছে একটা স্পীডবোট । কিন্তু নানা কারণে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল । আশরাফকে গ্রেফতার করার জন্যে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করি আমরা । ক্যান্টনে সরে বাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে, ঠিক করে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে । কিন্তু ড্রাগ ডেলিভারী নেয়ার জন্যে রিপালস বের বাড়িটার কারো থাকা দরকার । সেজন্যেই আশরাফ রিপালস বের ওই

বাড়িতে শফিককে পাঠায়। সুজি কোরাণকে এক রকম ত্যাগ করে
'ওখানে গিয়ে ওঠে শফিক। এর পর আশরাফ ক্যান্টনে চলে যায়।'

টোবাকো পাইপে আশুন ধরাল চীক ইন্সপেক্টর। একমুখ
ধোঁরা ছেড়ে আবার শুরু করল, 'এরপর প্রায় ছ'হাজার আউন্স
হিরোইনের একটা চালান গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। চালানটা
কিভাবে ডেলিভারী নিতে হবে তা শফিককে ব্যাখ্যা করে বোঝা-
বার জন্যে ক্যান্টন থেকে রিপালস বে-র ওই বাড়িটায় এক রাতে
আসতে হয় আশরাফকে। সেই রাতেই হিরোইন ডেলিভারী নেয়
ওরা। বাড়ির শুদাম ঘরে সেটা তুলেও রাখা হয়। ঠিক তখন থেকেই
হঠাৎ বিরাট ধনী হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে শফিক। ছ'হাজার
আউন্স হিরোইন বলতে গেলে সাত রাজার ধন। কিন্তু এত বড়
একটা চালান গাপ কবে দেবার সাহস তার ছিল না। সে জানত,
হিরোইন নিয়ে পালালে অর্গনাইজেশন তাকে খুঁজে বের করে
শাস্তি দেবেই। তাছাড়া, চালানটা নিজের হাতে একবার এসে
গেলে সেটা কোথায় কিভাবে কার কাছে বিক্রি করবে সে সম্পর্কেও
কোন ধারণা ছিল না তার। মনে মনে হঠাৎ ধনী হবার আশাটা
ত্যাগ করছিল সে, এই সময় ভাগ্যই তাকে একটা সুযোগ করে দিল।'

‘কি রকম?’

‘গাড়ি নিয়ে লেকি পাস-এর দিকে যাচ্ছিল ওরা, ওখান থেকে
ক্যান্টনে কেটে পড়া খুব সহজ। কিন্তু পথে অ্যান্ড্রিডেন্ট করল গাড়ি,
যায়া গেল শহীদ আশরাফ। সুযোগটা বুঝতে তুল করেনি শফিক।
নিজের হাতের আঙুলি ধুলে আশরাফের আঙ্গুলে পরিিয়ে দিল সে।
তার পকেটে ছুটিয়ে রাখল নিজের সিগারেট কেস। তারপর আশুন
ধরিয়ে দিল গাড়িতে। নির্জন পার্বত্য এলাকা, সময়টা ছিল ভোর

ভারটে, কাজেই কারো চোখে ধরা পড়তে হয়নি শফিককে। কাছাকাছি শহর থেকে একটা সাইকেল চুরি করে সে তাড়াতাড়ি করে আসে রিপালস বের বাড়িতে। হিরোইনটো কাছাকাছি গিয়েছিল সঠিক জানি না, বোধহয় হোটেল কমমোপলিটানেট নিয়ে গিয়েছিল। এইটুকু আমি অনুমান করে বলছি, তবে অন্য কিছু ঘটছিল বলেও মনে হয় না। আশরাফের লাশটাকে ওর নিজের লাশ হিসেবে সনাক্ত করার জন্যে সুজিকে রাজি করায় সে। তারপর কাউলুনের আত্মরক্ষাউদ্দেশ্যে গিয়ে গা ঢাকা দেয়।

‘তা করল কেন?’

‘কাজটা তো আসলে খোঁকের মাথাতে ছুট করে হঠাৎ ধনী ওয়ার সুযোগ পেয়ে সাথে সাথে গ্রহণ করে সেটা, কিন্তু তারপরই ঊপলব্ধি করল, ঝঁপে গেছে সে। মোটর অ্যান্ড্রিড ঊর ওয়ার পাবার সাথে সাথে দলের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠল। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, বাড়িতে হিরোইন নেই। ওরা ধরে নিল, শহীদ আশরাফ পুরা চালান নিয়ে ভেগেছে। তার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠান ওরা। এদিকে শফিকের সমস্যা হল, হস্তকৃত থেকে কিতাবে পালানো যায়। কিন্তু পালাবে কিতাবে? সবাই জানে, শফিক যাত্রা গছে। কাজেই পাসপোর্টটা কাজে লাগছে না। জাল পাসপোর্ট যোগাড় করতে হলো বাটরে বেহিয়ে লোকজনকে ধরতে হবে, সে সুযোগও নেই। তার মানে, আটকা পড়ে গেল সে।’

‘হিরোইন?’

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে জ্যাসন বলল, ‘এটা বোধহয় আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। শফিকের কাছ থেকে ওটার খবর না জেনে তাকে ওরা খুন করেনি।’

‘কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝি না,’ বলল রানা, ‘শহীদ আশরাফের লাশ শকিকের বাবার কাছে নিয়ে যেতে রাজি হল কেন সূজি কোরাও?’

‘হুগুগু থেকে কেটে পড়ার দরকার ছিল সূজির। অথচ ভাড়ার টাকা ছিল না তার কাছে। লাশটা নিয়ে গেলে শকিকের বাবা টাকা দেবেন জেনেই...’

‘হয়ত তাই...আচ্ছা, ওয়ামের ব্যাপারটা কি?’

‘সে-ও ওদের দলের লোক, হিরোইনের ভাগ পাবে আশা করে শকিকের সাথে হাত মেলার...’

‘এয়ারপোর্টে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওয়াম। ঢাকা থেকে আমি আসছি জানলকিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ খবরটা জানিয়েছিল তাকে—কে হতে পারে সে? ওয়ামের উদ্দেশ্য ছিল শকিকের কাছে থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা। ওগুপও পিয়া আমাকে রুনা না দিলে সূরীরের অস্তিত্বই আগার কাছে অজানা থেকে যেত।’

‘মিঃ মোখলেসুর রহমান কি শকিকের লাশটা ফেরত চাইবেন?’

‘বোধহয় চাইবেন। ওয়ামের লাশ পাওয়া গেছে?’

‘এখনও খোঁজ করছে মেরিন পুলিশ। স্পীডবোট থেকে যে চীনা লোকটাকে ধরেছি আমরা তার মুখ থেকে জানা গেছে, দুটো লাশ একই জায়গায় ফেলা হয়েছে।’

প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ‘অনর্গল কথা বলেছে লোকটা, তাই না? খুব কড়া দাওয়াই দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।’

পাইপের ঢাউস ডগা দিয়ে নাকের পাশটা চুলকাল চীক ইঙ্গ-পেঙ্কির। ‘চীনারা শান্ত দেবার সময় স্বজাতি বা স্বজনপ্রীতির ধার ধারে না। আমার হাতে লোকটাকে তুলে দেবার আগে আধঘন্টা

থরে নিজেদের ইচ্ছে মতো তাকে বানিয়েছে মেরিন পুন্ডিশ। ওদের একজনকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল লোকটা। কাজেই তার ওপর ওরা একটু কঠোর আচরণই করেছে।’ রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন ভাবল সে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, ‘সিলভার মাইন বে থেকে একটা লাশ পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি? লী-এনফিল্ড রাইফেল দিয়ে তার মাথা গুলি করা হয়েছে।’

‘তাই নাকি?’ নিঃশব্দ দেখাল রানাও।

‘আজ বিকেলে এদিকে গিয়েছিলেন নাকি?’

‘হ্যাঁ মনে পড়ছে, গিয়েছিলাম। জল প্রপাতটা খুব দেখার ইচ্ছে ছিল দিনা।’

‘ওখানেই তো পাওয়া গেছে লাশটা।’ তীক্ষ্ণ হল চীক ইল-পেঙ্কটের দৃষ্টি।

‘তাই?’ চেহারা অস্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তুলে বলল রানা।

‘আপনি গুলির আওয়াজ পাননি?’

‘কই না।’

কয়েকবৃহৎ একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল জাসন। ‘আমি ভেবেছিলাম আপনাকে প্রশ্ন করলে এই লাশ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাব। কিন্তু এখন দেখছি কিছুই আপনি জানেন না। তার মানে, এই খুনের রহস্যটা চিরকাল অমীমাংসিতই থেকে যাবে।’

রানা কোন উত্তর করল না।

নিভে যাওয়া পাইপে তামাক ভরে নিল চীক ইল-পেঙ্কট। ‘সুখী-রের একটা বোন আছে। ভারি সুন্দর দেখতে। কোথায় আছে সে,

জানেন ?

‘নিশ্চয়ই রিপালস বে-র বাড়িতে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে...

‘ওখানে নেই সে...খবর নিয়েছি আমরা,’ গভীর সুরে বলল জ্যাসন। ‘শেষ কখন, কোথায় তাকে দেখেছেন আপনি ?’

‘সিলভার মাইনে যাবার সময়, কেরী বোটে। এক বৃড়ি চাক-
রাণীকে কি যেন দেবার জন্যে যাচ্ছিল সে।’

‘তারপর তাকে আর দেখেননি আপনি ?’

‘কই বেবেছি বলে তো মনে পড়ছে না।’

‘আমার ধারণা, সুধীরের ওই বোন কনিকাই পুলিশ স্টেশনে
কোন করে জানায় আপনার ঘরে সুধীর আছে।’

‘অসম্ভব নয়। মেয়েটা আসলে খারাপ না। সুধীরের বোনও
নয় সে। সুধীর ওর হর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে নিজের কাছে
আটকে রেখেছিল...’

হঠাৎ হাসল চীক ইলপেট্টর। ‘এসব আমরা জেনেছি, মিঃ
ডিউক। কাল পাসপোর্ট নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে এখানে আসে সে।’

‘আরো কিছু বলতে চান মনে হচ্ছে ?’ ভুরু কুঁচকে তাকাল
রানা।

‘ওর টেলিফোন কলটা ট্রেস করতে পেরেছি আমরা। হোটেল থেকে
অপারেটর জানায়, কলটা করা হয়েছে আপনার সুইটের সংলগ্ন
বাথরুম থেকে। রাত দশটার দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও দেখা গেছে
তাকে। আমার বিশ্বাস, মেয়েটা এখনও আপনার সুইটেই আছে।’

‘সম্ভবত...আমিও তাই আশা করছি।’ হাতের বলন্ত সিগারেটের
দিকে চোখ রেখে বলল রানা। তারপর মুখ তুলল ও। ‘মেয়েটা
আমার ঝাণ বাঁচিয়েছে, চীক ইলপেট্টর। কি আশা করেন আপনি ?

আপনার হাতে ওকে তুলে দেব ?’

‘কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারের কাছে মিথ্যে কথা বলাও তো ভাল কথা নয়।’ সী-গালের পালক দিয়ে টোবাকো পাইপটা পরিষ্কার করতে করতে বলল চীফ ইন্সপেক্টর। ‘যাই হোক, মেয়েটার বিকছে আমরা কোন অ্যাকশন নিচ্ছি না। ও যে শুধু আপনার দাম বাঁচিয়েছে তাই নয়, ড্রাগ আগলারদের এই রিঙটাকে ভাঙার একটা সুযোগও করে দিয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু,’ মুখ তুলে তাকাল সে, ‘আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হঙকঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। চব্বিশ ঘণ্টা পর যদি এখানে তাকে দেখা যায়, তার বিকছে কিছু না করে আমাদের উপায় থাকবে না। আশা করি কথাটা তাকে আপনি জানিয়ে দেবেন।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ। বলব ওকে। হঙকঙ ছেড়ে আমার নিজেরও চলে যাবার সময় হয়েছে। এখানে আর কিছু করার নেই আমার। যদিও গুজি কোয়াঙ-র খুন্সী কে তা এখনও আমি জানতে পারিনি। যেই হোক, ঢাকাতেই আছে সে। এখানে আসার পর যা কিছু জানেছি, সেগুলোর সাহায্যে খুন্সীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করি।’

‘হঙকঙ ছাড়ার আগে আমাকে একটা খবর দেবেন,’ বলল জ্যা-লন। ‘অনুমতি নিতে হবে, তা বলছি না। নতুন কোন তথ্য পেলে সেটা আপনাকে জানাতে চাই।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। ‘এখন আমি হোটеле কিরে স্টেট ঘুম দেব।’

‘কিন্তু ওই রকম একটা সুন্দরী মেয়ে আপনাকে আদৌ ঘুমাতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।’ চেহারার কৃত্রিম গাঙ্গীর্ষ

কুটিয়ে বলল চীক ইন্সপেক্টর ।

রিপালস বে হোটেল । সি^৩ডি বেয়ে উঠে এল রানা । প্যাসেজে নতুন একটা চীনা ছেলেকে দেখল ও । তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলল ।

ভেতরে আলো জ্বলছে । একটা আর্মচেয়ারে বসে কিমাচ্ছে কণিকা । খুটখাট আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল । ছ'গোথে রাজ্যের ভীতি ফুটে উঠেছে ।

‘শাস্ত হও,’ দরজাটা বন্ধ করে বলল রানা । ‘ভয় পাবার আর কোন কারণ নেই তোমার ।’

‘গুলির আওয়াজ শুনে আমি মনে করেছি, আপনাকে ওরা মেরে ফেলেছে—’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কণিকা ।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা । ‘পুলিশকে ফোন করে আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি,’ বলল ও । ‘ধন্যবাদ ।’

‘ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, সুধীর যদি শুনতে পেত ডায়ালের আওয়াজ—’

‘সে যাক,’ বলল রানা । ‘তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে । দেশে ফিরতে পারবে এখন, পুলিশ বলেছে তোমার বিরুদ্ধে ওরা কিছু করবে না, যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হওকও ত্যাগ কর । ভাড়ার টাকা আমার কাছ থেকে পাওনা হয়েছে তোমার । নিজের পাসপোর্টই ব্যবহার করতে পারবে । আছে তো ?’

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল কণিকা । ‘আছে । কিন্তু সুধীর—’

‘পুলিশের গুলিতে মারা গেছে । তার জন্যে বরং ভালই হয়েছে ব্যাপারটা । সারা জীবন জেল খাটতে কষ্ট হত ওর ।’

‘সত্যি মারা গেছে ?’ শিউরে উঠল কণিকা ।

‘আমি এখন ঘুমাব,’ দ্বিতীয়বার একই প্রশ্নের উত্তর দেবার লয়োজন বোধ করল না রানা । ‘তার আগে শাওয়ারটা সেয়ে আদি । কুমিও তো সারারাত জেগে বসে আছ...ঠিক আছে, বিছানাটা তোমার, আমি ডিভানে শোব ।’

শাওয়ার সেয়ে বেডরুমে ফিরে এল রানা ।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছে কণিকা । তার পরনের সব কাপড়-চোপড় পড়ে রয়েছে মেঝেতে । বিছানার ওপর একটা চাদরের নিচে শুয়ে আছে সে ।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা । তারপর চাদরের ভেতর থেকে হাত দুটো বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কণিকা ।

ঢাকা । পুলিশ হেডকোয়ার্টার ।

একজন কনস্টেবলের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের চেম্বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা । মনোযোগ দিয়ে একটা ফাইল দেখছিল ফয়েজ আহমেদ, অনুমতি না নিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকেছে বুঝতে পেরে রাগের সাথে মুখ তুলল সে । রানাকে দেখেই নিজেকে সামলে নিল, চেহারায় ফুটে উঠল সিন্ধর এবং আগ্রহের ছাপ । ‘হ্যালো, ডিউক । ফিরে এসেছ তাকলে ? আমি তো ভাবলাম, হঠকত্তর মতো জারগায় তোমার রক্তবাকী কি আর ঠাই পাবে । ওখানকার মাস্তানরা তোমাকে গোখর গায়েবই করে ফেলবে । কিন্তু এখন দেখছি বহাল তবিরতে ফিরে এসেছ । বস, বস । কি খাবে বল ? চা ?’

কথা না বলে ডেস্কের সামনের চেয়ারটার বসল রানা, পায়ের

ওপর পা তুলে দিয়ে সরাসরি ডাকাল করেজ আহমেদের দিকে।
'আপনার কেসের খবর কি ভাই বলুন। খুনীকে ধরতে পেরেছেন?'

'আরে না। তার পিছনে এখনও লাগিনি আমরা। সময়
কোথায়। প্রথমে আমরা সেই রহস্যময় আতিকুল্লাহ খানকে খুঁজে
বের করার চেষ্টা করছি। তাকে পেলেই সুজি কোরাও র...'।

'বুঝেছি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'যেখানে দেখে গিয়েছিলাম
সেখানেই আছেন আপনারা, একচুলও এগোতে পারেননি।'

'তুমি?' বাঙ্গের সুরে জানতে চাইল করেজ আহমেদ, 'খুঁজে
পড়ল ডেস্কের ওপর। 'ওখানে গিয়ে তুমি কি উদ্ধার করে এলে
তিনি?'

'আপনার অন্য চমকপ্রদ একটা তথ্য উদ্ধার করে এনেছি,' বলল
রানা। 'সুজি কোরাও যে লাশটা হতকণ্ঠ থেকে নিয়ে এসেছিল সেটা
কার লাশ জানেন?'

'শফিকের।'

'না। ওটা শফিকের লাশ নয়।'

বোকার মতো করেক সেকেও রানার দিকে তাকিয়ে থাকল
করেজ আহমেদ। তারপর রুমাল বের করে ধীরে ধীরে মুখের ঘাম
মুছল সে। 'দেখ ডিউক, আমার সাথে চালাকি কর না। মিছে
কথা বলে আমাকে যদি বোকা বানাবার চেষ্টা কর...'।

'বড় বেশি বাজে কথা বলেন আপনি,' বিরক্তির সুরে বলল
রানা। 'যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। মাত্র ছ'দিন আগে খুন হয়েছে
শফিক। সাগর থেকে ব্রিটিশ পুলিশ উদ্ধার করেছে তার লাশ।
এই হত্যার মধ্যে প্লেনে তুলে ঢাকার পাঠানো হবে।'

ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকল করেজ আহমেদ। তারপর

ফিসফিস করে বলল, 'কি আশ্চর্য। তাহলে ককিনের ভেতর কার লাশ ছিল ওটা?'

'শহীদ আশরাফ নামে আর একজন বাংলাদেশীর ড্রাগ স্নাগ-
লার।'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে জানতে চাইল ইন্সপেক্টর, 'মিঃ মোখ-
লেশ্বর রহমানের সাথে দেখা করেছ?'

'করব।'

নাড়চড়ে বসল কয়েজ আহমেদ। 'আগাগোড়া পুরে' ঘটনাটা
খুলে বল আমাকে...না, এক মিনিট অপেক্ষা কর, তোমার বক্তব্য
লিখিয়ে নিতে চাই আমি।' কলিং বেল বাজিয়ে একজন স্টেনোগ্রা-
ফারকে ডেকে পাঠাল সে।

যুবা বয়সের একজন স্টেনোগ্রাফার ঢুকল ভেতরে রানার
পাশেই বসল সে। শুরু করল রানা। কণিকাও ওর সাথে ঢাকায়
এসেছে, এই কথাটা বাদ দিয়ে হতুকঙে যা যা ঘটেছে সব এক এক
করে বলল ও।

ঢাকা বিমান বন্দরেই রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে কণিকা।
নাগরিকত্ব আর চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে বাংলাদেশে থেকে যাবে,
আভাসে এই রকম একটা ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল রানাবে সে। কিন্তু
রানা তাকে নিরাশ করেছে। বলেছে, তাবাসেগের মতো এ-ধরনের
একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে
আরেকবার কৃপণতা প্রকাশ করেছে রানা, কৃতজ্ঞতাবোধ নিদর্শন
হিসেবে কিছু টাকা আর কিছু উপহার কিনে দিয়েছে তাকে। বিদায়
নেবার সময় চোখ দুটো ছল ছল করছিল কণিকার। 'আর আমা-
দের দেখা হবে না?' ধরা গলায় জানতে চেয়েছিল সে।

মিঃশেফে খাঁধা নেড়ে চলে এলেছে রানা।

রানার বলা শেষ হতে স্টেনোগ্রাফারকে বিদায় করে দিল ফয়েজ আহমেদ। নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর দ্বানতে চাটল, 'কিন্তু এসব থেকে বোঝা গেল না, সূজি কোয়াও খুন হল কেন?'

'বোঝার সময় পেরিয়েও যায়নি,' বলল রানা। 'ওই কফিনটা খুলে দেখতে হবে একবার। ওতে তো আর শফিকের লাশ নেই, কাজেই কবর থেকে তুলতে দিতে মীর সাহেব বোধহয় আপত্তি করবেন না?'

'আপত্তি করতেও পারেন...

'সেটা খামি দেখব,' বলল রানা।

কাগজে হিহিবিহি দাগ কাটতে কাটতে বলল ফয়েজ আহমেদ, 'ওখানেই আমার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। কফিনটা প্রথমেই আমার খুলে দেখা উচিত ছিল।'

উঠে দাড়াল রানা। 'চললাম। মীর সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে।'

'তুমি তাঁর অনুমতি পেলেই জানাবে আমাকে, কেমন? তোমার ফোনের আশায় থাকব আমি, তাই তো?'

'অনুমতি পেলেই জানাব আপনাকে,' বলে বেরিয়ে এল রানা।

গাড়িতে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল ও। মীর সাহেবের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। তার আগে পারভিনকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার। সেটা বিকেলের দিকে হলেই ভাল হয়। ঠিক করল, আগে রঞ্জি বিল্ডিংয়েই ফেরা যাক। ওর অফিসটার অস্তিত্ব এখনও আছে কিনা সেটা একবার দেখা দরকার।

রস্ত্রি বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি থেকে নামল রানা। লিফটে চড়ে উঠে এল টপ ফ্লোরে।

করিডোরের দু'পাশে সারি সারি অফিস কামরা। দরজায় হরেক রকম নামকলক। প্রথমেই বর্ণবীধি বাণী চিত্র, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সংস্থা। তারপর জোহরা ট্রাভেল। ছোট একটা প্যাসেঞ্জ, প্যাসেঞ্জের ওপাশেই—ডিউক, কনসালট্যান্ট' তার পরই বেশ বড় একটা সাইনবোর্ড, 'জাকের আলি চৌধুরী, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিস্ট'।

নিজের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বর্ণবীধি বাণী-চিত্রের দরজার আড়াল থেকে ঠিকই ওকে দেখতে পয়েছে হকুম আলি। প্রায় ছুটে কাছে চলে এল সে। রানা ঘাড় ফেরাতেই একগাল হাসল সে। 'হে, স্যার। আমি হকুম আলি। হডকড থিকা আইয়া পড়লেন, স্যার? লগে কিছু দেকতাহি না ক্যান, কিছু আনেন নাই?'

'কিছু আনতে গেছি তা কে বলল তোমাকে?' দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। 'হাও, চা নিয়ে এস।'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল হকুম আলি, 'আনতাহি, স্যার।'

ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিল রানা। পাশের কামরা থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিস্ট জাকের আলি চৌধুরী স্পষ্ট বসন্তর পাচ্ছে ও। সেক্রেটারীকে ডিকটেশন দিচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় মিনিট দুয়েক ধরে ওর গলাটা শুনল রানা। তারপর ধীর পায়ে ডেস্কের কাছে ফিরে এল। চিঠিপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল একবার। খনটাকে স্থির করতে পারছে না ও। কোন ব্যাপারই বেশিক্ষণ ধরে ভাবতে পারছে না। মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বারবার। চা নিয়ে

কিঁরে এল হুকুম আলি, দেখল, চেয়ারে বসে ডেকের ওপর মাথা
ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। চা রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

পাঁচ মিনিট পর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টেলিফোনের
রিসিভার তুলল রানা। মীর মঞ্জিলের বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করতেই
অপরপ্রান্তে থেকে সাড়া মিল পারভিন। ‘হ্যালো?’

‘ডিউক। মীর সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। আজই
বিবেলে।’

অপরপ্রান্তে ঝাড়া ছয় সেকেন্ড চুপ করে থাকল পারভিন। তার-
পর যুট্ট গলায় বলল, ‘বেশ তো। তিনটের দিকে আসতে পারেন।’

‘ভেরি গুড’ বলল রানা, কিন্তু তারপরও কোন ছাড়ল না।
পারভিন কিছু জিজ্ঞেস করবে আশা করে অপেক্ষা করল।

‘কিছু জ’নতে পেরেছেন?’ কয়েক সেকেন্ড পর চাপা গলায়
জিজ্ঞেস করল পারভিন। গলার আওয়াজটা ব্যাকুল কিনা ঠিক
বুঝতে পারল না রানা।

‘দেখা হলে বলব,’ বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

লাঞ্চ সেরে নিজেরসেই পুরনো ডেরায় ফিরল রানা। শাওয়ার সেরে
বাড়ি কামাল, পোশাক পান্টাল, তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে
পড়ল গাড়ি নিয়ে

মীর মঞ্জিল। উনি পরা বাটলার দরজা খুলে দিল রানাকে। পথ
দেখিয়ে নিয়ে চলল অন্দরমহলের দিকে। সোজা পারভিনের অফিস
কামরার সামনে এসে থামল বাটলার, নক করল, পথ ছেড়ে দিয়ে
সরে দাঁড়াল এক পাশে। ভেতরে ঢুকল রানা। ডেস্ক বসে কাজ
করছে পারভিন। চেহারাটা ম্লান, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। ‘আমুন, মিঃ

ডিউক। বসুন।’

এগিয়ে এসে ডেকের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। সিগারেট ধরাল। মুহূর্ণ্যে বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজাটা। রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পারভিন। তার চোখের কোলে রাত আগার কাল ছাপ।

‘মিনিট দশেক পর আপনার সাথে দেখা করবেন মিঃ রহমান,’ বলল সে। ‘আপনার হওকঙ বাওয়া সফল হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, সফল এবং সার্থক হয়েছে,’ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বলল রানা। ব্যাগটা থেকে একটা কটো বের করল ও। শহীদ আশরাফের কটো, যেটা ওকে এই পারভিনই দিয়েছিল। কটোটা পারভিনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। ‘আমাকে দিয়েছিলেন এটা, মনে পড়ে?’ বলেছিলেন, এটা শফিকুর রহমানের কটো।’

ছবিটার দিকে তাকাল পারভিন। চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। ‘হ্যাঁ, বলেছিলাম।’

‘মীর সাহেবের সাথে দেখা হলে কটোটা তাকে দেখিয়ে বলবেন আপনি বলেছিলেন এটা তাঁর ছেলের কটো।’

মাথা নিচু করে নিজের হাত ছটোর দিকে তাকাল পারভিন। ‘ও কেমন আছে?’

‘কে, শফিক? এখন সে মৃত।’

পারভিনকে শিউরে উঠতে দেখল রানা। মুহূর্তের জন্যে এক চুল নড়ল না সে। তারপর আবার মুখ তুলে তাকাল। চেহারাটা আগের চেয়ে ত্রিমান দেখাল, চোখের দৃষ্টিতে সব হারাবার ব্যথা কুটে উঠেছে। ‘কি ঘটেছিল?’ কিসকিস করে জানতে চাইল সে।

‘ড্রাগ স্মাগলিংয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সে, জানতেন আপনি?’
‘হ্যাঁ... জানতাম।’

‘ডাবল ক্রস করার চেষ্টা করে সে, কিন্তু সঙ্গীদের হাতে ধরা
পড়ে যায়। আপনি জেনেছিলেন কিভাবে?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পারভিন। তারপর বলল, ‘সেই জানিয়ে-
ছিল আমাকে। কেউ জানে না, স্ত্রী হিসেবে আমাকে ও অস্বীকার
করার পরও আমি ওকে ভালতে পারিনি। আমি একটা বোকা
মেয়ে। ওর ওপর আমার দুর্বলতা আছে, বুঝতে পেরে এই দুর্বল-
তার সুযোগ নিত ও। ওর সমস্ত অপরাধের কথা আমাকে জানাত।
বুঝতাম এসব আমাকে জানিয়ে ও এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পেত।’

‘কিন্তু শহীদ আশরাফের ফটোটাকে শফিকের ফটো বলে চালা-
বার চেষ্টা করেছিলেন কেন?’

‘মি: রহমান একজন মহৎপ্রাণ, আদর্শ মানুষ। তাঁর মতো সৎ
এবং ভাল মানুষ আমার জীবনে আমি আর দেখিনি। এই নিরীহ
ভদ্রলোকের কাছে গোপন করতে চেয়েছিলাম আমি। ছেলে একজন
ড্রাগ স্মাগলার এটা আমি তাঁকে জানতে দিতে চাইনি।’

‘ফটোটো আপনি পেয়েছিলেন কোথেকে?’

‘শফিক ওর বাবার কাছে বছরে একটার বেশি চিঠি না লিখলেও,
আমার কাছে প্রায়ই লিখত,’ বলল পারভিন। ‘একটা চিঠির ভেতর
ফটোটো সেই আমাকে পাঠিয়েছিল। শুধু শহীদ আশরাফের ফটো নয়,
হঠকতে ওর সাথে বাদেও পরিচয় হত তাদের প্রায় সবারই ফটো
পাঠাত ও বেশিরভাগই চীনা মেয়েদের ফটো। মেয়েদের ফটো
পাঠিয়ে খুব মজা পেত ও, জানত আমি তাতে দুঃখ পাই। শহীদ
আশরাফের ছবিটা হঠাৎ করেই একদিন পাঠায় ও। চিঠিতে লিখে-

ছিল, আশরাফের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছে ও । ব্যবসার কথাটা যে মিথ্যে নয় সেটা বিশ্বাস করাবার জন্যেই বোদহ পাঠিয়েছিল ওটা । ওর বাবাকে বলে আমি যেন ওকে পাঁচ হাজার ডলার পাঠাবার ব্যবস্থা করি, যাতে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে ।

‘টাকা পাঠিয়েছিলেন ?’

‘মিঃ রহমানকে আমি কথাটা বলতেই সাহস পাইনি ’ বলল পারভিন । ‘আমার নিজের আকাউন্টে কিছু টাকা ছিল তা থেকে হাজার দশেক টাকা পাঠিয়েছিলাম । তারপরই ওর চিঠি এল, সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে ও । চিঠি পড়েই বুকেছিলাম ভবে একে-বারে কুঁকড়ে গেছে ও । চিঠিতে লিখেছিল, একটা ড্রাগ স্মাগলারদের দলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সে । তারা এখন একে খুন করার চেষ্টা করছে । লিখেছিল কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে ও । শহীদ আশরাফ মারা গেছে, কিন্তু দলের লোকেরা জানে শহীদ আশরাফ নয়, মারা গেছে শফিক । ওর স্ত্রী সুজিকোয়াও আশরাফের লাশ নিয়ে ঢাকায় আসছে । ও যে মারা গেছে তা দলের লোকদের দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করাবার সেটাই নাকি একমাত্র উপায় ছিল ’ কাঁচ ঝাঁকাল পারভিন । ‘ও যে এতটা নীচে নেমে গেছে, ভাবতেও পারিনি আমি । আমাকে অস্বীকার করার যতটা না আঘাত পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেলাম ওর এই অধঃপতন দেখে । যাই হোক, আমি চাইনি এসব কথা মিঃ রহমানের কানে উঠুক । কাজটা অন্যায় হচ্ছে, কটোটা আপনাকে দেবার সময়ই ভেবেছি কথাটা, কিন্তু মিঃ রহমানের মুখ চেয়ে অন্যায়টা না করে পারিনি ।’

রানা কিছু বলল না দেখে আবার শুরু করল পারভিন । ‘ওয়ার্ল্ড পিও হো নামে একজন চীনার ঠিকানা দেয় আমাকে ও । কোন জরুরী

‘স্বপ্নর থাকলে আমি যেন এই লোককে চিঠি লিখি। ঢাকায় পৌঁছে শ্রুতি যখন মারা গেল, এবং মিঃ রহমান যখন ঠিক করলেন আপনাকে তিনি হঠকতে পাঠাবেন, চিঠি লিখে আমি তখন এই ওয়াম পিও হো-কে সাবধান করে দিই। আমি যে আপনাকে শহীদ আশরাকের কটো দিয়েছি, সে কথাও তাকে জানাই। মিঃ রহমানের কাছ থেকে সত্য গোপন রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি।’

‘কিন্তু এখন তো তাঁকে সব কথা আমার জানাতেই হবে,’ বলল রানা। ‘সত্য জানার জন্যেই তো আমাকে তিনি হঠকতে পাঠিয়েছিলেন।’

‘নিঃসঙ্গ একজন বৃদ্ধ, তাঁকে শান্তিতে মরতে দিলে কতি কি?’ ডেকের ওপর খুঁকে পড়ল পারভিন। ‘তাঁর ছেলে অসং সংসর্গে পড়ে একবারে গোলায় গিয়েছিল, এ-কথা জানালে তাঁর অশান্তি আরো শুধু বাড়ানোই হবে।’

‘এখন আর তা সম্ভব নয়। কবর খুঁড়ে লাশ বের করে সেটা পরীক্ষা করতে হবে। পুলিশও এখন নাক গলাবে।’ পারভিনের চোখে চোখ রেখে আবার বলল রানা, ‘এসবের সাথে আপনি যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সেটা আমি দেখব। এইটুকুই করতে পারি আমি।’

দরজার নক হল, ভেতরে ঢুকল বাটলার। ‘মিঃ রহমান আপনার সাথে দেখা করবেন, স্যার।’

বাটলারকে অনুসরণ করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

নির্জন লিভিংরুমে বসে আছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। যেখানে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছিল রানা, সেখানেই, সেই বেডসাইড চেয়ারে বসে আছেন তিনি। রানার মনে হল, সেই থেকে একবারও যেন তিনি

চোরার ছেড়ে ওঠেননি। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে, রানার উপস্থিতি যেন টেরই পেলেন না। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘এস, ডিউক। বস।’ রানার দিকে তাকালেন না, তবে একটা ঝাঙ তুলে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। ‘আমার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু খবর নিয়ে এসেছো তুমি?’

‘এনেছি’ মুহূর্তে গলায় বলল রানা। ‘কিন্তু তার কোনটাই সুসংবাদ নয়, মিঃ রহমান।’

‘তা না হোক,’ বললেন বুদ্ধ। ‘আমি হুঃসংবাদ শোনার জন্যেই তৈরি হয়ে আছি কি এনেছ সব বল আমাকে।’

শক্তিক সম্পর্কে যা জানা গেছে, সবই বলল রানা। কিন্তু শক্তিক কিভাবে মাথা গেছে সেটা শুধু চেপে গেল। বলল, লাশটা সাগর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সেই জানালার দিকে চোখ রেখেই সব শুনলেন বুদ্ধ। রানার কথা শেষ হতেও কিছু বললেন না। পাশ থেকে রানা দ্রবল, বুদ্ধের চোখ দুটো ছলছল করছে।

অনেকক্ষণ পর জানতে চাইলেন, ‘আর কি ঘটতে বাকি থাকল তাহলে?’

‘কবর খুঁড়ে লাশটা পরীক্ষা করতে চাইবে পুলিশ,’ বলল রানা, ‘সেজন্যে আপনার অনুমতি দরকার।’

‘আমার কোন আপত্তি নেই। মৌখিক অনুমতিই বোধহয় যথেষ্ট।’

‘যথেষ্ট,’ বলল রানা। ‘আপনার ছেলের লাশ ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি আমি। এই হপ্তার শেষ দিকে পৌঁছাবে।’

‘ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।’ মুহূর্তে গলায় বললেন তিনি। তার-

পর ধীরে ধীরে, এই প্রথম রানার দিকে তাকালেন। ‘ভাবতেও পারিনি শফিক এতটা নীচে নেমে গিয়েছিল...ভাগ স্নাগলার, কি জঘন্য ব্যাপার।’

চূপ করে থাকল রানা।

আবার জানালায় গিকে তাকালেন বৃদ্ধ। অনেকক্ষণ চূপ করে থাকার পর মৃত গলায় বললেন, ‘তবু, আমার ছেলে ছিল সে। আমার একমাত্র সন্তান! মীর বংশের শেষ প্রতিনিধি। ওর সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিতে পারি, দিইছিও। হুঃখ, মীর বংশে আলো ছাটার মতো কেউ থাকল না।’ ধীরে ধীরে আবার রানার দিকে ফিরলেন তিনি। ‘আমার মতো দুর্ভাগা কোথাও আর দেখেছ? তুমি জান না, কেউ জানে না, সুজিকে বিয়ে করার আগে ঢালায় আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল শফিক। কিন্তু সেই বিয়েটাকে স্বীকার করেনি ও। সমাজের কথা ভেবে, বংশ মর্যাদার কথা ভেবে বিয়েটাকে আমিও স্বীকৃতি দিতে পারিনি। কি করে দেব। সাক্ষী প্রমাণ কিছুই যে ছিল না।’ হঠাৎ যেন সশ্বিত ফিরে পেলেন তিনি উপলব্ধি করলেন বাইরের একজন লোকের কাছে অনেক বেশি কথা বলে ফেলছেন। ক্রমশ দিয়ে চোখ দুটো মুছলেন। খোলা জানালাটা আবার তাঁর দৃষ্টি কড়ে নিল। ‘ওর স্ত্রী, সুজি কোয়াও সম্পর্কে কিছু জানা গেল? কে তাকে খুন করেছে?’

‘এখনও জানতে পারিনি,’ বলল রানা। ‘তার খুনীকে খুঁজে বের করি, এখনও আপনি তা চান?’

‘নিশ্চয়ই চাই।’ জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধ।

‘তাহলে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার হবে আমার,’ বলল রানা। ‘আপনার ছেলের অবর্তমানে আপনার সম্পত্তির মালিক হবে কে?’

অবাক হলেন বুদ্ধ। তাড়াতাড়ি রানার দিকে তাকালেন। ‘তা
জেনে তোমার কি দরকার?’

‘ব্যাপারটা যদি একান্তই গোপনীয় হয়, তাহলে না হয় থাক।’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন বুদ্ধ। শিরা ওঠা হাত দুটো
চেয়ারের হাতলে সঁটে গেল। ‘না, গোপনীয় কিছু নয়। কিন্তু তুমি
জানতে চাইছ কেন?’

‘শক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী বেঁচে থাকলে আপনাব উইলে কি তার
নাম থাকত?’

‘অবশ্যই।’

‘সম্পত্তির কতটা অংশ পেত সে?’

‘অর্ধেক।’

‘তাহলে বাকি অর্ধেক কে পেত?’

‘পারভিন, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাকে আমি মেয়ের
মতো ভালবাসি।’

‘তার মানে এখন পারভিনই সবটা পাবেন?’

চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বুদ্ধ। ‘হ্যাঁ, সবটা
এখন তাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এত
কেন কৌতূহল তোমার?’

‘কৌতূহলী হওয়াই আমার পেশা,’ বলে বিদায় নিল রানা।

অফিস কামরার ডেস্কে এখনও বসে আছে পারভিন। পায়ের
আঙুরাছে মুখ তুলল সে। ‘আমুন, মি: ডাউক।’

ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রানা। ‘শক্তির বন্ধু-বান্ধবদের একটা
তালিকা আর তাদের ফটো চেয়েছিলাম আমি, মনে আছে?’

‘মাত্র পাচটা ফটো পাওয়া গেছে অ্যান্ডাম থেকে,’ দেবাজ থেকে

একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল পারভিন।
'আমাদের বিয়েতে এরা কেউ উপস্থিত ছিল না। কিন্তু তালিকার নাম
আছে সাত জনের, এরাও কেউ আমাদের বিয়েতে উপস্থিত ছিল না।
তার মানে, এদের যে-কেউ একজন সেই দাড়িওয়ালা নকল মৌলভী
হতে পারে।'

এনভেলাপ খুলে ফটো এবং নামের তালিকাটা দেখল রানা।
একজনও ওর পরিচিত নয়। 'ধন্যবাদ।' ফটো আর নাম ঠিকানা
লেখা কাগজটা এনভেলাপে ভরে সেটা পকেটে রাখল রানা।

'কি বললেন মিঃ রহমান?'

'মীর বংশে আলো ছাটার কেউ রইল না, সেটাই তাঁর সবচেয়ে
বড় দুঃখ।'

মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল পারভিন, একটা
নিঃশ্বাস চাপল। 'এরপর?'

'তিনি চান তাঁর পুত্রবধূর খুনী ধরা পড়ুক,' বলল রানা। 'দারিদ্ৰ্যটা
নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু খুনীকে কি ধরা সম্ভব?'

তীক্ষ্ণ হল রানার দৃষ্টি। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। সব
হত্যাকাণ্ডের পিছনেই একটা মোটিভ থাকে। সুজি হত্যাকাণ্ডের
পিছনেও নিশ্চয়ই কোন মোটিভ আছে। মোটিভটা কি হতে পারে,
সে-সম্পর্কেও আমার একটা ধারণা আছে। যাই হোক, দেখা যাক
শেষ পর্যন্ত কি হয়। চলি।'

রানার গমন পথের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল পারভিন।

বার

ডেরায় ফিরে এল রানা। কোন করে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে জানাল, কবর খুঁড়তে দিতে কোন আপত্তি নেই মীর সাহেবের। দল-বল নিয়ে এখনি রওনা হয়ে যাচ্ছে জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল ইন্সপেক্টর।

আধঘণ্টার পর ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল রানা। ‘হ্যালো?’

‘কবর খুঁড়েছিল কেউ। কবর থেকে লাশ উদ্ধার।’ অপর প্রান্তে নাগাখাতিক উত্তেজিত ফয়েজ আহমেদের কণ্ঠ। ‘ককিন বসে কিছু মীসা ছাড়া আর কিছু নেই।’

‘মীসা।’

‘হ্যাঁ, মীসা।’

‘তার মানে, ককিনে বোধহয় আদৌ কোন লাশ ছিল না।’ বলল বানা।

‘সে কি। লাশ ছিল না।’ আতকে উঠল ফয়েজ আহমেদ। পরমুহুর্তে প্রচণ্ড রাগের সাথে হকার ছাড়ল, ‘কাজটা তুমি ভাল করছো না, ডিউক।’

‘কোন কাজটা?’ অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

‘এই যে, যা যা জান তা আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছ

না। এই রকম আর কি গোপন করে রেখেছ আমার কাছ থেকে ?’

‘আমি যা জানি সবই আপনাকে জানিয়েছি,’ শান্তভাবে বলল রানা। ‘কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারপর আমি আর মাথা ঘামাব না।’

‘মাথা ঘামিয়ে কি জানতে পেরেছো তাড়াতাড়ি বল আমাকে।’ খানিকটা হুমকি, খানিকটা আবদারের সুরে বলল ইন্সপেক্টর। ‘কফিনে লাশ ছিল না, এ-কথা তোমার মনে হল কেন ?’

‘ওটা আমার একটা অনুমান। আশরাফের লাশ পুড়ে একে-বারে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেটা কফিন থেকে চুরি করে কার কি লাভ ? ওটা আর সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কবর থেকে লাশ চুরি করার খুঁকি আছে, কেউ সে খুঁকি অকারণে নেবে কেন ? কফিনে শফিকের লাশ ছিল না, এটা জানার পর আমি মনে করেছিলাম ওটার বোধহয় শহীদ আশরাফের লাশ আছে। কিন্তু এখন ভাবছি, কফিনে কোন লাশই ছিল না। সীসা ভরে ঢাকায় পাঠান হয়েছে ওটা।’

‘তাহলে কবর খোঁড়া হয়েছে কেন ?’

‘তাই তো।’ চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পরমুহূর্তে কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁ হাত দিয়ে নিজের উরুর ওপর চাপড় মারল ও। ‘কি বোকা আমি। পানির মতো সহজ ব্যাপার, অথচ মাথায় ঢোকেনি।’

‘তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’ অপরপ্রান্ত থেকে শাসানির সুরে বলল ইন্সপেক্টর।

‘কফিনের ভেতর হিরোইন ছিল।’ বলল রানা। ‘হ’হাজার আউন্স হিরোইন। হওকঙ থেকে ঢাকায় আগল করার চমৎকার একটা

‘ঠিক।’ উৎকল গলা শোনা গেল কয়েক আহমেদের। ‘ঠিক ধরেছ। আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি, ডিউক...’

‘জিনিসটা শক্তিক হাইড্রাক করার পর,’ বলল রানা, ‘আবিষ্কার করল, সে কেসে গেছে। হঙকঙ ছেড়ে বেরবার উপায় নেই তার, ওদিকে দলের লোকেরা তাকে খুঁজছে। দু’হাজার আউল হিরোইন নিশ্চয়ই বিরাট একটা সম্পদ। দলের লোকদের বিশ্বাস করা-বার দরকার ছিল শক্তিকের, যে সে মারা গেছে। কাজেই এক টিলে দুটো পাখি মারার ব্যবস্থা করল সে। তার লাশ ঢাকায় পাঠাতে হবে, সেজন্যে টাকা দরকার, এই কথা জানিয়ে সুজিকে দিয়ে বাবার কাছে চিঠি লেখাল শক্তিক। মনে রাখবেন শক্তিকের কাছে কোন টাকা সে সময় ছিল না। কফিন ঢাকায় আনার জন্যে বুড়ো মীর সাহেব টাকা পাঠালে তবেই হিরোইনটা হঙকঙ থেকে পাচার করা সম্ভব, এবং এটাই একমাত্র উপায় ছিল। সুজিকে পাঠিয়ে লাশ নিয়ে আসার লরকারী অনুমতি আদায় করা হয়। পরে কোন এক সময় আশরাফের লাশটা নিশ্চয়ই ফেলে দেয়া হয় সাগরে, তার জায়গায় কফিনে ওরা হয় হিরোইন আর সীসা। শক্তিক হঙকঙে আটকা পড়লেও, হিরোইন এবং নিজের স্ত্রীকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিল সে।’

‘কবর খুঁড়ে কফিন থেকে হিরোইনটা তাহলে সরাল কে?’ বুক ওরা আশা নিয়ে জানতে চাইল কয়েক আহমেদ।

‘আমি কিভাবে জানব। চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন বলেছিল, খুন করার আগে শক্তিকের ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়। হিরোইন কোথায় আছে তা হয়ত বলতে বাধ্য হয়েছিল শক্তিক। দলের লোকেরা হয়ত আমার পৌছবার আগেই লোক পাঠিয়েছিল

চাকায়। কাজটা তাদের হওয়া বিচিত্র কি ?’

‘হতে পারে, তাও হতে পারে।’ গভীর সুরে বলল কয়েজ আহমেদ। ‘খাই হোক, হিরোইন-টিরোইন নারকোটিক ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে, আমি কেন নাক গলাতে যাই। যাক, সব সমস্যারই তা-হলে মীমাংসা হয়ে গেল।’

‘কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনও যে হল না।’

‘সেকি। আবার কিসের সমস্যা।’

‘চীনা মেয়েটা আমার অফিসে কেন এসেছিল, কে তাকে গুলি করে খুন করল, এসব প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া গেল ?’

ধমধমে গলায় অপরপ্রাস্ত থেকে বলল ইন্সপেক্টর, ‘না।’

‘হিরোইনের সাথে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই, এটা ধরে নিয়ে কেসটা নিয়ে মাথা ঘামালে দাঁড়ায় সুজি কোয়াং মীর সাহেবের অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হত—মীরসাহেব নিজে আমাদের বলেছেন কথাটা। সেইসাথে বলেছেন, সুজি মারা যাওয়ায় এখন তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে সেক্রেটারী পারভিন।’

‘আচ্ছা।’ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল কয়েজ আহমেদ। ‘তাই নাকি ? তুমি তাহলে মনে করছ সুজিকে ওই সেক্রেটারী পারভিন খুন করেছে ?’

‘ঠিক তা মনে করছি না,’ বলল রানা। ‘আমি শুধু বলতে চাইছি প্রায় দশ কোটি টাকার একটা মোটিভ আছে তার। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, পারভিনের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বয়-ফ্রেণ্ড থাকতে পারে। কিন্তু আমার এসব অনুমান সত্যি হলেও কিন্তু চীনা মেয়েটার আমার অফিসে এসে খুন হবার ঘটনাটার ব্যাখ্যা পাওয়া যার না।’

‘আরেকটু মাথা ঘামাও, সব সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে,’ দ্রুত বলল ইন্সপেক্টর। ‘আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি মেয়েটার কোন বয়স-ফ্রেণ্ড আছে কিনা। নতুন কিছু জানতে পারলেই ফোন করবে আমাকে, তাই তো?’ রানার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রিসিভার রেখে দিল সে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। বিকেল পাঁচটা। একটু ব্যস্তভাবেই দরজায় তালি লাগিয়ে ডেরা থেকে বেরিয়ে এল ও। গাড়ি নিয়ে ছুটল রাস্তা বিল্ডিংয়ের দিকে। পথে একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে থামল একবার। ছবি আঁকার সরঞ্জাম একটা তুলি আর এক শিশি কাল কালি কিনল।

অফিস কামরার দরজা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে ভাল করে চারদিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঢুকল নিজের চেম্বারে। কার্পেটের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালা খুলল। একটু পর পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল কানে। পাশের কামরার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চোখুরী, তার সেক্রেটারী মেয়েটাকে বলছে, ‘আমি গেলান! সকালে দেখা হবে!’ প্যাসেজে তার পায়ের আওয়াজ পেল রানা। ভাবল, অফিস খোলা দেখে নিশ্চয়ই চুঁ মারবে একবার। কিন্তু না, তারী পায়ের আওয়াজ থামল না, ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল দূরে।

পকেট থেকে পারভিনের দেয়া এনভেলাপটা বের করে ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা। ডেস্কের ওপর এনভেলাপটা রেখে চিন্তিতভাবে খোলা দরজার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল ও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। জাকের আলি চোখুরীর অফিস ডেস্কের ওপর, কীচের নিচে অনেকদিন আগে একটা জিনিস দেবেছিল ও, সেটা এখন দরকার ওর।

প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। সাড়ে পাঁচটার ওপর বাজে, বেশির-ভাগ অফিসই বন্ধ হয়ে গেছে। প্যাসেজ একেবারে ফাঁকা। ইন-ডাক্তিয়াল কমিস্টের অফিস খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। পর্দা সরিয়ে উকি দিল রানা। সামনের কামরায় কেউ নেই। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ও। ভেতরের কামরা থেকে অস্পষ্টভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে।

এক মিনিট পর খুক খুক করে কাশল রানা। প্রায় সাথে সাথে পর্দা সরিয়ে ভেতরের কামরা থেকে উকি দিল সুন্দরী সেক্রেটারী মেয়েটা। তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার দেখল রানা। ‘ও, আপনি!’ স্বস্তির সাথে হাসল সে। ‘আমি ভেবেছিলাম বস্ বোধহয় আবার ফিরে এলেন। দাঁড়িয়ে কেন বসুন, মিঃ ডিউক।’

‘জাকের সাথেই চলে গেছেন?’ একটু নিরাশ দেখাল রানাকে। ‘একটা ব্যাপারে পরামর্শ দরকার ছিল আমার .. ঠিক আছে, কাল সকালে কথা বলব।’ চোখের দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটার হাতে ধরা টেপ রেকর্ডারের দিকে তাকাল রানা। ‘গান শুনছিলেন নাকি?’

‘হ্যাঁ, মানে, না।’

‘হ্যাঁ, মানে, না—তার মানে?’

ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটা। ‘না, মানে, বস্ তো গান শোনার জন্যে এটা ব্যবহার করেন না, তাই এখানে গানের কোন ক্যাসেট নেই। কিন্তু আজ আমি বাড়ি থেকে একটা ক্যাসেট নিয়ে এসেছি গান শুনব বলে। বস্ হয়ত অফিসে গান বাজনা পছন্দ করবেন না, তাই...’

‘বুঝেছি,’ হেসে উঠে বলল রানা। ‘তাই গান শোনার কথাটা স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছিলেন। ভয় নেই, তাকে আমি কিছু বলব

না। তা, টেপ রেকর্ডারটা এখানে রাখা হয়েছে কেন ?’

‘বস্ এটা ডিকটেশন দেবার জন্যে ব্যবহার করেন।’

‘ও,’ বলল রানা। ‘ঠিক আছে, আপনি গান শুনুন।’ বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল জাকের আলি চৌধুরীর অফিস কামরা থেকে।

এক ঘণ্টা পর। মীর মঞ্জিল। সেক্রেটারী পারভিনের অফিস কামরা।

এনভেলোপ থেকে ছয়টা ফটো বের করে পারভিনের সামনে ডেস্কের ওপর এক এক করে রাখল রানা। ফটোর প্রতিটি লোকের মুখে রঙ তুলি দিয়ে দাড়ি আঁকা রয়েছে।

ফটোগুলোর দিকে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়েই মুখ তুলল পারভিন। ‘আপনাকে তো আমি পাঁচটা ফটো দিয়েছিলাম, ছয়টা হল কিভাবে।’

‘কোন প্রশ্ন নয়,’ বলল রানা। ‘ফটোগুলো দেখে বলুন, সেই নকল মৌলভী এদের মধ্যে আছে কিনা ?’

ফটোগুলোর দিকে আবার তাকাল পারভিন। প্রথম ফটোটা সরিয়ে রাখল ও। দ্বিতীয়টাও। কিন্তু তৃতীয় ফটোর দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। ঝট করে রানার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকাল সে, তারপর আবার খুঁকে পড়ল ফটোটোর দিকে। কয়েক সেকেন্ড গভীর মনোযোগের সাথে দেখল ছবিটা। তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। ‘কোন সন্দেহ নেই। এই সেই লোক। কে ও ? আমি যাদের ফটো দিয়েছি, তাদের মধ্যে কেউ ? নাম... ?’

হাত বাড়িয়ে তিন নম্বর কটোটা তুলে নিল রানা। শাটের
লকেটে ফেলল সেটা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। ‘আপাততঃ
বিদায়। তবে, আবার আমি আসতে পারি। তখন হয়ত মীর সাহে-
বের সাথে দেখা করার দরকার হবে আমার।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পারভিনও। ‘দাঁড়ান।’ চোখে ব্যা-
কুলতা ফুটে উঠল তার। ‘লোকটার পরিচয় বলে যান আমাকে।
মুজ।’

‘কিছু বলার সময় এখনও হয়নি,’ বলে বেরিয়ে এল রানা।

গাড়ি নিয়ে সোজা আবার নিজের অফিসে ফিরে এল ও। সাত-
টার ওপর বাজে। রঞ্জি বিল্ডিংয়ের সব অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। নি-
জের অফিসের তালি খোলার সময় ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, জাকের
আলি চৌধুরীও অফিসেও তালি খুলছে।

নিজের অফিসে কিছুক্ষণ বসল রানা। প্যাসেজে লোকজনের
আসা যাওয়া নেই। দেরাজ খুলে চাবির একটা রিঙ বের করল ও,
তাতে এক গোছা চাবি। নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে প্যাসেজটা
দেখে নিল ভাল করে। কেউ নেই কোথাও। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমি-
স্টের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। তালি খুলতে হু’মিনিটের
বেশি লাগল না ওর। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, ভেতর থেকে
আবার তালি লাগাল। দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, তাকাল
চারদিকে। একদিকের দেয়াল বেঁধে দাঁড় করানো রয়েছে বড় একটা
স্টীলের ফায়ারপ্রুফ আলমিরা। তালিটা পরীক্ষা করল ও। ওর
রিঙের কোন চাবি দিয়ে খোলা যাবে না এটা। নিজের অফিসে ফিরে
এল ও, কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে আবার ঢুকল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিস্টের
অফিসে।

আলমিরার তালি খোলার জন্যে একটানা পনের মিনিট ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। একবার ভাবল, তালিটা ভেঙে ফেলবে কিনা, কিন্তু খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর ইচ্ছেটাকে বাতিল করে দিল। ভেতরের কামরাটা পরীক্ষা করল ও। এখানে ডেস্ক, টেপরেকর্ডার, টাইপরাইটার, চেয়ার এবং ফাইলিং কেবিনেট ছাড়া আর কিছু নেই। টেপরেকর্ডারের পাশে একটা ক্যাসেট পড়ে রয়েছে। ফাইলিং কেবিনেটটা পরীক্ষা করল ও। কাগজ-পত্র ছাড়া আর কিছু নেই। ও যা খুঁজছে তা যদি এই অফিসে থাকে তাহলে সেটা স্টীলের ওই আলমিরাতেই আছে।

অফিসের আলো জ্বলে এবং ঘর দুটোর দরজা খোলা রেখে ফিরে এল রানা। টেলিফোন গাইড খুলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিস্টের বাড়ির ফোন নম্বার বের করল ও। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। কিন্তু অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলল না।

ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে ডাকবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু এই কেসের শেষ অংশে কাউকে হাত লাগাতে দিতে মন চাইল না। ওর সন্দেহ মিথ্যেও হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঠিক করল, আগে কথা বলবে জাকের আলি চৌধুরীর সাথে, তারপর খবর দেবে ফয়েজ আহমেদকে।

আবার ডায়াল করল ও। খানিক পর আবার। রাত ন'টার দিকে অপরপ্রান্তে পাওয়া গেল তাকে।

‘আমি ডিউক বলছি।’

‘আরে, মিঃ ডিউক... ব্যাপার কি বলুন তো। আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আমাকে ফোন করবেন। বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি? হঠকণ্ডে কেমন বেড়ানো হল?’

‘ভাল,’ বলল রানা। ‘আমার অফিস থেকে বলছি, মিঃ চৌধুরী। ভুল করে একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম, সেটা নিতে এসে দেখি আপনার অফিসের দরজা খোলা, আলোও জ্বলছে, অথচ ভেতরে কেউ নেই। আপনার নাম ধরে ডাকলাম, আপনার সেক্রেটারীর নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু কারো সাড়া পেলাম না। আপনার সেক্রেটারী বোধহয় যাবার সময় দরজায় তালা দিতে ভুলে গেছে। দারোয়ানকে ডেকে তালা লাগিয়ে দিতে বলব, নাকি...?’

জাকের চৌধুরীর নিঃশ্বাস আটকে যাবার আওয়াজ পেয়েছে রানা। কোনমতে বলল, ‘সে কি। আজব ব্যাপার। এমন তো হবার কথা নয়। ঠিক আছে, আমি আসছি...’

‘চোর-টোর এসেছিল বলে মনে হয় না...’

‘ট্রেপ রেকর্ডার আর টাইপ রাইটার ছাড়া চুরি হবার মতো কিছু নেই ওখানে,’ দ্রুত বলল জাকের চৌধুরী, ‘তবু আমার বোধহয় একবার যাওয়া দরকার।’

‘আপনার ইচ্ছে। আমি কিন্তু দারোয়ানকে ডেকে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম।’

‘না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই আসছি। মেয়েটা তালা লাগায়নি কেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এর আগে কখনও এ ধরনের ভুল হয়নি তার।’

‘কোন কারণে হয়ত তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে গেছে। যাই হোক, আমি কিন্তু অফিস থেকে চলে যাচ্ছি। নাকি আপনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব?’

‘না-না। তার কোন দরকার নেই। খবরটা দিয়েছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, মিঃ ডিউক। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

পাশের কামরা

‘ও কিছু না। ছাড়লাম।’

রিসিভার রেখে দিয়ে অফিসের আলো নিভিয়ে দিল রানা।
প্যাসেঞ্জে বেরিয়ে এসে তালা দিল দরজায়। তারপর জাকের আলি
চৌধুরীর অফিসে ঢুকল। দরজা খোলাই থাকল, আলোও নেভাল না
রানা। বসল ভেতরের কামরার ডেস্কের ওপর। পকেট থেকে রিভল-
ভার বের করে অফ করল সেফটিক্যাচ। কোলের ওপর রাখল সেটা।
তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

দশ মিনিট পর প্যাসেঞ্জে ফ্রুত পায়ের আওয়াজ পেল রানা।
হীটার ভারি শব্দটা পরিচিত, কে আসছে বুঝতে অসুবিধে হল না।
ডেস্ক থেকে নিঃশব্দে নেমে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। দরজার
ফাটলে চোখ রেখে সামনের কামরার ভেতর তাকাল। প্যাসেঞ্জে
দেখা গেল জাকের চৌধুরীকে। উদ্ভিগ্ন চেহারা, মাথার চুল এলো-
মেলো, চোখ হুটো উদ্ভাস্ত। দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। সাম-
নের কামরাটা ফ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল একবার। ভেতরে ঢুকল।
ভেতর থেকে বন্ধ করল অফিসের দরজা। তারপর সোজা এগিয়ে
এল ভেতরের কামরার দরজার দিকে।

দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা। দোর-গোড়ায় এসে
দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখল। তারপর
পিছু হটে কিরে এল সামনের কামরার মাঝখানে। পকেট থেকে
একটা চাবির রিঙ বের করল সে। তারপর এগোল স্টীল আলমিরার
দিকে।

আবার দরজার ফাটলে চোখ রাখল রানা। দেখল, স্টীল আল-
মিরার তালা খুলছে জাকের চৌধুরী। দরজার সামনে থেকে সরে
এল রানা। ডেস্ক থেকে রেকর্ডার আর ক্যাসেটটা নিয়ে চৌকাঠ

পেরিয়ে ঢুকল সামনের কামরায়। ওর উপস্থিতি টের পায়নি লোকটা।
হাঁটু মুড়ে বসে আছে স্টীল আলমিরার সামনে, কপাট ছোটো উন্মুক্ত।
ভেতরে দেখা যাচ্ছে বোতল, বাজ, গ্রাস ফাইল এবং অন্যান্য কেমিস্ট
স্যাম্পল।

‘হিরোইনটা ছুরি যায়নি তো?’ শাস্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

শিউরে উঠল জাকের চৌধুরী। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধের ওপর
দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। রানাকে দেখে ঝরঝর করে কঁপে উঠল
তার সারা শরীর। হাতের রিভলভারটা সামান্য একটু তুলল
রানা, যাতে দেখতে পায় জাকের চৌধুরী। সাদা খড়্গিমাটির মতো
ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার চেহারা। একটা ঢোক গিলল। উঠে দাঁড়াল
ধীরে ধীরে। রিভলভারের দিকে নয়, তাকিয়ে আছে টেপ রেকর্ডারের
দিকে।

‘আপনি...এখানে কি করছেন আপনি?’ গলার আওয়াজটা
খসখসে, কাঁপা।

‘আলমিরাটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তালাটা সাংঘাতিক।’
লোকটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলল রানা। ‘তাই ভাবলাম আপনি
এসে যদি তালাটা খুলে দেন তো খুব ভাল হয়। সরে যান। কিন্তু
সাবধান, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন না।’

বিড় বিড় করে কি বলল জাকের চৌধুরী, বোঝা গেল না। টলতে
টলতে এগোল সে। নিজের চেয়ারে ধপাস করে বসল। তারপর
মুখ ঢাকল হ’হাত দিয়ে।

খোলা আলমিরার নিচের শেলফে তাকাল রানা। ছোট আকা-
রের প্রায় পঞ্চাশটা পার্সেল নিটোলভাবে সাজানো রয়েছে।

বীর পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের কিনারায় বসল ও। টেপ রেক-

ভারটা ডেস্কের ওপর রাখল। রিভলভারটা কোলের ওপর। পকেট থেকে বের করল ক্যাসেটটা। নেড়েচেড়ে দেখে কিছু বোঝা গেল না, ক্যাসেটের গায়ে কোথাও কিছু লেখা নেই। এটা সেক্রেটারী মেয়েটার ক্যাসেটও হতে পারে, হয়ত ভুল করে ফেলে রেখে গেছে। তা যদি হয় এতে রবীন্দ্র সংগীত আছে। আর তা যদি না হয়, এতে হয়ত জাকের চৌধুরীর ডিকটেশন আছে।

‘পরিষ্কার উত্তর দেবেন,’ বলল রানা। ‘মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, কারণ আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ আমি যোগাড় করে ফেলেছি। একটু অপেক্ষা করুন,’ বলে টেপটা অন করল রানা। দেখল ব্যাটারী আছে। অফ করল সেট। তারপর ক্যাসেটটা রেকর্ডারে ঢুকিয়ে আবার সেটা অন করল।

প্রথমে অস্পষ্ট আওয়াজ। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল, আওয়াজটা একটা প্লেনের ইঞ্জিন থেকে বেরচ্ছে। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল শব্দ। মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে জাকের চৌধুরী। সারা শরীরে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করল রানা। টেপ রেকর্ডার থেকে এখন বেরিয়ে আসছে একটা জেট প্রপেলড এয়ারক্র্যাফটের টেক-অফ করার আওয়াজ। ঠিক এই শব্দটাই শুনেছিল ও টেলিফোনে, আতিকুল্লাহ খান যখন ফোন করে উত্তর বাগাবোর একটা খালি বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে অনুরোধ করছিল ওকে।

সেট অফ করে ভেতর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল রানা। ‘অপরদিকে কিছু আছে, নাকি খালি?’

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জাকের চৌধুরী। রানার প্রশ্ন যেন বুঝতেই পারেনি। ক্যাসেটের অপর দিকটাও পরীক্ষা করল রানা।

খালি। নড়েচড়ে বসল ও। কোলের ওপর থাকল রিভলভারটা।
রেকর্ডারের বোতাম টিপে আবার সেটা অন করল, বলল, ‘রেডি।’
ইঙ্গিতে আলমিরায় সাজানো পার্সেলগুলো দেখাল জাকের চৌধুরী-
কে। ‘এই ড্রাগসই কি হাইজ্যাক করেছিল শফিক?’

জাকের চৌধুরীর সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে। ঘন ঘন ঢোক
গিলল সে। তারপর ভাঙা গলায় বলল, ‘ই্যা। আপনি জানলেন
কিভাবে এগুলো আমার কাছে আছে?’

‘জানতাম না, অনুমানে বুঝেছিলাম। প্রথম থেকেই ছোট খাট
অনেক ভুল আপনি করেছেন, অন্তত আমার মনে সন্দেহ জাগাবার
জন্যে সেগুলো যথেষ্ট ছিল। সুজি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটু বেশি
কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছেন আপনি। খুন খারাবীর কাছ থেকে সাধা-
রণত দূরে সরে থাকতে চায় মানুষ, অথচ পুলিশ আমাকে খুনি বলে
সন্দেহ দরছে জানার পরও আপনি আমার কাছে এসে তদন্তের
সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যেচে পড়ে কিছু কিছু
তথ্য দিয়েছেন, এমন কি জানতে চেয়েছেন আপনার কোন সাহায্য
আমার দরকার আছে কিনা। ডিউককে এমনিতেই সবাই এড়িয়ে
চলে, সুজি খুন হবার আগে পর্যন্ত আপনিও সযত্নে আমাকে এড়িয়ে
চলতেন, কিন্তু সুজি খুন হবার পর থেকেই আপনি আমার বুজুম ফ্রেণ্ড
হয়ে গেলেন। এছাড়া আপনার উপায়ও ছিল না। পুলিশ কেসটা
সম্পর্কে কি ভাবছে তা জানার দরকার ছিল আপনার, আমার কাছ
থেকে ছাড়া আর কার কাছ থেকে জানতে পারতেন আপনি?’ পকেট
থেকে একটা ফটো বের করল রানা। জাকের চৌধুরীর ফটো। দাড়ি
জাকা। ডেস্কের ওপর, জাকের চৌধুরীর সামনে রাখল সেটা।

ফটোর দিকে চোখ পড়তেই আরেকবার শিউরে উঠল জাকের

চৌধুরী ।

‘আপনিই সেই নকল মৌলভী !’ বলল রানা । ‘পারভিন চিনতে পেরেছে আপনাকে । আপনিই শফিক আর পারভিনের বিয়ে পড়িয়েছেন । তার মানে শফিকের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন আপনি । ছোটখাট ভুল আপনি আরো করেছেন । পারভিন সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় আপনি বলেছিলেন, ওর সম্পর্কে তেমন কিছুই আপনার জানা নেই । অথচ পারভিনের বাবার নাম কি তাও আমাকে বলেছেন আপনি । বাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয় ? আরো আছে । হঠকণ্ঠে যাবার আগে আপনার অফিসে একবার ঢুকেছিলাম আমি, আপনার ডেস্কে তখন এই টেপ রেকর্ডারটা ছিল । এটার দিকে অন্তত একবার আড়চোখে তাকিয়েছিলেন আপনি, এবং আমি কিছু জিজ্ঞেস না করলেও আপনি উপযাচক হয়ে বলেছিলেন মাঝে মধ্যে গান টান শুনে সময় কাটান । আপনি যখন কথাটা বলেছিলেন তখনই আমি স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলাম, কই, আপনার অফিস থেকে তো কখনও পানের আওয়াজ পাইনি । আজ আপনার সেক্রেটারী বরং উন্টে কথাই বলল, আপনি গান শোনার জন্যে টেপটা ব্যবহার করেন না । এমন কি, অফিসে আপনি গান-বাজনা পছন্দ করেন কিনা । স-বাপারেও মেয়েটার সন্দেহ আছে ।’ একটু থামল রানা, তারপর আবার বলল, ‘মসব কিছুই নিরেট প্রমাণ নয়, কাজেই আপনিও শুনুন কিনা । সে-বাপারে আমার সন্দেহ খানিক আগে পর্যন্ত নাছিল । কিন্তু আল মিরায় তিরোতনের পার্সেল দেখার পর আমার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটেছে । তাই বাড়িয়ে ফোনের নম্বরকল তুলে নিলুম । ডায়াল করল শুলিফ হেডকোয়ার্টারের পাখারে । ফোনে আহমেদকে চাইলুম । এবার তাকে চলে আসতে বললুম রাজি বাসিঙে । মিসি-রানা ১৮

ভার রেখে দিয়ে জাকের চৌধুরীকে বলল, 'পুলিশী জেরার জবাব দেয়া বড় কামেলার কাজ। তারচেয়ে আপনি বরং একটা স্বীকারোক্তি দিন, টেপ হয়ে যাক। কি বলেন? নিন, শফিক-পারভিনের বিয়েটা দিয়েই শুরু করুন।'

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে সত্যিই কথা বলতে শুরু করল জাকের চৌধুরী। তার যে আর কোন আশা নেই এটুকু সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। বিয়ের পুরো ঘটনাটা গড়গড় করে বলে গেল সে। তারপর এল খুনের প্রসঙ্গে।

'আপনার সাথে ঘন ঘন কথা বলা উচিত হচ্ছে না, এটা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম,' ভাঙা শুকনো গলায় শুরু করল সে। 'জানতাম, কিছু একটা ভুল দেখে আপনার সন্দেহ জাগবে, আপনার চোখে ধরা পড়ে যাব আমি। আপনি হতকণ্ড যাচ্ছেন শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আপনাকে খুন করার জন্যে একটা গুণাকে ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু তাতে যখন কাজ হল না, বুঝলাম, আমার কোন আশা নেই। শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরা পড়তেই হবে। কিছুই আমার করার ছিল না, ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া।'

'সুজির খুনী হিসেবে প্রথমে আমি সন্দেহ করি পারভিনকে, কারণ তার একটা মোটিভ ছিল।'

'আপনি যাতে পারভিনকে সন্দেহ করেন সেজন্যেই শফিকের সাথে তার বিয়ে এবং পরবর্তী ঘটনার কথা খুলে বলি আপনাকে। কিন্তু যখন শুনলাম আপনি হতকণ্ড যাচ্ছেন, বুঝলাম, ওখানে আপনার সাথে শফিকের দেখা হবেই। আর শফিকের সাথে কথা বললে ব্যাপারটার সাথে আমি যে জড়িত তাও আপনার অজানা থাকবে না।'

'সুজি হিরোইন নিয়ে চাকার আসছে তা আপনি জানলেন

কিভাবে ?

‘সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। শক্তিক সম্পর্কে আপনাকে
বা কিছু বলেছি সব সত্যি, শুধু একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম, ওকে
আমি পছন্দ করি না। আসলে বরাবরই আমি ওর বন্ধু ছিলাম।
আমাদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল। গত ছ’বছর ধরে ব্যবসা করছি
আমি, কিন্তু কোন রকম সুবিধে করতে পারছি না। আসলে যাকে
বলে ব্যবসায়ী, আমি তা কোনদিনই হতে পারিনি। আমার ধৈর্য কম,
একলাকে লাখপতি হতে চাই। সেজন্যেই প্রতিটি বিজনেস ডিলেই আমি
মার খেয়েছি। এ-ব্যাপারে শক্তিকের সাথে আমার পুরো মিল আছে।
যাই হোক, ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় টাকার জন্যে মরিয়া
হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই সময় শক্তিক চিঠি লিখে জানাল, তার
কাছে প্রচুর হিরোইন আছে, আমি কি তা কিনতে রাজি আছি ?
আমি একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট, হিরোইন বিক্রি করার অনেক
চ্যানেল আমার জানা আছে। প্রচুর পরিমাণে হিরোইন কেনার টাকা
আমার কাছে না থাকলেও শক্তিকের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে
গেলাম। বোকার মতো শক্তিক আমাকে জানাল, হঙকঙে আটকা
পড়ে গেছে সে, সুজি যদি টাকায় গিয়ে টাকা যোগাড় করে ওর
জন্যে জাল পাসপোর্ট আর প্লেন ভাড়ার ব্যবস্থা না করতে পারে,
কয়েক হপ্তার মধ্যে খুন হয়ে যাবে সে। জানাল, দলের সাথে
বেঈমানী করেছে সে, তারা ওকে খুঁজছে।’ একনাগাড়ে কথা
বলে হাঁপাতে শুরু করল জাকের চৌধুরী। একটু দম নিয়ে আবার
শুরু করল সে।

‘আমি দেখলাম, ধনী হবার এই সুযোগ। কাজেই চিঠি লিখে
শক্তিককে জানালাম, হিরোইন কিনব আমি। ঠিক হল, এয়ারপোর্ট

থেকে সরাসরি আমার কাছে আসবে সুজি কোয়াও, হিরোইন দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নেবে। কিন্তু কোন্ প্লেনে আসছে সুজি তা আমাকে জানাননি শফিক। অথচ মনে মনে আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, সুজিকে খুন করব।’ চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল জাকের চৌধুরী। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। ‘একটা বিদেশী মেয়েকে খুন করা কঠিন বলে মনে হয়নি তখন। কিন্তু লাশটা নিয়ে কি করব, কোথায় লুকাব এসব আমার মাথায় ঢুকছিল না। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, আপনার অফিসেই করব খুনটা, ওখানেই থাকবে লাশ। পাশের কামরাটাই আপনার অফিস, তাই সেটাই সহজ হবে। শহরে এমনিতেই আপনার বদনাম আছে, সবাই জানে ডিউক একজন খারাপ লোক, পুলিশ আপনার কামরায় লাশ দেখলে আপনাকেই খুনী বলে বিশ্বাস করবে। সবাই ধরে নেবে চীনা মেয়েটা আপনার কোন মকেল ছিল, তাকে আপনি ব্রাকমেইল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কেঁসে যাচ্ছে দেখে খুন করতে বাধ্য হয়েছেন।’

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। চোখ বুঁজে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। রিভলভারটা জাকের চৌধুরীর বুক লক্ষ্য করে ধরল।

একটু পর শাটের আন্তিন দিয়ে চোখ মুছল জাকের চৌধুরী। ডেস্কের ওপর চোখ রেখে বলল, ‘আগেই প্লেন টেক-অফ আর এয়ার-পোর্টের আনুষ্ঠানিক শব্দ টেপ করে রেখেছিলাম আমি। সেটা চালু করে আপনাকে এই অফিস থেকেই ফোন করি। সুজি এখানে এসে পৌঁছবার আগেই অফিস থেকে আপনাকে সরাবার দরকার ছিল। আপনি আমার ফোন পেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার

পর আপনার অফিসে গিয়ে বসলাম। আমার অপেক্ষার পালা শুরু হল। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল সুজি কোয়াও। আমাকে সে অবি-
শ্বাস করেনি। বলল, হিরোইনটা কফিনের ভেতর আছে। তারপর
টাকা চাইল। দেরাজ খুলে আপনার পিস্তল বের করে গুলি করলাম
ওকে।' ধরধর করে কঁপে উঠল জাকের চৌধুরী। 'তারপর বেরিয়ে
এলাম। সে-রাতে এই অফিসেই একা বসে ছিলাম আমি...'

প্যাসেজে ভারি জুতোর আওয়াজ। এক মুহূর্ত পরই কামরায়
দুকল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। জাকের চৌধুরী আর রানার দিকে
একবার তাকিয়েই বা বুঝবার বুঝে নিল সে। গভীর গলায় বলল,
'সাবাস, ডিউক। মাথা বটে একখানা। কিন্তু এই কেস সুরাহা
করার কৃতিত্বটা কে নেবে বল তো?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'তুমি তো পুলিশে চাকরি কর না,' বলল ফয়েজ আহমেদ।
'কাজেই কৃতিত্ব তুমি নিলেও তোমার পদোন্নতির কোন প্রশ্ন ওঠে
না। কিন্তু আমি একটা চাকরি করি, তাই কৃতিত্বটা যদি আমি নিই,
প্রমোশন হয়ে যেতে পারে। কাজেই সমস্ত কৃতিত্ব আমাকেই নিতে
হচ্ছে। বিনিময়ে ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার চাইব
আমি, একটু খাতির আদর করব, তাতেই তোমার সন্তুষ্টি থাকা উচিত।
কি বল?'

ডিউকের ছদ্ম-পরিচয়ে থাকতে হবে রানাকে আরও বেশ কিছু-
দিন। সাধারণ মানুষের চোখে সে এক দুঃসাহসী গুণ্ডা, বেপরোয়া
মস্তান; পুলিশের চোখে সে একটা প্রলোভন—ওর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট
অভিযোগ দাঁড় করান যাচ্ছে না বটে, কিন্তু লোকটা সে বেয়াড়া,
ত্যাগোড় এবং ধুরন্ধর; আর এন. এস. আই-এর চোখে সে অত্যন্ত

সং এক যুবক, বড় সাহেবের সাথে ঝগড়া করে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে বেরিয়ে এসে অধঃপাতে যাচ্ছে। আসলে বুড়ো মেজর জেনারেলের (অবঃ) নির্দেশ : এই ভাবেই কাটাতে হবে আরও কিছুদিন, কি না কি বিশেষ কাজ আছে, যার জন্যে রানার এই পরিচয় দরকার। ঠিক আছে, রানা ভাবল, এই বোকাটা খুশি থাকলে ভালই হবে—ভবিষ্যতে কাজ দেবে। মুচকি হাসল ও। বলল, 'তাই তো! আমি আর কি করলাম? সবই তো আপনার কৃতিত্ব।'

একগাল হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার ফোন পেয়েই বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই ডিউক খুনের একটা সুরাহা...'

'দূর! কে বলল আমি ফোন করে আপনাকে ডেকেছি? আপনিই না আমাকে ফোন করে বললেন, যেন সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকি, হাতকড়া নিয়ে পৌছে যাচ্ছেন আপনি পাঁচ মিনিটে।'

'ঠিক, ঠিক।' দুই কানে গিয়ে ঠেকল ফয়েজ আহমেদের হাসি। তারপর কটমট করে চাইল জাকের চৌধুরীর দিকে। দৃঢ়পায়ে এগোল সামনে।

মাথা নিচু করে বসে আছে জাকের চৌধুরী। চোখ থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে কোলের ওপর।

রাত এগারটা। মীর মঞ্জিল।

বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান তাঁর লিভিংরুমের সেই বেড সাইড চেয়ারে বসে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে তাঁর উদাস দৃষ্টি। সব হারাবার শাতনা তাঁর বয়স যেন আরো দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখেমুখে বেদনার ছাপ।

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকে রানা দেখল, আজ বিকেলে ঠিক যেখানে যেভাবে দেখে গিয়েছিল ভদ্রলোককে, এখনও সেখানে সেভাবেই বসে আছেন তিনি, যেন সেই থেকে একচুলও নড়েননি।

‘কে?’ রানার দিকে তাকালেন না তিনি। ‘ডিউক?’

মীর পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল রানা। হাতের টেপরেকর্ডারটা টেবিলের ওপর রাখল। ‘হ্যাঁ।’

‘তুমি আবার দেখা করতে চেয়েছ শুনে আমি একটু বিরক্তই হয়েছি,’ স্পষ্টভাবে বললেন মোখলেশুর রহমান। ‘কিন্তু প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ তুমি, তাই দেখা না করে পারলাম না। ব্যাপারটা কি? আমাকে একটু একা থাকতেও দেবে না?’

‘আপনি বিরক্ত হয়েছেন, সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই,’ বলল রানা। ‘কিন্তু আমি আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করি, সেজন্যেই আবার আমাকে আসতে হয়েছে। আপনার দ্বিতীয় পুত্রবধূর খুনী ধরা পড়েছে, শুনেছেন নিশ্চয়ই?’

‘হ্যাঁ। ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ ফোন করেছিল খানিক আগে। লোকটাকে যত বোকা মনে করতাম, এখন দেখছি তত বোকা নয় সে। যাক, তোমার ব্যাপারটা কি?’

‘আমি এসেছি আপনার প্রথম পুত্রবধূ সম্পর্কে আপনাকে একটা কথা জানাতে...’

‘প্রথম পুত্রবধূ!’ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন মীর মোখলেশুর রহমান। ‘কি বলতে চাও তুমি?’

‘আপনার ছেলে সূজিকে বিয়ে করার আগে ঢাকায় আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তাই না?’

‘করেছিল। কিন্তু আমার ছেলে কথটা স্বীকার করেনি। কাজেই আমিও সেই বিয়ের স্বীকৃতি দিইনি। যে বিয়ে করেছিল সে-ই যখন স্বীকার করেনি, আমার কিছু করার ছিল না। পুরনো ঘা খুঁটিয়ে লাভ কি। সেই বটন; এখন মৃত অতীত, ভুলে যাওয়াই সবার জন্যে ভাল।’

‘ঘটনাটা বোধহয় মৃত বা অতীত নয়,’ বলল রানা। ‘বিয়েটা যে হয়েছিল, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।’

‘অসম্ভব!’ চেয়ারের ওপর সিঁথে হয়ে বসলেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। ‘পারভিনকে আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, ওদের বিয়ের বরযাত্রীরা সবাই অ্যান্ড্রিডেটে মারা যায়। নকল এক মৌলভী ওদের বিয়েটা পড়িয়েছিল, কিন্তু পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমিও কস খুঁজিনি তাকে। কোথাও পাইনি।’

‘আমি পেয়েছি।’ বলল রানা।

‘হোয়াট! কি বললে!’ উত্তেজনায চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ।

‘শফিকেরই একজন বন্ধু ছিল সে, জাকের আলি চৌধুরী। সে-ই খুন করেছে সুজিকে। পারভিন আর শফিকের বিয়ে সে-ই পড়িয়েছিল। তা স্বীকার করেছে সে।’ বলে টেপটা অন করে দিল রানা।

গোড়া থেকেই পারভিনকে চিট করার ইচ্ছে ছিল শফিকের, টেপ চালু হতেই জাকের আলি চৌধুরীর গলা শোনা গেল। ‘ঠিক হয়, নকল মৌলভী সেজে বিয়েটা আমিই পড়াব। বরযাত্রী থাকবে আমাদেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু, যারা পরে এই বিয়ের কথা অস্বীকার করবে। এরা ভবিষ্যতে বৈধমানী করত কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু শফিকের ভাগ্য বলতে হবে যে এরা সবাই শহরে ফেরার

পথে অ্যান্ড্রিডেটে মারা যায়। একমাত্র আমিই বেঁচে গিয়েছিলাম।
 বৃদ্ধ বন্ধু রাখার জন্যে শক্তির আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। তা-
 ছাড়া, ও ছিল আমার একমাত্র বন্ধু, ওর সাথে বেসামানী করার কথা
 আমি কোনদিন ভেবেও দেখিনি—অন্তত এই ব্যাপারে। ইসলামী
 রীতি অনুযায়ী ওদের এই বিয়েটা নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।
 যেহেতু গোটা ব্যাপারটাই চিটিং, তাই দশ লাখ টাকা দেনমোহরে
 আপত্তি করেনি শক্তিক। আমি হালপ করে বলছি, পারভিন শক্তিকের
 আইন সম্মত স্ত্রী...’

ধরধর করে কাঁপছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। দ্রুত উঠে দাঁড়ি-
 য়ে তাকে ধরে কেলল রানা। ‘আ-আমাকে নয়।’ কাঁপা গলায়
 বললেন তিনি। ‘আমি ঠিক আছি। তুমি এখনি ছুটে গিয়ে পার-
 ভিনকে ধরে নিয়ে এস, বাবা। শুনেছিলাম ওর একটা ছেলে হয়েছে,
 আমার নাতি, কোথায় সে। আমার বংশে বাতি দেবার জন্যে এখনও
 তাহলে আছে একজন। কোথায়। কোথায় সে? বোমা। পারভিন।
 বোমা।’ বৃদ্ধের হুঁচোখ বেয়ে আনন্দ-অশ্রু নামল। ‘দাঁড়িয়ে থেক না,
 বাবা। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, এ অণ আমি কোনদিন শোধ
 করতে পারব না। আরেকটু কর। প্লীজ, মাই বয়। আমার বোমাকে
 ডেকে নিয়ে এস, আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, আমার নাতি কোথায়...’

বৃদ্ধকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল রানা। বলল, ‘উত্তেজিত হবেন
 না। আপনার নাতিকে আমি বোডিং স্কুল থেকে নিয়েই এ বাড়িতে
 এসেছি।’ দরজার দিকে তাকাল রানা। গলা একটু চড়িয়ে বলল,
 ‘বাটলার, নিয়ে এস ওকে।’

ছয় বছরের মীর সাদেকুর রহমানকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল
 বাটলার।

রানার হাত সন্নিবেশ দিয়ে আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। অস্থির পা কেলে এগিয়ে গিয়ে বাটলারের কোল থেকে একরকম ছিনিয়ে নিলেন নাভিকে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরময় পায়চারি শুরু করলেন তিনি, পায়চারি না বলে নাচা-নাচি শুরু করলেন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

মাথায় বোমটা দেয়া একটা নারী মূর্তি দেখা গেল খোলা দরজার পাশে। সেদিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। তার-পর ছুটে গেলেন সেদিকে। ‘মা। বোমা।’

ঘরে ঢুকে স্বস্তির পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল পারভিন। কদম-বুসি করে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। পূজবস্ত্র শিটে হাত, বুলিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান।